আফ্রিকার দুলহান
সাদেক হুসাইন

আ গে প ড় ন

মুসলমানদের মিসর-সিরিয়া দখল করার খুন চাপে আফ্রিকার বলদর্পী খ্রিস্টান সম্রাট জর্জিরের মাথায়। তথ্যটা যথাসময়ে পৌঁছে যায় মিসরের গভর্নর প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে সা'দ (রা.)-এর কানে। জবাবে তিনি জর্জিরকে ভালোমতো একটা কানমলা দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। আমীরুল মুমিনীন হযরত ওসমান (রা.)-এর অনুমোদনক্রমে মাত্র দশ হাজার মুজাহিদ নিয়ে অভিযানে বেরিয়ে পড়েন মুসলমানদের সার্বভৌমত্বে আঘাত হানার স্বপ্নসাধ মিটিয়ে দিতে। একে-একে আফ্রিকার অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ দুটি দুর্ভেদ্য দুর্গ জয় করে মুখোমুখি হন দাম্ভিক সম্রাট জর্জিরের। দু-দিনের যুদ্ধে জর্জিরের বিশাল বাহিনী প্রচন্ড মার খায় মুসলমানদের হাতে। আসন্ন পরাজয় ঠেকাতে নিরুপায় জর্জির ঘোষণা দেন, যে-ব্যক্তি মুসলিম সেনাপতির মাথা কেটে আনবে, তার সঙ্গে আপন রূপসীকন্যা হেলেনকে বিয়ে দিবেন। বিপরীতে মুসলিম সেনাপতি হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে সা'দও (রা.) ঘোষণা দেন, যে-ব্যক্তি খ্রিস্টান সম্রাট জর্জিরকে হত্যা করবে, জর্জিরকন্যা হেলেনকে তাকে দান করবেন। কী হল তার পর?

পড়ুন

আফ্রিকার দুলহান

পরশমণি'র আরও বই

- সাইয়েদ হুসাইন আহমাদ মাদানী
- ঈমানদীপ্ত দাস্তান (৮ খণ্ডের সিরিজ উপন্যাস)
- আল্লাহ'র সৈনিক (ঐতিহাসিক উপন্যাস)
- পতনের ডাক (ঐতিহাসিক উপন্যাস)
- রাজকুমারী (ঐতিহাসিক উপন্যাস)
- কুরআন অধ্যয়নের মূলনীতি
- ইমাম আবু হানীফা (রহ)-এর জীবনের পাতা থেকে
- ইসলাম ও ফ্যাশনের সংঘাত
- কী করে ছেলেমেয়েকে মানুষ বানাবেন
- মূল্যবান বয়ান
- হৃদয়ছোঁয়া কাহিনী
- তাবলীগ জামাতের কারগুজারি

আফ্রিকার দুলহান

রচনা

সাদেক হুসাইন

প্রখ্যাত উর্দু ঔপন্যাসিক, ভারত

অনুবাদ

মুহাম্মদ মুহিউদ্দীন

দোকান নং-৪৩, ইসলামী টাওয়ার (১ম তলা)

১১/১, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০। মোবাইল : ০১৭১৭-১৭৮৮১৯

পৃষ্ঠা	২২৪, ফর্মা ১৪
পরশমণি প্রকাশনা	১৭
©	সংরক্ষিত
প্রকাশক	মাওলানা মুহাম্মদ মুহিউদ্দীন স্বত্বাধিকারী, পরশমণি প্রকাশন
তৃতীয় সংস্করণ প্রথম প্রকাশ	মার্চ ২০০৯ এপ্রিল ২০০৭
বর্ণ বিন্যাস	মুজাহিদ বিন গওহার জি গ্রাফ কম্পিউটার, মালিটোলা, ঢাকা
মুদ্রণ	কালার সিটি ১১৪, সবুজবাগ, ঢাকা
ডিজাইন	নাজমুল হায়দার দি লাইট, ৭২, পুরানা পল্টন, ঢাকা

ISBN-984-8754-04-0

মূল্য : ১৪০.০০ টাকা মাত্র

আফ্রিকার দুলহান

এক.

দলে-দলে মসজিদ অভিমুখে ছুটে চলছে মদীনাবাসী। তাঁরা তাওহীদের পতাকাবাহী। ইসলামের জন্য নিবেদিত। দেশ ও জাতির জন্য উৎসর্গিত। সকলের মুখে এক অসাধারণ তেজ ও ক্ষোভের ছাপ পরিস্ফুট।

সময়টা সকালবেলা। পূর্ব আকাশে সূর্য উদিত হয়েছে। ঘর-দোর, মাঠ-প্রান্তর, গাছ-গাছালি ও পাহাড়-পর্বতের উপর ঝলমলে সোনালি মিষ্টিরোদ ছড়িয়ে পড়েছে। এখন কোনো নামাযের সময় নয়; তবু মুসলমানরা ছুটে চলছে মসজিদপানে।

মসজিদে নববী। সেকালে এ-যুগের মতো আলাদা রাজপ্রাসাদ কিংবা কোর্ট-কাচারি ছিল না। নবীজি (সা.) ও তাঁর খলীফাগণ মসজিদে নববীতে বসেই রাষ্ট্রীয় সকল কর্মকাণ্ড ও বিচার-ফয়সালা আঞ্জাম দিতেন। মসজিদে নববী ছিল সেকালে ইসলামী সরকারের রাজভবন-বিচারালয়-পার্লামেন্ট।

হিজরি ২৬ সনের ঘটনা। মুসলমানগণ চারদিক থেকে ছুটে এসে মসজিদে নববীতে সমবেত হচ্ছে। বসে পড়ছে মিম্বরমুখী হয়ে। মিম্বরের সর্বসম্মুখে ও ড্যানে-বাঁয়ে উপবিষ্ট অনেক সম্মানিত ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। মধ্যমাকৃতির সুদর্শন নুরানি চেহারার এক বৃদ্ধ মিম্বরে উপবিষ্ট। তাঁর মুখাবয়ব থেকে ইল্‌ম, মানবতা, প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতা ঠিকরে পড়ছে। ইনি আরব-অনারবের সম্রাট এবং মুসলমানদের আমীর ও খলীফা হযরত ওসমান (রা.)।

হযরত ওসমান (রা.)-এর আশপাশে যাঁরা উপবিষ্ট, তাঁরা সবাই টগবগে যুবক। আবদুল্লাহ ইবনে ওমর, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস, আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের, হাসান ইবনে আলী ও হুসাইন ইবনে আলী তাঁদের মধ্যে উপস্থিত রয়েছেন। প্রবীণদের মধ্যে উপস্থিত আছেন হযরত আমর ইবনুল আস, আলী, তালহা ও যুবায়ের প্রমুখ (রা.)।

সমবেত মুসলমানগণ প্রশান্তমনে চুপচাপ বসে আছে। হযরত ওসমান (রা.) দাঁড়িয়ে ভাষণ দিতে শুরু করেন–

'মুসলমানগণ, ইসলামের শত্রুতায় খ্রিস্টানরা সীমা ছাড়িয়ে গেছে। তারা না

নিজেরা স্বস্তিতে আছে, না মুসলমানদেরকে শান্তিতে থাকতে দিচ্ছে। আশা ছিল, সিরিয়া, মিসর, বসরা ও আর্মেনিয়া প্রভৃতি রাজ্য পদানত হওয়ার পর তাদের উৎপাত বন্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু তা হয়নি। এখন আফ্রিকার খ্রিস্টানরা মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে। তারা মিসরের মুসলমানদের উপর নির্যাতন শুরু করেছে। তাদের রাজা জর্জির মিসর আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছে। আমি জানতে পেরেছি, তারা এক লাখেরও বেশি সৈন্যের সমাবেশ ঘটিয়েছে এবং অনতিবিলম্বে আক্রমণ চালাবে। মিসরে নিযুক্ত আমাদের গভর্নর আবদুল্লাহ ইবনে সা'দ আমার নিকট আফ্রিকা-আক্রমণের অনুমতি প্রার্থনা করেছে। আমি অনেকের মতামত নিয়েছি। প্রত্যেকেরই অভিমত, এই কাঁটাটিও তুলে ফেলা উচিত। অর্থাৎ– খ্রিস্টানদের এই যুদ্ধের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে নিয়ে আল্লাহর উপর ভরসা করে আফ্রিকা-আক্রমণের পক্ষে সবাই একমত। আমি আজ আবদুল্লাহ ইবনে সা'দের নিকট দূত প্রেরণের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। তাকে আফ্রিকা আক্রমণের অনুমতি প্রদান করে বার্তা প্রেরণ করছি। কিন্তু, আমি জানি, তার সৈন্য কম। তাই তার সাহায্যার্থে মদীনা থেকে অতিরিক্ত সৈন্য পাঠাতে হবে। আপনারা যারা আফ্রিকার জিহাদে যেতে প্রস্তুত, তারা মিনায় গিয়ে একত্রিত হোন।'

মিনা মদীনা থেকে মাইলতিনেক দূরে অবস্থিত একটি অঞ্চল। মুজাহিদরা প্রস্তুত হয়ে মদীনা থেকে সেখানে গিয়ে সমবেত হতে শুরু করেছে।

সংক্ষিপ্ত ভাষণ সমাপ্ত করে হযরত ওসমান (রা.) এক যুবককে ইঙ্গিত করলে সে উঠে খলীফার নিকট গিয়ে দাঁড়ায়। খলীফা বললেন– 'সরোয়ার, আমি তোমাকে দূত নিযুক্ত করে মিসর পাঠাতে চাই। তুমি কি প্রস্তুত আছ?'

সরোয়ার সুঠাম-সুদেহী এক সুদর্শন যুবক। দিনকয়েক পর তার বিবাহ সম্পন্ন হওয়ার কথা। কিন্তু সব ভুলে গিয়ে সে বলল– 'আমি প্রস্তুত খলীফাতুল মুসলিমীন! আমি আপনার নিকট আফ্রিকার যুদ্ধে অংশগ্রহণেরও অনুমতি প্রার্থনা করছি।'

খলীফা বললেন– 'আমি তোমাকে সেই অনুমতিও দিলাম। এই নাও পত্র। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পত্রখানা আবদুল্লাহ ইবনে সা'দের হাতে পৌঁছিয়ে দাও।'

সরোয়ার পত্রখানা হাতে নিয়ে বলল– 'ইনশাআল্লাহ কাল ফজর নামায পড়েই রওনা হব।'

খলীফা বললেন– 'আল্লাহ হাফেজ, ফী-আমানিল্লাহ।'

কিছুক্ষণের মধ্যে দরবারে-খেলাফত মুলতবি হয়ে যায় এবং প্রত্যেকে যার-যার গন্তব্যে ফিরে যায়।

দুই.

সরোয়ার খলীফার পত্র নিয়ে রওনা হয়ে গেছে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পত্রখানা মিসরের গভর্নর আবদুল্লাহ ইবনে সা'দের হাতে পৌঁছিয়ে দিতে হবে। তাই সে দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলছে। এখন আরবের সীমানা অতিক্রম করে মিসর প্রবেশ করেছে। ফুসতাত নামক স্থানে গিয়ে তাকে গভর্নরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে হবে।

ফুসতাত মুসলমানদেরই আবাদকৃত একটি অঞ্চল। মিসর ও আলেকজান্দ্রিয়া বিজয়ের পর দ্বিতীয় খলীফা হযরত ওমর ফারুক (রা.)-এর নির্দেশে হযরত আমর ইবনুল আস (রা.) নগরীটির পত্তন ঘটান। আদেশনামায় হযরত ওমর (রা.) নির্দেশনা প্রদান করেন, নগরীটি এমন স্থানে গড়তে হবে, যেন সেখান থেকে মদীনা পৌঁছুতে পথে কোনো নদী না পড়ে। আরব ও ইসলামী বাহিনীর মাঝে কোনো নদী প্রতিবন্ধক না হোক, এটাই ছিল হযরত ওমরের কামনা।

সরোয়ার ফুসতাত অভিমুখে এগিয়ে চলছে। একদিন চার অশ্বারোহীর সঙ্গে তার সাক্ষাৎ ঘটে। তারা সরোয়ারের নিকটে এসে জিজ্ঞেস করে– 'আপনি কি মদীনা থেকে আসছেন?'

ঃ আপনারা কারা?

ঃ আমরা খ্রিস্টান। আফ্রিকার অধিবাসী।

ঃ সম্ভবত আপনারা গুপ্তচর?

সরোয়ার একা। তারা চারজন। তবু সরোয়ারের মন্তব্য শুনে লোকগুলো ভড়কে যায়। সে-যুগের মুসলমানরা প্রকৃত অর্থেই মুসলমান ছিল। তাদের মুখাবয়ব ও ভাবভঙ্গিতে এমন প্রভাব বিরাজ করত যে, অমুসলিমরা তাদের দেখে ভয় পেত। আত্মসংবরণ করে এক খ্রিস্টান বলল– 'না, আমরা গোয়েন্দা নই।'

ঃ তা হলে কারা?

ঃ আমরা প্রিন্সেস হেলেনের সঙ্গে এসেছি।

ঃ হেলেন কে?

ঃ আফ্রিকার খ্রিস্টান রাজার সুন্দরী কন্যা। আরববিশ্ব হেলেনের মতো রূপসী নারী কোনোদিন দেখেনি। মেয়েটি এতই রূপসী যে, যে এক নজর দেখে, সে-ই তার অনুরক্ত হয়ে যায়। মজার ব্যাপার হচ্ছে, তিনি অতিশয় রূপসী হওয়ার পাশাপাশি বীরাঙ্গনাও। এমন বীর-নারী যে, বিখ্যাত বীর পুরুষরাও তার কাছে হেরে যায়।

ঃ মানলাম, তোমাদের রাজকুমারী অনেক রূপসী। কিন্তু আমি একথা মানতে রাজি নই যে, তিনি এমন বীরাঙ্গনা যে, বড়-বড় বীর পুরুষদেরও তার কাছে হার মানতে হয়।

ঃ কিন্তু আমি যা বলেছি, সম্পূর্ণ সত্য বলেছি। আপনার বিশ্বাস না-হলে আমাদের সঙ্গে চলুন, নিজচোখে দেখে আসুন।

ঃ তা রাজকুমারী আজকাল থাকছেন কোথায়?

ঃ মিসরে। বিস্ময়কর বস্তুসমূহ দেখতে মিসর এসেছেন। এই মুহূর্তে তিনি দেবসপুলিশে অবস্থান করছেন।

ঃ তিনি কি জানেন না, তার পিতা জর্জির মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন এবং মুসলমানরা তার মোকাবেলায় যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করছে? এমন পরিস্থিতিতে তার মিসর আগমন ঝুঁকিপূর্ণ নয় কি?

ঃ আমি আপনাকে বলেছি না, তিনি অতিশয় নির্ভীক ও সাহসিনী মেয়ে! তিনি কাউকে ভয় করেন না।

ঃ তবে তো তাকে একবার দেখতেই হয়।

ঃ দেখতে চাইলে আমাদের সঙ্গে চলুন।

সরোয়ার কিছু ভাবতে শুরু করে। খ্রিস্টান বলল– 'ভাববার কিছু নেই; আপনার ভয়েরও কোনো কারণ নেই। এ-মুহূর্তে রাজকুমারীর সঙ্গে পনেরো-বিশজন দেহরক্ষীর অধিক সৈন্য নেই। তিনি গোপনে ভ্রমণ করতে এসেছেন শুধু।

ঃ তা নয়– আমি ভাবছি, তোমরা আমাকে ধোঁকা দাও কি-না।

'ধোঁকা?' চার খ্রিস্টান একসঙ্গে বলে ওঠে। তারা বিস্ময়ভরা চোখে সরোয়ারের প্রতি তাকিয়ে থাকে।

সরোয়ার শান্তকণ্ঠে বলল– 'হ্যাঁ, ধোঁকা। আমার সন্দেহ হচ্ছে, তোমরা আমাকে ধোঁকা দেবে।'

ঃ আপনার ধারণা সঠিক নয়। রাজকুমারী হেলেন কেবলই ভ্রমণের উদ্দেশ্যে মিসর এসেছেন। আমরা তার সফরসঙ্গী। আপনাকে ধোঁকা দেয়ার আমাদের কোনোই ইচ্ছে নেই।

ঃ আপনারা ভুল বলছেন। রাজকুমারী এমন নির্বোধ নয় যে, এমন সংঘাতমুখর পরিস্থিতিতে তিনি মিসর আগমন করবেন। তার পিতা জর্জিরও বোকা নন যে, তিনি কন্যাকে এমন নাজুক পরিস্থিতিতে মিসর আসতে দেবেন। আমি নিশ্চিত, তোমরা প্রতারণার মাধ্যমে আমাকে গ্রেফতার করতে চাচ্ছ। চালাক! বদমাশ!

তরবারি কোথায় বের করো; মৃত্যু তোমাদের মাথার উপর চলে এসেছে। বলেই সরোয়ার কোষ থেকে তরবারিটা বের করে তাক করে ধরে।

খ্রিস্টানরা সরোয়ারের তরবারির চমক দেখে ভয়ে কেঁপে ওঠে। কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গেই তারা ভয়-বিস্ময় ঝেড়ে ফেলে। তাদের একজন ঘোড়ায় চড়ে দ্রুত পালিয়ে যায়। অবশিষ্ট তিনজন তরবারি বের করে সরোয়ারের উপর আক্রমণ করে বসে।

সরোয়ার ঢাল দ্বারা তাদের আক্রমণ প্রতিহত করে এবং উচ্চকণ্ঠে আল্লাহু আকবার ধ্বনি তুলে পালটা আঘাত হানে। তার প্রথম আঘাতেই এক খ্রিস্টানের মস্তক উড়ে যায়। বাকি দুজন পূর্ণশক্তিতে তার উপর জোরদার আক্রমণ চালায়।

সরোয়ার দক্ষ যোদ্ধার মতো এই দ্বিতীয় আক্রমণও প্রতিহত করে পালটা আঘাত হেনে আরেক খ্রিস্টানকে হত্যা করে ফেলে। এখন বেঁচে আছে শুধু একজন। লোকটি ভয়ে থরথর করে কাঁপতে শুরু করে। সরোয়ার বলল– 'অস্ত্র ফেলে দাও।'

খ্রিস্টান লোকটি হাতের তরবারি ফেলে দিয়ে হাতজোড় করে বিনীতস্বরে প্রাণ ভিক্ষা চায়।

সরোয়ার লোকটাকে গ্রেফতার করে তার অস্ত্রগুলো হাতে নিয়ে জিজ্ঞেস করে– 'সত্য বলো, তোমরা কি গোয়েন্দা নও?'

ঃ হ্যাঁ, আমরা গোয়েন্দা।

ঃ এখানে কেন এসেছিলে?

ঃ মুসলমানদের যুদ্ধপ্রস্তুতি দেখতে এবং অন্যান্য খবরাখবর জানতে।

ঃ ধোঁকা দিয়ে আমাকে দেবসপুলিশের নির্জন অঞ্চলে নিয়ে যেতে চেয়েছিলে কেন?

ঃ আমরা জানতাম, মিসরের গভর্নর আবদুল্লাহ ইবনে সা'দ খলীফার নিকট আফ্রিকায় সেনাভিযানের অনুমতি চেয়ে দূত প্রেরণ করেছেন। আমরা খলীফার অনুমোদন নিয়ে আগমনকারী দূতকে গ্রেফতারের পরিকল্পনায় এখানে এসেছিলাম।

ঃ পেলে কী করতে?

ঃ আমাদের রাজা জর্জিরের আদেশ ছিল, খেলাফতের দূতকে ধরতে পারলে হয় হত্যা করে ফেলবে, নতুবা গ্রেফতার করে আফ্রিকা নিয়ে আসবে। তার পরিকল্পনা ছিল, খেলাফতের উত্তরপত্র মিসর না পৌঁছুক এবং মুসলমানরা উত্তরের অপেক্ষায় মিসরেই বসে থাকুক। এই ফাঁকে প্রস্তুতি গ্রহণ করে তিনি মিসর আক্রমণ করে ফেলবেন।

ঃ তা জর্জির কি মিসর আক্রমণের প্রস্তুতি সম্পন্ন করে ফেলেছেন?

ঃ হ্যাঁ, আপনি আমায় ক্ষমা করুন।

ঃ ক্ষমা কিংবা প্রাণভিক্ষার অধিকার আমার নেই। তোমাকে আমার সঙ্গে ফুসতাত যেতে হবে। আমাদের গভর্নর তোমার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবেন। ইচ্ছে করলে তিনি তোমাকে নিরাপত্তাও দিতে পারবেন।

ঃ ঠিক আছে, আমাকে আমীরের নিকট নিয়ে চলুন।

সরোয়ার খ্রিস্টান গোয়েন্দাকে নিয়ে ফুসতাত অভিমুখে রওনা হয়ে যায়।

তিন.

সরোয়ার খ্রিস্টান গোয়েন্দার নিকট থেকে যে-তথ্য লাভ করেছে, তা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মিসর পৌঁছানো একান্ত প্রয়োজন। তাই সে কয়েদিকে নিয়ে দ্রুত পথ অতিক্রম করতে শুরু করে।

তারা ফুসতাত প্রবেশ করেছে। মনে হল-খ্রিস্টান গোয়েন্দা ইতিপূর্বে কখনও কোনো ইসলামী নগরী দেখেনি। নগরীর একতলা ভবন, প্রশস্ত সড়ক আর উঁচু-উঁচু মসজিদ দেখে লোকটা বিস্ময়ে হতবাক্ হচ্ছে।

খ্রিস্টান অঞ্চলের বাড়িগুলো কয়েক তলা উঁচু, রাস্তা সরু-সংকীর্ণ এবং বসতি ঘন হয়ে থাকে।

গোয়েন্দার ধারণা ছিল, তাদের রাজা ও শাসকদের জীবন যেমন বিলাসবহুল, তেমনি মুসলিম খলীফা-গভর্নরদের জীবনও একই রকম বিলাসিতাপূর্ণ হবে। তাদেরও আলিশান ভবন থাকবে। ভবনের সম্মুখে সশস্ত্র পাহারা থাকবে এবং প্রহরীদের মাধ্যমে গভর্নরের সঙ্গে সাক্ষাতের অনুমতি গ্রহণ করতে হবে।

কিন্তু সরোয়ার তাকে নিয়ে ফুসতাতে এমন একটি সাধারণ ঘরের সম্মুখে গিয়ে দাঁড়ায়, যেটি না বিলাসবহুল, না তাতে কোনো প্রহরা আছে। দেখে লোকটি যারপরনাই বিস্মিত হয়ে পড়ে। জিজ্ঞেস করে– 'এটিই কি তোমাদের গভর্নরের বাসগৃহ?'

ঃ হ্যাঁ, আমাদের গভর্নর আবদুল্লাহ ইবনে সা'দ এ-ঘরেই বাস করেন।

ঃ কোনো পাহারা নেই?

ঃ না, আমাদের খলীফার পক্ষ থেকে কোনো গভর্নর কিংবা অফিসারের আলিশান গৃহ এবং তাতে পাহারা রাখার অনুমতি নেই, যাতে সাধারণ নাগরিক অনায়াসে তাদের নিকট পৌঁছুতে পারে, যে-কেউ যে-কোনো সময় তাদের

সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারে। দ্বিতীয় খলীফা হযরত ওমর ফারুক (রা.)-এর আমলেও এ-নিয়মই ছিল।

ঃ তোমাদের এই সরল জীবন সত্যিই ঈর্ষণীয়।

সরোয়ার গভর্নরের ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে 'ইয়া আমীর'! বলে এমনভাবে হাঁক দেয়, যেন সে কোনো সাধারণ মানুষকে ডাকছে।

মিসরের গভর্নর আবদুল্লাহ ইবনে সা'দ তৎক্ষণাৎ দরজা খুলে বেরিয়ে এসে আস্সালামু আলাইকুম বলে সালাম করেন। সরোয়ার ওয়া আলাইকুমুস সালাম বলে সালামের উত্তর দেয়। গভর্নর জিজ্ঞেস করেন– 'তুমি কি মদীনা থেকে এসেছ?'

সরোয়ার বলল– 'জি।'

আবদুল্লাহ ইবনে সা'দ বললেন– 'একটু অপেক্ষা করো।'

আবদুল্লাহ ইবনে সা'দ ঘরে গিয়ে একখানা কম্বল এনে ঘরের সামনে পেতে রাখা মাচানটার উপর বিছিয়ে দিয়ে সরোয়ার ও তার সঙ্গীকে তাতে বসার জন্য ইঙ্গিত করেন। খ্রিস্টান লোকটি ধরে নেয়, এই লোকটি গভর্নরের ভৃত্য এবং তাঁর এরূপ আরও অনেক চাকর আছে।

সরোয়ার ও তার সঙ্গী মাচানের উপর বসে। আবদুল্লাহ ইবনে সা'দও তাদের পাশে উপবেশন করেন।

ইত্যবসরে গভর্নরের গোলাম এসে সালাম দিয়ে দাঁড়িয়ে যায়। গভর্নর বললেন– 'ঘোষণা করে দাও, জনতা যেন অল্পক্ষণের মধ্যে আমার নিকট এসে সমবেত হয়।'

গোলাম চলে যায়।

আবদুল্লাহ ইবনে সা'দ সরোয়ারকে জিজ্ঞেস করেন– 'তোমার সঙ্গে এই লোকটি কে?'

সরোয়ার উত্তর দেয়- 'আফ্রিকার খ্রিস্টান রাজা জর্জিরের এক গোয়েন্দা।'

গভর্নর বললেন– 'শিকার কোথা থেকে ধরে এনেছ?'

সরোয়ার গভর্নরকে ঘটনার বৃত্তান্ত শোনায়।

গভর্নর বললেন– 'আফসোস, খ্রিস্টান গোয়েন্দারা মিসর ঢুকে পড়েছে আর আমি তা বলতে পারছি না! জর্জির নিশ্চয়ই আমাদের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করছেন।'

সরোয়ার বলল– 'তা-ই তো মনে হচ্ছে।'

এবার খ্রিস্টান গোয়েন্দা বুঝে ফেলে, যে-লোকটিকে সে ভৃত্য মনে করেছিল, তিনিই খেলাফতের গভর্নর। একজন গভর্নরকে এমন সাধারণ পোশাকে

সাধারণ ঘরে বাস করতে দেখে তার বিস্ময়ের সীমা রইল না।

বলা আবশ্যক, প্রথম যুগের মুসলিম শাসকরা সাধারণ মানুষের মতো এমনই সরলজীবন অতিবাহিত করতেন এবং তুচ্ছাতিতুচ্ছ যে-কোনো কাজ করতে কুণ্ঠিত হতেন না। কিন্তু কালক্রমে মুসলমানরা বিলাসিতার পথ অবলম্বন করে এবং তাদের মাঝে অলসতার ব্যাধি জন্ম নেয়। সেইসঙ্গে বীরত্ব ও ত্যাগ লোপ পেতে শুরু করে। তারই ধারাবাহিকতায় আমরা এখানে এসে পৌঁছেছি। এখন মুসলমান বিলাসিতা, সুখ ও ক্ষমতার জন্য নীতি-আদর্শ-ধর্ম সবকিছু ত্যাগ করতে প্রস্তুত।

খ্রিস্টান গোয়েন্দা মুসলমান গভর্নরের সরলতায় বিস্মিতমনে বসে আছে। ইতিমধ্যে গভর্নর যাদের ডেকে আনার জন্য গোলামকে প্রেরণ করেছিলেন, এক-এক করে তারা প্রায় সকলে এসে উপস্থিত হয়েছে। গভর্নর আবদুল্লাহ ইবনে সা'দ খ্রিস্টান গোয়েন্দাকে উদ্দেশ করে বললেন– 'তুমি ও তোমার সঙ্গীরা হত্যা কিংবা গ্রেফতার করার লক্ষ্যে একজন মুসলমানের উপর আক্রমণ করেছিলে। তোমাদের এই গুরুতর অপরাধের শাস্তি অত্যন্ত কঠিন। তবে একশর্তে আমি তোমাকে ক্ষমা করতে পারি। তা হল, আমি তোমাকে যা-যা প্রশ্ন করব, তুমি তার ঠিক-ঠিক উত্তর দেবে।'

ঃ আপনি জিজ্ঞেস করুন। আমার জানা থাকলে আমি সত্য-সত্যই জবাব দেব আলিজাহ!

ঃ দেখো, 'আলিজাহ', 'হুজুর কেবলা', 'মহামান্য' এবং এ-জাতীয় অন্যান্য শব্দ ও অভিধা তোষামোদের জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আমরা মুসলমানরা তোষামোদ করিও না, অন্যদের তোষামোদ পছন্দও করি না। তুমিও আমার শানে এ-জাতীয় কোনো শব্দ আর উচ্চারণ করবে না।

ঃ ঠিক আছে তা-ই হবে।

ঃ বলো, তোমাদের রাজা জর্জির কি মিসর আক্রমণের প্রস্তুতি গ্রহণ করেছেন?

ঃ জি, তিনি এক লাখেরও বেশি সৈন্যের সমাবেশ ঘটিয়েছেন।

ঃ আর আফ্রিকার ছোট-বড় সকল নেতা তার সঙ্গে আছে?

ঃ হ্যাঁ। তার কারণ হচ্ছে, রাজা জর্জিরের এক যুবতী মেয়ে আছে। মেয়েটি অনুপমা সুন্দরী। তার নাম হেলেন। সকল রাজপুত্র ও শাসক তার অনুরক্ত। তাকে পাওয়ার জন্য সবাই পাগলপারা। সকলেই রাজার প্রিয়ভাজন হয়ে তাকে সন্তুষ্ট করে রাজকুমারী হেলেনকে বিয়ে করতে উদগ্রীব।

ঃ আচ্ছা, মেয়েটি খুবই রূপসী, কথাটা কি সত্য?

ঃ মেয়ে তো নয়– আকাশের চাঁদ, স্বর্গের অপ্সরী, রূপের রানী। প্রকৃতি তাকে এত রূপ দান করেছে যে, যার চোখ পড়ে, সে তাকিয়েই থাকে। তা ছাড়া মেয়েটি বীরাঙ্গনাও বটে। রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হলে বিখ্যাত বীর যোদ্ধাকেও পরাজিত করে ছাড়ে।

ঃ সম্ভবত এই রূপসী মেয়েটির জন্য জর্জির অনেক গর্বিত!

ঃ তার অনেক গর্ব। হেলেন যাকে যে আদেশ করে, সঙ্গে-সঙ্গে তা পালিত হয়ে যায়।

ঃ আচ্ছা, আফ্রিকার সীমান্ত-রাজপুতরাও কি যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে?

ঃ দুর্গপতি দুর্গকে শক্ত করে ফেলেছেন, সেনাসংখ্যা বৃদ্ধি করেছেন। তাদের পরিকল্পনা হচ্ছে, যখন জর্জিরের বাহিনী মিসর অভিমুখে অগ্রসর হবে, তখন ওদিককার সকল দুর্গপতি তার সঙ্গে যোগ দেবে।

ঃ তুমি আমাকে অনেক মূল্যবান তথ্য প্রদান করেছ বলে আমি খুশি হয়েছি। এর বিনিময়ে আমি তোমাকে নিরাপত্তা দিলাম। তবে তুমি দিনকতক আমার মেহমান হয়ে থাকো। আমরা মর্যাদা অনুসারে তোমার খাতির-যত্ন করব।

এ-মুহূর্তে জীবনভিক্ষা পেয়ে খ্রিস্টান গোয়েন্দা বেশ উৎফুল্ল। তার দৃষ্টিতে এ এক পরম পাওয়া। সে জানে, যে-কোনো দেশে শত্রুগোয়েন্দা ধরা পড়ার অর্থই মৃত্যুদন্ড। সে বলল, আপনার সিদ্ধান্তে আমি প্রীত।

গভর্নর আব্দুল্লাহ ইবনে সা'দ (রা.) তাকে এক ব্যক্তির হাতে অর্পণ করে বৈঠক থেকে বিদায় করে দেন। এবার তিনি সভাসদদের উদ্দেশ করে বললেন– 'আপনারা কি সবাই আফ্রিকার সম্রাট জর্জিরের পরিকল্পনার কথা শুনেছেন?'

সকলে বলল, জি শুনেছি।

আব্দুল্লাহ ইবনে সা'দ সরোয়ারকে উদ্দেশ করে বললেন– 'এবার তুমি বলো, দরবারে-খেলাফতের আদেশ কী?'

সরোয়ার বলল– 'আমীরুল মুমিনীন হযরত ওসমান (রা.) আফ্রিকায় সেনাভিযানের অনুমতি প্রদান করেছেন।'

শুনে উপস্থিত মুসলমানগণ নারায়ে তাকবীর আল্লাহু আকবার ধ্বনি দিয়ে ওঠে।

সরোয়ার বলল– 'আপনার সাহায্যে অনতিবিলম্বে দারুল-খেলাফত থেকেও সৈন্য রওনা হবে। আমীরুল মুমিনীনের সিদ্ধান্ত হচ্ছে, আফ্রিকা পদানত করে আফ্রিকানদের আক্রমণ-আশঙ্কা দূর করতে হবে।'

গভর্নর বললেন– 'খলীফার এই বাসনা পূর্ণ হবে ইনশাআল্লাহ। মুসলিমগণ, আমাদের সাহায্যে বাহিনী আসছে। আমি চাচ্ছি, সেই বাহিনী এসে পৌঁছানোর আগেই আমরা আফ্রিকা আক্রমণ করে ফেলব।'

সকলে সমস্বরে বলল– 'আমরা আপনার সঙ্গে একমত।'

গভর্নর বললেন– 'ঠিক আছে, তোমরা প্রস্তুতি গ্রহণ করো। আমরা ইনশাআল্লাহ আগামী কাল ফজর নামায পড়েই তানজা ও তারাবলিসের উদ্দেশ্যে রওনা হব।'

গভর্নর বৈঠক মুলতবি করে দেন। সবাই যার-যার গন্তব্যে ফিরে যায়।

অল্প সময়ের মধ্যে সংবাদটা দাবানলের মতো ফুসতাতের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। মুসলমানগণ জিহাদের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে শুরু করে। পরদিন ফজর নামায আদায় করেই বাহিনী আফ্রিকার উদ্দেশ্যে রওনা হয়।

চার.

পালিয়ে-যাওয়া খ্রিস্টান গোয়েন্দা প্রথমে বারাকা গিয়ে পৌঁছয়। সেখান থেকে তারাবলিস ও তানজার মধ্যবর্তী এক সড়কপথে সাবতিলা অভিমুখে এগিয়ে যায়। সেকালে সাবলিতা আফ্রিকার রাজধানী ছিল। আফ্রিকার রাজা জর্জির সেখানে অবস্থান করতেন। খ্রিস্টান গোয়েন্দা দিনরাত পথ অতিক্রম করে সাবতিলা গিয়ে প্রবেশ করে।

সাবতিলা জাঁকজমকপূর্ণ বিশাল এক দুর্গ। অনেক উঁচু ও শক্ত তার প্রাচীর। চারদিকে আলিশান মজবুত ফটক। সকলের বিশ্বাস, এই নগরী জয় করার শক্তি কারও নেই।

নগরীর অধিবাসীরা স্বচ্ছল মানুষ। ব্যবসা ও কৃষি তাদের পেশা। যারা গরীব, তাদেরও রাজকীয় হাল।

গোয়েন্দা নগরীতে প্রবেশ করে রাজপ্রাসাদের দিকে অগ্রসর হতে শুরু করে। সে যে-পথে চলছে, সেটি অনেক প্রশস্ত। তার দুইধারে নগরীর শাসক-রইসদের বাড়ি।

আজ এ-রাস্তার দুদিকে বিপুল মানুষের সমাগম। অনেক শিশু-কিশোর ও নারী ভবনগুলোর ছাদে দণ্ডায়মান। গোয়েন্দা লোকদের জিজ্ঞাসা করে, এই ভিড় কিসের? উত্তর আসে, রাজকুমারী হেলেন শিকার করতে গিয়েছিলেন। আজ প্রত্যাবর্তন করবেন। কৌতূহলী মানুষ তাকে দেখার জন্য এই ভিড় জমিয়েছে।

খ্রিস্টান গোয়েন্দা এই নগরীরই অধিবাসী। কিন্তু আজ অবধি সে রাজকুমারীকে দেখেনি। তবে রূপবতী এই রাজকন্যাটিকে একনজর দেখার সাধ তার দীর্ঘদিনের।

গোয়েন্দার মনে আনন্দের বান বয়ে যায় যে, খ্রিস্টজগতের এই খ্যাতিমান রূপসী মেয়েটিকে দেখার সুযোগ পেয়ে গেছে।

উৎসুক জনতা সবাই মূল্যবান ও আকর্ষণীয় পোশাক পরিধান করে এসেছে। বিশেষ করে মহিলারা পরেছে মহামূল্যবান রেশমি পোশাক ও সোনা-রূপা-মাণিক্যের চকমকে গয়না-অলংকার। তারাও রূপসী। একজনের তুলনায় অপরজন অধিক সুন্দরী।

মনোমুগ্ধকর দৃশ্যটা অবলোকন করে-কবে এগিয়ে চলছে খ্রিস্টান গোয়েন্দা। কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর একস্থানে চেকপোস্টে বাধাপ্রাপ্ত হয় সে। আর আগে যাওয়ার অনুমতি নেই কারও। গোয়েন্দা দাঁড়িয়ে যায়।

হঠাৎ বাজনার চিত্তাকর্ষী এক শব্দ ভেসে আসে। সেইসঙ্গে উত্থিত হয় হর্ষধ্বনি। মুহুর্মুহু করতালি বাজতে শুরু করে। কারও বুঝতে বাকি নেই, রূপরানীর বাহন এগিয়ে আসছে।

রাজকুমারী হেলেন শিকার থেকে ফিরে আসছে। গোয়েন্দা যেদিক থেকে এসেছিল, সেদিক থেকেই এগিয়ে আসছে তার শোভাযাত্রা। গোয়েন্দা মোড় ঘুরিয়ে পিছনপানে তাকায়। সুমধুর বাজনা ও করতালির তালে-তালে মিছিলটি এগিয়ে আসছে। গোয়েন্দা ও তার কাছে অবস্থানরত সব মানুষ মন্ত্রমুগ্ধের মতো সেদিকে তাকিয়ে আছে। মিছিলের সর্বসম্মুখে বাদকদলের সুরেলা বাজনায় বিমোহিত হয়ে পড়ছে জনতা।

বাদকদল সামনের দিকে এগিয়ে যায়। এবার আত্মপ্রকাশ করে রাজকুমারীর বিশেষ বাহিনীর অশ্বারোহী ইউনিট। লাল উর্দি, স্বর্ণখচিত মূল্যবান পোশাক পরিহিত। সকলে বর্ম ও অস্ত্রসজ্জিত। পিঠে ঝুলছে ঢাল। অতিশয় ঠাট করে এগিয়ে আসছে তারা।

গোয়েন্দা দেখতে পায়, এই আরোহীদের থেকে অনেক দূরে প্রাসাদগুলোর উপর থেকে ফুল বর্ষিত হচ্ছে। সে বুঝে ফেলে, সকলের হৃদয়রানী রাজকুমারীকে ফুল ছিটিয়ে বরণ করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে বিশেষ বাহিনীর আরোহীরা এগিয়ে গেছে। এবার অগ্রসর হতে শুরু করেছে রূপসী নারীদের বহর।

বহরের সব কজন নারী-ই তন্বী-তরুণী এবং মেরুন বর্ণের আঁটসাঁট পোশাক পরিহিতা। এক কাঁধে তরবারি অপর কাঁধে ধনুক। পিঠে ঢাল ও তূনীর। হাতে ছোট-ছোট বর্শা। রূপ-যৌবনের ফুলকি ছড়িয়ে এগিয়ে আসছে তারা।

জনতা অপলকচোখে তাদের উপভোগ করছে। খ্রিস্টান গোয়েন্দার লোভাতুর দৃষ্টিও তোদের প্রতি নিবদ্ধ।

এই বহর অতিক্রান্ত হয়ে গেলে এগিয়ে আসে আরেকটি বহর। এটিও নারীর বহর। এদের বয়স প্রথম বহরের নারীদের তুলনায় কম। এরা সুন্দরী

কিশোরী। এরাও অস্ত্রসজ্জিতা। সকলের বাঁ হাতে ঘোড়ার লাগাম ও ধনুক। ডান হাতে একটি করে তির।

সূর্য এখন মাথার উপর। সূর্যের সোনালি কিরণে মেয়েগুলোর শ্রীমান মুখমন্ডলগুলো চিকচিক করছে। রূপরানী হেলেনের ভ্রমণসঙ্গী হওয়ার গর্বে বুক ফুলিয়ে এগিয়ে চলছে মেয়েগুলো। উৎসুক জনতা এদেরও দেখছে পলকহীন চোখে।

সম্মুখপানে এগিয়ে গেছে এ-বহরটিও। এল আরেকটি বহর। এটিও নারীর বহর। প্রতিজন নারী টগবগে যুবতী, অতিশয় রূপসী। পরনে সোনালি লেসজড়ানো দুধসাদা রেশমি পোশাক। মাথায় সোনার কাজকরা কালো রুমাল। আকার-গঠন আর রূপ-লাবণ্যে মেয়েগুলো যেন পূর্ণিমার চাঁদ। প্রত্যেকের হাতে ধারালো বর্শা।

হট্টগোল ধীরে-ধীরে নিকটে এগিয়ে আসছে। গোয়েন্দা বুঝে ফেলে, রাজকুমারী হেলেনের বাহন একেবারে সন্নিকটে চলে এসেছে।

রূপের এই আলোকময় চাঁদটাকে একনজর দেখার সাধ খ্রিস্টান গোয়েন্দার দীর্ঘদিনের লালিত স্বপ্ন। তাই শক্তপায়ে দাঁড়িয়ে পূর্ণ ধ্যানে পিছন দিকে তাকাতে শুরু করে। সে দেখে, এখনও ফুলবর্ষণ চলছে।

ক্ষণকালের মধ্যে এই নারীবহরটিও এগিয়ে যায়। এবার আত্মপ্রকাশ করে আরেক কিশোরী-কাফেলা। রূপ-সৌন্দর্যে এরাও অতুলনীয়া। হালকা গোলাপি রঙয়ের মিহি পোশাক পরিহিতা, যার পাড়, সমস্ত আস্তিন ও বুকজুড়ে সোনার কারুকাজ। দর্শনার্থীদের চোখ আটকে গেছে যেন তাদের লাবণ্যময় দেহ-চুম্বক। স্থিরচোখে তাকিয়ে আছে সকলে। কোমল হাতে ছোট-ছোট তরবারি ধারণ করে ঠাট করে এগিয়ে আসছে তারা। বিস্ময়-বিমোহিত মানুষগুলো যেন এক ঝাঁক নারীর রূপসাগরে হাবুডুবু খাচ্ছে।

এই বহরটি সম্মুখপানে অতিক্রান্ত হওয়ামাত্র রাজকুমারী হেলেনের বাহন নিকটে চলে আসে। উপস্থিত জনতার কয়েক হাজার চোখ একসঙ্গে তাকিয়ে আছে সেদিকে।

খ্রিস্টান গোয়েন্দাও নিষ্পলকচোখে তাকাতে শুরু করে। রাজকুমারী পালকিসদৃশ একটি গাড়িতে উপবিষ্টা। ষোলোটি ঘোড়া টেনে নিয়ে আসছে গাড়িটি। খাঁটি রুপার তৈরী গাড়ি। চাকাগুলো ছাড়া সবই রৌপ্যনির্মিত। অতিশয় সুদৃশ্য এক বাহনে চড়ে আসছে রূপরানী হেলেন।

গাড়ির ঘোড়াগুলোর পিঠে উপবিষ্ট মহামূল্যবান পোশাক ও অলংকার-পরিহিতা উদ্ভিন্নযৌবনা কয়েকটি কিশোরী। আকার-বর্ণ ও ভাবগতিতে বোঝা যাচ্ছে, মেয়েগুলো আমীর-উজিরদের সোহাগ-লালিতা কন্যা।

মেয়েগুলো এতই সুশ্রী-সুন্দরী যে, উৎসুক জনতার চোখ ফেরানোই দায় হয়ে পড়েছে। সূর্যের কিরণে তাদের ঝলমলে গন্ডদেশে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। মন-পাগলকরা চোখগুলো দর্শকদের উপর জাদু করছে।

রাজকুমারী হেলেন কারুকার্যখচিত মহামূল্যবান পোশাক পরিহিতা। সর্বাঙ্গ হীরে-মতি-পান্না ইত্যাকার মূল্যবান অলংকারে সজ্জিতা। কী-পোশাক, কী-অলংকার– কোনোটি থেকেই চোখ সরছে না কারও।

ফুলে-ফুলে ছেয়ে আছে গাড়ি। মাথায় মুকুটপরিহিতা রাজকুমারীর মুখমন্ডল নেকাবে ঢাকা। সে-কারণে উৎসুখ জনতার বাসনা অপূর্ণই থাকে। উদ্গ্রীব জনতার মনের বাসনা মনেই রয়ে যায়। নিজেদের হতভাগ্য বলে আক্ষেপ করছে সবাই।

রাজকুমারী হেলেনের গাড়িও অতিক্রান্ত হয়ে যায়। এগিয়ে আসে আরও একটি সুন্দরী নারীর বহর। তার পর আত্মপ্রকাশ করে বর্মপরিহিত এক পুরুষ-কাফেলা। অল্পক্ষণের মধ্যেই রাজকুমারী হেলেনের প্রত্যাবর্তন-মিছিল সমাপ্ত হয়ে যায়। উঠে যায় সেনাপ্রহরা। রাস্তায় জনতার চলাচল শুরু হয়ে যায়। খ্রিস্টান গোয়েন্দা হতাশমনে রাজপ্রাসাদ অভিমুখে এগোতে শুরু করে।

পাঁচ.

রাজকুমারী হেলেনের প্রেমে আসক্ত সাবাতিলা নগরীর সকল নারী-পুরুষ। তার ভালবাসায় পাগলপারা সমগ্র আফ্রিকার মানুষ। তাই যখনই সে কোথাও গমন কিংবা প্রত্যাগমন করে, তাকে বিদায় ও অভ্যর্থনা জানাতে এভাবে জনতার ঢল নামে, যেমনটি নেমেছে আজ।

রাজকুমারী হেলেন সচ্চরিত্রা নারী। যতটা রূপসী, ততটা সরল। মানুষের প্রতি তার সুধারণা এতই প্রবল যে, জনতার এই আবেগ-উচ্ছ্বাসকে সশ্রদ্ধ ভক্তি ছাড়া আর কিছুই মনে করে না সে। এই রূপ তাকে চরম অশুভ এক পরিণতিতে ঠেলে দিতে পারে, এমন কল্পনাও নেই তার মনে। ভাবে, আর দশটি মেয়ে যেমন, আমিও তেমনি এক নারী। এই রূপ, এই সরল দেহাবয়ব, এই হৃদয়কাড়া আঁখিযুগল এবং এই কাজল-সুন্দর ভুরু দর্শকদের কীরূপ মাতিয়ে তুলছে, সেই চৈতন্য নেই তার। আর সে-কারণেই ভ্রমণের সময় চাঁদ-সুন্দর মুখখানায় কোনো নেকাব থাকে না। কিন্তু আজ ঘটল তার ব্যতিক্রম। হাজার-হাজার তৃষিত চোখ আজ রূপরানীর দর্শন থেকে বঞ্চিত থাকল। এই বঞ্চিতদের একজন খলীফা ওসমানের দূত সরোয়ারের কবল থেকে পালিয়ে-আসা খ্রিস্টান গোয়েন্দা।

রাজকুমারী হেলেনের রূপদর্শনের ব্যর্থতা চাপা দিয়ে সম্মুখপানে এগিয়ে চলে গোয়েন্দা। রাজপ্রাসাদের প্রধান ফটকে পৌঁছে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে দাঁড়িয়ে যায় সে। প্রহরীরা জিজ্ঞেস করে– 'কে তুমি? কেন এসেছ?'

জানায়– 'আমি গোয়েন্দা। মিসর থেকে এসেছি। রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করা খুবই জরুরি।'

তৎক্ষণাৎ আফ্রিকার সম্রাট জর্জিরকে বিষয়টি অবহিত করা হয়। সম্রাট গোয়েন্দাকে আপন খাস কামরায় ডেকে পাঠান। দাসীদের পথনির্দেশনায় কক্ষে প্রবেশ করে গোয়েন্দা। রাজকক্ষের সাজগোজ ও সৌন্দর্য দেখে সে থ হয়ে যায়। নবদম্পতির বাসর-ঘরের মতো সাজানো কক্ষটি। একজন রাজার খাস কামরার সাজের কিছুই অবশিষ্ট রাখা হয়নি। রোমান জাজিমের মোটা ফরশ বিছানো। দেওয়ালে ও দরজায় সুপুষ্ট রোমান রেশমি কাপড়ের ঝলমলে পর্দা ঝুলানো। মাথার উপর মূল্যবান কাপড়ের শামিয়ানা। স্থানে-স্থানে ঝুলছে ও জ্বলছে রকমারি ঝাড়বাতি। হাতির দাঁতের পাতবসানো মনকাড়া চেয়ার ও টেবিল। টেবিলের উপর রুপোর ফুলদানিতে রাখা ফুলের সৌরভে মউ-মউ করছে কক্ষটি।

জর্জির একটি চেয়ারে উপবিষ্ট। মধ্যবয়সী পুরুষ। দাড়ি ও চুলে পাক ধরেছে। লাল-সাদা গাত্রবর্ণ। সুঠাম ও শক্তিমান। যৌবন বিগতপ্রায় হওয়া সত্ত্বেও এখনও নিজেকে নওজোয়ানই মনে করেন সম্রাট।

জর্জিরের সম্মুখস্থ এক মেঝেতে পানপাত্র রাখা আছে। কয়েকটি রূপসী মেয়ে চিত্তাকর্ষী ভঙ্গিতে টেবিলের অপর পার্শ্বে দন্ডায়মান। একজন রুপোর পাত্রে মদ ঢালছে। গোয়েন্দা কক্ষে প্রবেশ করেই মস্তক অবনত করে ভূতলে লুটিয়ে রাজাকে অভিবাদন জানায়।

এক রূপসী মেয়ে একটি পাত্র রাজার সম্মুখে রাখে। সম্রাট জর্জির পাত্রে চুমুক দিতে-দিতে গোয়েন্দার প্রতি তাকিয়ে বললেন– 'মাথা তুলে দাঁড়াও সেবক?'

গোয়েন্দা উঠে দাঁড়ায়। জর্জির মদগুলো কণ্ঠনালিতে পাচার করে শূন্য পাত্রটা মেয়েটির দিকে এগিয়ে দিয়ে রুমাল দ্বারা মুখ পরিষ্কার করে বললেন– 'আমি জানতে পেরেছি, তুমি মিসর থেকে এসেছ।'

গোয়েন্দা আদবের সঙ্গে ঝুঁকে উত্তর দেয়– 'আপনি ঠিকই শুনেছেন মহারাজ!'

ঃ তোমার অন্য সঙ্গীরা কোথায়?

ঃ জানি না। সম্ভবত তারা মারা পড়েছে।

ঃ মারা পড়েছে মানে?

জর্জির বিস্ময়মাখা কণ্ঠে জিজ্ঞেস করেন এবং বিস্ফারিত চোখে গোয়েন্দার প্রতি তাকান।

ভয়ে গোয়েন্দার কণ্ঠনালি শুকিয়ে যায়। সে কম্পিতকণ্ঠে বলল– মহারাজ! এ-ই আমার ধারণা।'

ঃ তুমি কি তাদের থেকে আলাদা হয়ে গিয়েছিলে?

ঃ না মহারাজ! আমরা চারজন একসঙ্গেই ছিলাম। কিন্তু...

ঃ মুসলমানরা তোমাদের চিনে ফেলেছে?

ঃ তা-ও নয় হুজুর। আমরা অনেক দিন মিসরে অবস্থান করি। তথাপি কোনো মুসলমান আমাদের শনাক্ত করতে পারেনি।

ঃ বড় আজব মানুষ তো তুমি! দল থেকে আলাদাও হওনি, শত্রুদের হাতে ধরাও পড়নি; অথচ বলছ, সম্ভবত অপর সঙ্গীরা মারা পড়েছে! তুমি কী বোঝাতে চাচ্ছ?

ঃ হ্যা, সে-কথাই বলছিলাম হুজুর!

ঃ বলো, কী বলতে চাচ্ছ। তুমি তো আমার মনে অস্থিরতা জন্ম দিয়েছ। কী ঘটেছে তাড়াতাড়ি বলে ফেলো।

ঃ হ্যাঁ হুজুর! তা-ই বলছিলাম।

ঃ বলো কী বলতে চাচ্ছ?

ঃ মহামান্যের নিশ্চয়ই মনে আছে, আমাদের চারজনকে আদেশ করা হয়েছিল, মুসলমানরা আমাদের পরিকল্পনার কথা জানতে পেরেছে কি-না এবং যদি জেনে থাকে, তা হলে রিপোর্টটা খলীফা পর্যন্ত পৌছেছে কি-না সেই তথ্য সংগ্রহ করি।

ঃ হ্যাঁ, আমার সবই মনে আছে।

ঃ জাহাঁপনা, আমরা মিসর প্রবেশ করেই তথ্য পেয়ে গেলাম, মুসলমানরা জেনে ফেলেছে, আফ্রিকার সম্রাট মিসর আক্রমণ করে সেখান থেকে মুসলমানদের তাড়িয়ে দেয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন।

জর্জির বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করেন, বিষয়টি তো একান্তই আমাদের গোপন রহস্য ছিল! তা তারা জানল কী করে?

ঃ সে-তথ্য আমরা উদ্‌ঘাটন করতে পারিনি হুজুর! তবে আমার ধারণা, সীমান্তবর্তী খ্রিস্টানরা আবেগতাড়িত হয়ে তথ্যটা ফাঁস করে দিয়েছে।

ঃ হতে পারে। আমি পবিত্র পিতা থেভঢোসকে বলেছিলাম, এখনই যেন সীমান্ত দুর্গপতিদেরকে আমার পরিকল্পনা সম্পর্কে অবহিত না করেন। কিন্তু তিনি আমার কথা শুনলেন না– তথ্যটা ফাঁস করে দিলেন। আমি নিশ্চিত তাদেরই কেউ-না-কেউ আবেগের বশবর্তী হয়ে ভুলটা করে ফেলেছে।

থেভঢোস সাবতিলা নগরীর প্রধান পাদরি। ধার্মিক হিসেবে লোকটির বেশ খ্যাতি ছিল। সাধারণ খ্রিস্টসমাজ ছাড়াও রাজপরিবার এবং সম্রাট নিজে তাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও মান্য করতেন।

ঃ আমার অনুমান এটাই হুজুর!

ঃ তোমার অনুমান ভুল নয়। আচ্ছা, মুসলমানরা কি প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে?

ঃ খুব জোরে-শোরে প্রস্তুতি চলছে। মিসরের ইসলামী গভর্নর খলীফাকেও সংবাদ পৌঁছিয়ে দিয়েছেন এবং খলীফা গভর্নরকে আফ্রিকা আক্রমণের অনুমোদন প্রদান করেছেন। এই অনুমোদনবার্তা নিয়ে হেজায থেকে দূত এসেছিল। ঘটনাক্রমে তার সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎও ঘটেছিল। আমরা তার থেকে সব তথ্য জেনে নিয়েছিলাম। কিন্তু মুসলমানরা বোধ হয় জাদুকর। লোকটা আমাদের গোপন পরিকল্পনা বুঝে ফেলে এবং নিজ থেকে অবলীলায় বলে ফেলে, 'তোমরা গোয়েন্দা।' বলেই সে আমাদের উপর আক্রমণ করে বসে। সৌভাগ্যক্রমে আমি তার কবল থেকে বেরিয়ে পালিয়ে আসতে সক্ষম হই। আমার ধারণা, সে আমার অপর তিন সঙ্গীকে মেরে ফেলেছে।

জর্জির সহসা ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন– 'হতভাগা কোথাকার! চারজন লোক একজন মুসলমানকে পরাস্ত করতে পারলে না!'

ঃ মহারাজ, একজন মুসলমানকে একশ খ্রিস্টানও কাবু করতে পারে না, তা চারজন কী আর করতে পারে!

ঃ তোমরা কাপুরুষ। আচ্ছা, এ-তথ্য তো পেয়েছ, মুসলমানরা আফ্রিকা আক্রমণ করছে?

ঃ আজ্ঞে জনাব!

ঃ আমি তাদের সেই সুযোগ দেব না। কালই মিসরের উদ্দেশ্যে বাহিনী প্রেরণ রওনা করব। তুমি এখন যাও।

গোয়েন্দা মাথা নুইয়ে সম্রাটকে কুর্নিশ করে ফিরে যায়। জর্জির তৎক্ষণাৎ পরদিন দরবার বসাবার নির্দেশ জারি করে মদ্যপানে আত্মনিয়োগ করেন।

ছয়.

জর্জির একজন প্রতাপশালী ও ক্ষমতাধর সম্রাট। খ্রিস্টজগতে তার অন্তহীন খ্যাতি ও মর্যাদা। সুবিশাল ও সুবিস্তৃত অঞ্চলের অধিপতি তিনি। তার শাসনাধীন অঞ্চল থেকে বছরে যে-ট্যাক্স উসুল হয়, তা দুই হাতে ব্যয় করার পরও কোষাগারে উদ্বৃত্ত থাকে। সামরিক শক্তিতেও বলিয়ান তিনি। প্রায় দেড়

লাখ সৈন্য আছে তার। এই সম্পদ ও সেনাবাহিনীর ভরসায় তিনি মিসরকে মুসলমানদের হাত থেকে ছিনিয়ে নেওয়ার সংকল্প আঁটেন। এভাবে শক্তি বৃদ্ধি করে সিরিয়া থেকে মুসলমানদের উৎখাত করার স্বপ্ন দেখছেন জর্জির।

খ্রিস্টানদের পরাজিত করে সিরিয়া ও মিসর জয় করেছিল মুসলমানরা। সম্রাট জর্জির এই বিজিত রাষ্ট্রগুলোকে পুনরুদ্ধারের চেষ্টায় আছেন। এর জন্য গোপনে-গোপনে প্রস্তুতিও শুরু করে দিয়েছেন তিনি। মিসর সীমান্তের দুর্গপতিদের প্রস্তুত থাকতেও আদেশ জারি করেছেন।

জর্জির দুটি কারণে এই সেনাভিযানের সাহস পেয়েছেন। প্রথমত, মিসর জয় করেছিলেন হযরত আমর ইবনুল আস (রা.) এবং তিনিই দেশটির গভর্নর নিযুক্ত হয়েছিলেন। কিন্তু তৃতীয় খলীফা হযরত ওসমান (রা.) তাঁকে পদচ্যুৎ করে আব্দুল্লাহ ইবনে সা'দকে মিসরের গভর্নর নিযুক্ত করেছেন। জর্জিরের ধারণা ছিল, আব্দুল্লাহ ইবনে সা'দ অতটা যোগ্য ও সাহসী নন, যতটা ছিলেন আমর ইবনুল আস। আব্দুল্লাহ ইবনে সা'দ হযরত ওসমান (রা.)-এর দুধভাই। অতিশয় ধর্মপ্রাণ ও মুত্তাকী মানুষ। খ্যাতিমান বীর যোদ্ধা হলেও তাঁর সহনশীলতা ও মানবতাবোধ ছিল প্রবল। তাই তাঁর স্বভাব ছিল কোমল। খ্রিস্টানরা তাঁর এই কোমলতা ও উদারতাকে দুবর্লতা মনে করে ধরে নিয়েছিল, তিনি তেমন বীর-সাহসী নন।

দ্বিতীয়ত, আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর ফারুক (রা.) বিশ্বময় একজন দূরদর্শী রাজনীতিক হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাবৎ বিশ্বের সকল রাজা-বাদশা তার ভয়ে থরথর করে কাঁপতেন। তাঁরই শাসনামলে ইউরোপ ও এশিয়ার দোর্দণ্ড প্রতাপশালী খ্রিস্টান সম্রাট হেরাক্লিয়াস পরাজিত হয়ে সিরিয়া থেকে পলায়ন করেছিলেন। তাঁর আমলেই ইসলামের মুজাহিদরা কেসরার সিংহাসনকে উলটে দিয়েছিল, তার রাজধানী এন্তাকিয়া জয় করেছিল, মিসর ও আর্মেনিয়া থেকে খ্রিস্টানদের বিতাড়িত করেছিল এবং হাজার হাজার বছরের প্রতিষ্ঠিত সাসানি রাজত্বের পতন ঘটিয়েছিল।

হযরত ওমর ফারুক (রা.)-এর ওফাতের পর হযরত ওসমান (রা.) খলীফা নিযুক্ত হন। তৃতীয় খলীফা হযরত ওসমান অতিশয় কোমলহৃদয় মানুষ ছিলেন। যুদ্ধ-বিগ্রহ পছন্দ করতেন না এবং একান্ত বাধ্য না-হলে সেনাভিযান পরিচালনা করতেন না। তাতে জর্জির ধরে নিয়েছিলেন, খলীফা ওসমানের দুর্বলতার সুযোগে মিসর-সিরিয়াকে মুসলমানদের হাত থেকে ছিনিয়ে নেওয়া সহজ হবে এবং তার সাম্রাজ্য কায়সার-কেসরা অপেক্ষাও শক্তিশালী হবে। এই

লক্ষ্যে তিনি সামরিক প্রস্তুতি এবং জয়ের স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিলেন।

জাঁকজমকপূর্ণ দরবার বসে। পরিষদের সকল সদস্য, রাজার উপদেষ্টামন্ডলি ও নগরীর বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ দরবারে উপস্থিত। দরবারহল লোকে লোকারণ্য। জর্জির বললেন–

'আফ্রিকার জানবাজগণ, আপনারা জানেন, আমি মিসর ও সিরিয়াকে পদানত করে আপন সাম্রাজ্য বিস্তৃত করার পরিকল্পনা হাতে নিয়েছি। এই রাষ্ট্র দুটি খ্রিস্টানদেরই ছিল। হিংস্র মুসলমানরা আমাদের হাত থেকে তা ছিনিয়ে নিয়েছে। তবে, এখন আমি অনায়াসে দেশ দুটি পুনরুদ্ধার করে ফেলব। যেই ইসলামী সেনাপতি মিসর জয় করেছিল, সে অতিশয় বীর ও কুশলী ছিল। সে পদচ্যুৎ হয়ে গেছে। তার স্থলে সাধারণ এক গভর্নর এসেছে, যে আগেরজনের ন্যায় সাহসী ও রাজনীতিবিদ নয়। আমরা সেনাভিযান পরিচালনা করতে যাচ্ছি শুনে সে ভয় পেয়ে গেছে।

'আমার অনুগত পারিষদ, উপদেষ্টামন্ডলি ও নাগরিকবৃন্দ, তোমরা যদি সামান্য বুদ্ধিমত্তা ও সাহসিকতার সঙ্গে কর্তব্য পালন করো, তা হলে মুসলমানদের পরাজিত করে তাদেরকে খ্রিস্টান রাজ্য থেকে বিতাড়িত করা কঠিন হবে না। বিশ্ব যখন জানবে, তোমরা হিংস্র মুসলমানদের পরাজিত করে তাড়িয়ে দিয়েছ, তখন পৃথিবী তোমাদের সমীহ করতে বাধ্য হবে। খ্রিস্টজগত তোমাদের প্রতি কৃতজ্ঞ হবে। মিসরে সেনাভিযান পরিচালনা করব কি করব না, সে-বিষয়ে তোমাদের সঙ্গে পরামর্শ করা-ই আমি যুক্তিযুক্ত মনে করি না। আক্রমণ চালাব, সে আমার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। তবে, আক্রমণ কীভাবে করব, সে-বিষয়ে পরামর্শ হতে পারে। তোমরা যার যার অভিমত ব্যক্ত করো।'

ভাষণ সমাপ্ত করে জর্জির নীরব হয়ে যান। সিংহাসনের সন্নিকটে এক চেয়ারে জনৈক বৃদ্ধ উপবিষ্ট। নাভি পর্যন্ত লম্বা দাড়ি। গায়ে পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত লম্বিত সাদা আবা। কালো বেল্ট দ্বারা কোমরটা বাঁধা। হাজার দানার জপমালা ঝুলছে গলায়। বুকে লাল কাপড়ের ক্রুশ। মাথায় উঁচু টুপি। হাতে মুক্তাখচিত বড় একটা ক্রুশ।

ইনিই সাবতিলা নগরীর প্রধান পাদরি। এরই নাম থেভঢোস। তিনি দাঁড়িয়ে বললেন–

'খ্রিস্টান জানবাজগণ, ক্ষোভে-দুঃখে আমার বুকটা ফেটে যাচ্ছে যে, সিরিয়া ও মিসর থেকে খ্রিস্টান রাজত্ব বিলুপ্ত হয়ে গেছে এবং আরবের জংলী ধর্মের অনুসারীদের– যারা নিজেদেরকে মুসলমান বলে দাবি করে– রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। খ্রিস্টানদের জন্য এ এক ভীষণ লজ্জার ব্যাপার যে, মুসলানরা

আমাদের উপর শাসন করছে, যেন খ্রিস্টানরা মুসলমানদের গোলাম হয়ে গেছে। আমি জানতে পেরেছি, মুসলমানরা যখন খুশি যে-কোনো গীর্জায় ঢুকে যাচ্ছে, যেন আমাদের গির্জা এখন আর আমাদের নিরাপদ আশ্রয়স্থল নয়। একজন ধর্মপ্রাণ খ্রিস্টানের জন্য এ এক ভীষণ পীড়াদায়ক বিষয়। বিষয়গুলোর প্রতি আফ্রিকার মহান সম্রাট জর্জিরের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। আপনি মিসর ও সিরিয়া পদানত করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেছেন বলে আমি আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমার ব্যক্তিগত অভিমত হচ্ছে, মুসলমানদেরকে শুধু মিসর-সিরিয়া থেকেই উৎখাত করা নয়– তাদের রাজধানী মদীনাও আক্রমণ করে তাদের পিষে মারতে হবে। তাদেরকে এমন দুর্বল করে ফেলতে হবে, যেন বহুদিন পর্যন্ত নিজপায়ে দাঁড়াতে না পারে। তাদের সকল পুরুষকে হত্যা করতে হবে, নারীদেরকে দাসী এবং শিশুদেরকে গোলাম বানাতে হবে। বলুন, আপনারা কি প্রস্তুত আছেন?'

চতুর্দিক থেকে সমস্বরে রব ওঠে– 'হ্যাঁ, আমরা প্রস্তুত আছি।'

থেভঢোসের চেহারা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। বললেন–

'আমি জানি, তোমরা খ্রিস্টান। বীরত্ব তোমাদের জীবনের অংশ। তোমরা মিসর-সিরিয়ার খ্রিস্টানদের ন্যায় ভীরু নও, যারা মুষ্টিমেয় মুসলমানের কাছে পরাজিত হয়ে আপন মাতৃভূমিব কর্তৃত্ব তাদের হাতে তুলে দিয়েছে। খ্রিস্টবাদের জন্য ইসলাম বড় এক শঙ্কা। ইসলামের যত প্রসার ঘটবে, খ্রিস্টবাদ তত সংকুচিত ও বিলুপ্ত হয়ে যাবে। এই শঙ্কাকে চিরতরে দূর করতে হলে যিশুখ্রিস্টের নাম নিয়ে বুক টান করে দাঁড়াতে হবে। আসুন, আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই, মুসলমানদের নিঃশেষ করে ইসলামের নাম-চিহ্ন মুছে ফেলি।'

থেভঢোস বসে পড়েন। দাঁড়ায় আরেকজন। বলতে শুরু করে–

'আমাদের জন্য বড় গৌরব ও আনন্দের বিষয় যে, আমাদের মহান সম্রাট হিংস্র ও জংলী মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। আমরা সর্বশক্তি ব্যয় করে যুদ্ধ করব। মুসলমানরা– যারা নিজেদেরকে বীর-বাহাদুর বলে দাবি করে– আমাদের মোকাবেলায় আসলে হার মানতে বাধ্য হবে। মিসর ও সিরিয়া থেকে মুসলমানদের বিতাড়িত করে আমাদের আরবদের উপরও আক্রমণ চালাতে হবে। তাদেরকে নিশ্চিহ্ন না-করা পর্যন্ত আমরা ঘরে ফিরব না।'

বক্তব্য শুনে জর্জির উজ্জীবিত হয়ে ওঠেন। তিনি বললেন– 'শাবাশ! আমার সিংহরা, শাবাশ! এমন জোশ ও জযবা থাকলে আমাদের কেউ হারাতে পারবে না।'

আরেক দরবারি দাঁড়িয়ে বলল– 'আপনি বারাকার সীমান্তবর্তী দুর্গপতিদের লিখে দিন, যেন তারা প্রস্তুত হয়ে যায় এবং অনতিবিলম্বে বাহিনী নিয়ে মিসরের দিকে এগিয়ে যায়। আমি নিশ্চিত, জোরদার লড়াই ব্যতীতই আমরা মিসর জয় করে ফেলব।'

জর্জির বললেন– 'মুসলমানরা আমাদের পরিকল্পনা জেনে ফেলেছে এবং মিসরের গভর্নর তার খলীফার নিকট আফ্রিকায় সেনাভিযানের অনুমিত প্রার্থনা করে বার্তা প্রেরণ করেছে।'

তৃতীয় এক দরবারি বলল– 'করতে দিন। আমরাও চাই, মুসলমানরা তাদের সবটুকু শক্তি নিয়ে মোকাবেলায় অবতীর্ণ হোক। আমরা তাদের ভয় করি না।'

থেভডোস বললেন– 'অকারণে ভীরু খ্রিস্টানরা মুসলমানদের ফুলিয়ে রেখেছে। অন্যথায় তারাও তো আমাদেরই ন্যায় মানুষ। তোমরা একটু সাহসিকতার পরিচয় দিতে পারলে তারা পরাজিত হয়ে পালিয়ে যাবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।'

অপর এক পারিষদ বলল– 'আমারও এ-ই মত। যুদ্ধের ময়দানে আমাদের সাহসিকতার পরীক্ষা হয়ে যাবে।'

জর্জির বললেন, ব্যস, আপনারা প্রস্তুতি শুরু করে দিন। আমি শীঘ্র রওনা হওয়ার আদেশ প্রদান করব।

থেভডোস বললেন, আমার একটি কথা আছে।

ঃ বলুন।

ঃ আমি চাচ্ছি, আপনি প্রিন্সেস হেলেনকে বাহিনীর সঙ্গে নিয়ে যাবেন।

ঃ কিন্তু, ও তো খুব লাজুক মেয়ে।

ঃ আমি জানি। প্রিন্সেস যতটা না লাজুক, তার চেয়ে বেশি সাহসিনী। তার যুদ্ধের ময়দানে উপস্থিত থাকা এই জন্যও জরুরি যে, তার উপস্থিতিতে খ্রিস্টান সেনারা বিক্রমী হয়ে যুদ্ধ করবে, মৃত্যুকে বরণ করে নেবে; তবু পরাজিত হয়ে পলায়ন করার লাঞ্চনা বরণ করবে না।

এক দরবারি বলল– 'পবিত্র পিতার এই ধারণা সম্পূর্ণ সঠিক।'

থেভডোস : আমার বক্তব্য স্পষ্ট। প্রিন্সেস হেলেন এতবেশি রূপসী যে, প্রত্যেক যুবক– সে যে-স্তরেই হোক না কেন– তার শুভদৃষ্টির প্রত্যাশী। তাই তার উপস্থিতিতে প্রত্যেক খ্রিস্টান জীবন বাজি রেখে যুদ্ধ করবে।

অপর এক পারিষদ : যখন সৈনিকরা জানতে পারবে, রূপরানী হেলেনও বাহিনীর সঙ্গে আছে, তখন তাদের জোশ ও সাহস বহুগুণ বেড়ে যাবে এবং রাজকুমারীকে

নিজেদের জানবাজি ও বীরত্বের প্রমাণ দেখানোর জন্য এমন ঘোরতর যুদ্ধ লড়বে যে, মোকাবেলায় মুসলামনদের দাঁড়িয়ে থাকাও দুষ্কর হয়ে পড়বে।

থেভঢোস : আমার বিশ্বাস, রণাঙ্গনে রাজকুমারীর উপস্থিতি আমাদের জয়ের নিশ্চয়তা বয়ে আনবে। এ-লক্ষ্যেই আমার এই প্রস্তাবনা।

জর্জির : ঠিক আছে, তা-ই হবে। হেলেন বাহিনীর সঙ্গে যাবে।

থেভঢোস : তা-ই যদি হয়, আপনি নিশ্চিত থাকুন; জয় আপনারই হবে।

জর্জির : যিশুখ্রিস্ট তা-ই করুন। আপনারা আজ থেকেই প্রস্তুতি গ্রহণ করুন। আমি আক্রমণাভিযান শীঘ্রই পরিচালিত করব।

সকলে সমস্বরে বলে ওঠে– 'আমরা তাড়াতাড়িই প্রস্তুত হয়ে যাব।'

দরবার মুলতবি হয়ে যায়। সম্রাট জর্জির উঠে চলে যান। বৈঠকের সদস্যবর্গও একে-একে বেরিয়ে যায়।

সাত.

বৈঠক শেষে থেভঢোস গির্জা অভিমুখে রওনা হন। শাহী গির্জার প্রধান পাদ্রী হওয়ার সুবাদে জনগণ তাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করে। সাক্ষাৎ পেলে মানুষ তাকে অবনতমস্তকে কুর্নিশ করে ও হাতে চুমো খায়। বিশেষ করে তার প্রতি মহিলাদের ভক্তি-শ্রদ্ধার অন্ত নেই। আশির্বাদ লাভের জন্য মহিলারা তার সম্মুখে নতজানু হয়ে বসে থাকে।

থেভঢোস কারও প্রতি চোখ তুলে তাকালে কিংবা হাত দ্বারা ইশারা করলে সে মনে করে তার ভাগ্যের দরজা খুলে গেছে এবং খোদা ও ঈসা মসীহ তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে গেছেন।

তিনি যদি কোন নারীকে বলেন, তোমার কোল আলোকিত হবে, তা হলে সে বুঝে নেয়, সে সন্তানের মা হবে, যদিও সে বন্ধ্যা হয়।

মোটকথা, তার প্রতি সর্বস্তরের নারী-পুরুষ ও শিশুদের অগাধ ভক্তি। স্বয়ং সম্রাট জর্জিরও তার অনুরক্ত। অধিকাংশ রাজনৈতিক বিষয়ে তিনি তার সঙ্গে পরামর্শ করেন থাকেন এবং সে মোতাবেক কাজ করেন।

থেভঢোস দরবারহল থেকে বের হয়ে শাহী গির্জার দিকে যাচ্ছেন। নিজের বুযুর্গি ও পবিত্রতা প্রমাণের জন্য দৃষ্টি তিনি অবনত করে হাঁটছেন, যাতে মানুষ মনে করে, দুনিয়ার প্রতি তাদের পাদরির কোন মোহ বা সম্পর্ক নেই।

জনতা জানত, থেভঢোস দরবারে গেছেন এবং এ-পথেই ফিরবেন। তাই বিপুলসংখ্যক মানুষ রাস্তার দুই ধারে এসে দাঁড়িয়ে যায়।

ওই তো থেভটোস আসছেন। উপস্থিত ভক্তবৃন্দ মাথা নুইয়ে কুর্নিশ করে তাকে অভিবাদন জানায়। কিন্তু তিনি কারও প্রতি চোখ তুলেও তাকাচ্ছেন না। তিনি আপনমনে মাথা ঝুঁকিয়ে চোখ অবনত করে সামনের দিকে এগিয়ে চলছেন। এভাবে তিনি শাহী গির্জার আলিশান ফটকে গিয়ে পৌছেন। এবার তিনি সিঁড়িতে আরোহণ করে সবচে উপরের ধাপে দাঁড়িয়ে জনতার প্রতি মুখ করে দাঁড়ান।

জনতা চুপচাপ নিচে দাঁড়িয়ে আছে। থেভটোস বললেন–

'আমার সন্তানরা, সম্রাট জর্জির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন, তিনি মিসর ও সিরিয়া আক্রমণ করে সেখান থেকে মুসলমানদেরকে তাড়িয়ে দেবেন। তোমরা প্রার্থনা করো, খোদাওন্দ ঈসা মসীহ যেন সম্রাটকে সাহায্য করেন এবং বিজয় দান করেন। আনন্দের সংবাদ হচ্ছে, রূপরানী রাজকুমারী হেলেনও বাহিনীর সঙ্গে যাবে। যাও আমার সন্তানরা, এবার বিশ্রাম নাও।'

জনতা আকাশ-কাঁপানো স্লোগান তোলে– 'রাজকুমারী হেলেনের জয় হোক, সম্রাট জর্জির চিরজীবী হোক।'

জনতা বিদায় নিয়ে চলে যায়। থেভটোস গির্জায় প্রবেশ করেন। কয়েক ফার্লং জায়গাজুড়ে প্রতিষ্ঠিত গির্জাটি। প্রধান ফটক দিয়ে ঢুকতেই অতিশয় মনোরম একটি বাগান। নানা জাতের ফুলবৃক্ষে সাজানো বাগানটি। এই বাগানেরই এক প্রান্তে আলিশান গির্জাটি। গির্জার বাইরে এখানে-ওখানে ছোট-ছোট কয়েকটি ঘর। এসব ঘরে অবস্থান করেন নিম্নস্তরের পাদরিরা। গির্জার পিছন দিকটার একটি মনোরম কক্ষে প্রধান পাদরি বাস করেন। অবশিষ্টগুলোতে থাকে তার সেবক-সেবিকারা।

থেভটোস বাগিচা অতিক্রম করে গির্জায় নিজকক্ষে প্রবেশ করেন। ঢুকেই দেখেন, এক যুবক কক্ষে বসে আছে।

থেভটোস কক্ষে প্রবেশ করামাত্র যুবক উঠে এগিয়ে গিয়ে তার সম্মুখে নতজানু হয়ে হাতে চুমো খায়। থেভটোস বললেন– 'সালওয়ানুস, তুমি এখানে!'

যুবকের নাম সালওয়ানুস। আফ্রিকার সম্রাট জর্জিরের সেনাপতি মারকুসের পুত্র। সে বলল– 'পবিত্র পিতা, আমি আপনার অপেক্ষায় বসে আছি।'

থেভটোস এগিয়ে গিয়ে জাজিমের উপর বসে বললেন– 'বস সালওয়ানুস!'

সালওয়ানুস থেভটোসের নিকটে এসে বসে। পকেট থেকে একটি থলে বের করে থেভটোসের দিকে এগিয়ে ধরে বলল– 'অধমের এই হাদিয়াটুকু গ্রহণ করুন।'

থেভডোস লোভাতুর দৃষ্টিতে থলেটির প্রতি তাকিয়ে বললেন– 'এতে কী আছে?'

ঃ কিছু স্বর্ণমুদ্রা।

ঃ কোনো প্রয়োজন ছিল না।

ঃ হুজুরের সেবা করা আমার কর্তব্য।

থেভডোস খানিক বিরক্তি প্রকাশ করে বললেন– 'আমার সেবা! আমি সোনা-দানার কাঙাল নাকি!'

সালওয়ানুস ঘাবড়ে যায়। আমতা-আমতা করে বিনীতকণ্ঠে বলল– 'না, মানে– আমরা সব খ্রিস্টানই জানি, আপনি জগতের সম্পদকে তুচ্ছ জ্ঞান করেন এবং দুনিয়ার প্রতি আপনার প্রচণ্ড অনীহা। আমি ভালো করেই জানি, আপনার সোনা-দানার কোনোই প্রয়োজন নেই। এই নজরানা সেই অভাবীদের জন্য, যাদের আপনি প্রতিপালন করেন।'

সালওয়ানুসের বক্তব্যে থেভডোস খুশি হয়ে বললেন– 'তা হলে ঠিক আছে। তুমি থলেটা সামনের ওই আলমারিটায় রেখে দাও; আমি ভৃত্যের মাধ্যমে এগুলো গরীবদের মাঝে বিলিয়ে দেব, তোমার অনেক পুণ্য হবে।'

ঃ এই কারণেই আমি যখনই দান-খয়রাত করার মনস্থ করি, আপনার নিকট নিয়ে আসি।'

সালওয়ানুস উঠে থলেটা পাদরির দেখিয়ে-দেওয়া আলমারীতে রেখে দেয়। ফিরে এসে শান্তমনে বসলে থেভডোস জিজ্ঞেস করেন– 'এবার বলো, এই অসময়ে আগমনের উদ্দেশ্য কী?'

সালওয়ানুস সবটুকু বিনয় প্রকাশ করে বলল– 'পবিত্র পিতা, আপনি তো জানেন, আমি কোন বেদনা ও বিপদে নিপতিত আছি!'

থেভডোস দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে আক্ষেপভরা চোখে যুবকের প্রতি তাকিয়ে বললেন– 'এখনও কি তোমার অন্তর থেকে হেলেনের ভাবনা দূর হয়নি?'

ঃ হয়নি এবং হবেও না। আমি তাকে ভুলে যাওয়ার সর্বাত্মক চেষ্টা করেছি; কিন্তু পারিনি।

ঃ তুমি যদি অন্য রূপসী মেয়েদের জড় করে বিনোদন করতে, তা হলে ওকে ভুলে যেতে।

ঃ সেই কৌশলও অবলম্বন করেছি। রূপসী মেয়েদের সমবেত করে দিনরাত ফুর্তি করেছি। কিন্তু পবিত্র পিতা, হৃদয় থেকে এক মুহূর্তের জন্যও রাজকুমারী হেলেনের ভাবনা দূর হয়নি।

ঃ কিন্তু চিন্তা করে দেখোনি, রাজকুমারী হেলেনের সঙ্গে তোমার বিবাহ

কোনোক্রমেই সম্ভব নয়। ও হচ্ছে রূপরানী রাজকন্যা আর তুমি একজন সাধারণ খ্রিস্টান।

ঃ আমি জানি। আমি ভালোভাবেই বুঝি, রাজকুমারী হেলেনকে বিয়ে করার কল্পনা করাও আমার পক্ষ্যে চরম নির্বুদ্ধিতা। কিন্তু হৃদয় তো আমার কথা শোনে না। তার ভালবাসার আগুনে আমি দিনরাত পুড়ে মরছি। পবিত্র পিতা, একমাত্র আপনিই আমাকে এই আগুন থেকে রক্ষা করতে পারেন।

ঃ তোমার জন্য আমার করুণা হয়। ভাবো, আমি কী করতে পারি।

ঃ মহারাজের উপর আপনার অনেক প্রভাব রয়েছে। আপনি বললে তিনি ফেলবেন না। আপনি একটু চেষ্টা করলে আমার ভাগ্যের তারকা চমকাতে পারে।

ঃ অসম্ভব। এ-ব্যাপারে একটু ইঙ্গিত করলেও সম্রাট জর্জির মাইন্ড করতে পারেন।

সালওয়ানুস নিরাশকণ্ঠে বলল– 'তা হলে কি আমি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হয়ে যাব? আমি কি তা হলে আত্মহত্যা করব?'

ঃ না, আমি তোমাকে সেই পরামর্শও দিতে পারি না। তবে একটি বুদ্ধি আছে। সেই বুদ্ধিটা প্রয়োগ করলে তোমার আকাঙ্ক্ষা পূরণ হতে পারে।

সালওয়ানুসের মুখটা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, যেন তার হালে পানি এসেছে। জিজ্ঞেস করে– 'বলুন হযরত, কী করব আমি?'

ঃ সে-কথা এখনই বলব না। আগে বলো, তুমি যুদ্ধে যাবে কি-না?

ঃ যুদ্ধে গেলে যদি লক্ষ্য অর্জিত হয়, তা হলে অবশ্যই যাব।

ঃ যুদ্ধ করে যদি তুমি আমার কাঙ্খিত মানের খ্যাতি অর্জন করতে পার, তা হলে নিশ্চিত থাকো হেলেন তোমারই হবে।

ঃ তার জন্য আমি জীবনের বাজি লাগাতেও প্রস্তুত আছি।

ঃ শোনো সালওয়ানুস, প্রবল সম্ভাবনা আছে, রাজকুমারী হেলেনকে নিলামে উঠানো হবে।

সালওয়ানুস বিস্মিতকণ্ঠে বলল– 'নিলামে উঠানো হবে! সম্রাট জর্জির তাঁর একমাত্র কন্যাকে অর্থের বিনিময়ে বিক্রি করবেন!'

থেভঢোস শান্তকণ্ঠে বললেন– 'না, অর্থের বিনিময়ে নয়; নিলামটা হবে মাথার বিনিময়ে।'

ঃ আমি মাথার বাজি লাগাব।

ঃ তা হলে তুমি সাফল্যের আশা রাখতে পার।

ঃ তুমি যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করো এবং বাহিনীর সঙ্গে রওনা হও। রাজকুমারী হেলেনও সঙ্গে যাবে। তোমার ভাগ্য প্রসন্ন হলে হেলেন তোমারই হবে।

ঃ আমি আপনার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

সালওয়ানুস উঠে পাদরির হাতে চুমো খেয়ে ফিরে যায়।

সালওয়ানুস চলে যাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে পাদরির স্ত্রী কক্ষে প্রবেশ করে বলল– 'আমি তো আশঙ্কা করেছিলাম, তুমি স্বর্ণমুদ্রাগুলো ফিরিয়ে দেবে।'

পাদরি হেসে বললেন– 'নিজের পবিত্রতা ও সাধুতা বজায় রাখতে এ-ধরনের কথা বলতে হয়। যাও, থলেটা নিয়ে নাও।'

পাদরির স্ত্রী আলমারি খুলে থলেটা হাতে নিয়ে হাসতে-হাসতে ফিরে যায়।

আট.

খলীফাতুল মুসলিমীন হযরত ওসমান (রা.) ঘোষণা করেছিলেন, ইসলামী ফৌজ আফ্রিকার উদ্দেশ্যে রওনা হবে; যারা জিহাদে অংশগ্রহণ করতে আগ্রহী, তারা যেন মিনার ময়দানে গিয়ে সমবেত হয়। শাহাদাতের পিয়াসী মুজাহিদগণ মিনায় গিয়ে সমবেত হতে শুরু করেছে। অল্প সময়ের মধ্যে প্রায় বিশ হাজার মুজাহিদ সমবেত হয়ে যায়।

এই বাহিনীতে যুবক-তরুণদের সংখ্যাই বেশি। প্রবীণ সাহাবীদের উজ্জীবিত সন্তানরা আফ্রিকা অভিযানে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। হযরত ওমর ফারুক (রা.)-এর পুত্র আবদুল্লাহ, আলী (রা.)-এর পুত্র হাসান ও হুসাইন, আব্বাস (রা.)-এর পুত্র আব্দুল্লাহ ও হযরত যুবাইর (রা.)-এর পুত্র আবদুল্লাহ প্রমুখ বিশিষ্ট তরুণ মুসলমান এই যুদ্ধে শরীক হয়েছিলেন। একাধিক আব্দুল্লাহর সমাবেশ ঘটেছিল এ-যুদ্ধে। তারা শুধু জিহাদের স্পৃহা ও শাহাদাতের তামান্না বুকে নিয়ে মাতৃভূমি ত্যাগ করে সুদূর আফ্রিকা যেতে প্রস্তুত হয়েছিলেন।

এই তরুণদের অংশগ্রহণে জনতার মাঝে জিহাদের প্রবল স্পৃহা জেগে ওঠে। দেখতে-না-দেখতে বিপুলসংখ্যক মুজাহিদ সমবেত হয়ে যায়। এখন প্রায় বিশ হাজার মুজাহিদ মিনার ময়দানে উপস্থিত। অনেকে পরিবার-পরিজন সঙ্গে করে নিয়ে এসেছেন।

পরিজন ও স্ত্রী-সন্তানদের সঙ্গে নিয়ে জিহাদে যোগদান করা সে-যুগের মুসলমানদের রীতি ছিল। অন্য কোনো জাতি যুদ্ধের সময় পরিজন সঙ্গে রাখত না। প্রবল ঝুঁকি মাথায় নিয়ে এ-কাজটি করার সাহস তাদের ছিল না। পরাজিত হলে স্ত্রী-সন্তানরা শত্রুর হাতে চলে যাবে এই আশঙ্কায় তারা তটস্থ থাকত। বিপরীতে মুসলমানরা ভাবতও না যে, তারা পরাজিত হবে আর

তাদের স্ত্রী-সন্তানরা শত্রুর হাতে পড়ে নিগৃহীত হবে। তারা যুদ্ধ করত আল্লাহর উপর ভরসা করে। তাদের বিশ্বাস থাকত, আল্লাহ্ তাদের সাহায্য করবেন এবং যুদ্ধে তারাই জয়ী হবে।

পরিজনসহ হাবীবও যোগ দিয়েছেন এ-বাহিনীতে। তার এক কন্যা আছে সালমা। মেয়েটি যেমন রূপসী, তেমন বাহাদুর। সরোয়ারের সঙ্গে বিয়ে ঠিক হয়েছে তার। বিয়ের দিন-তারিখও ঠিক হয়েছিল। কিন্তু আফ্রিকা যুদ্ধের কারণে তারিখ মুলতবি হয়ে গেছে। সরোয়ার দূত হয়ে মিসর গেছে। হাবীবও পরিজনসহ আফ্রিকার উদ্দেশ্যে প্রস্তুত হয়ে এসেছেন।

আমীরুল মুমিনীন হযরত ওসমান (রা.) যখন জানতে পারলেন, বাহিনীর সেনাসংখ্যা বিশ হাজার হয়ে গেছে, তখন তিনি আদেশ জারি করেন, আগামী কাল জুমার নামাযের পরপরই বাহিনী রওনা হবে।

এ-আদেশ জারি হয় বৃহস্পতিবার। মুজাহিদদের বিদায় জানানোর জন্য মদীনার আমজনতা হুমড়ি খেয়ে পড়ে। সামর্থ অনুযায়ী উপহার-সামগ্রী নিয়ে প্রতিজন মানুষ মিনায় পৌঁছে যায় এবং মুজাহিদদের খাতির-যত্ন শুরু করে। খলীফা উসমান (রা.) ঘোষণা দেন, জুমার নামায মিনায় আদায় করা হবে।

পরদিন শুক্রবার সকাল থেকেই মদীনাবাসী মিনা অভিমুখে ছুটতে শুরু করে। বালুকাময় প্রান্তরটা দূর-দূরান্ত পর্যন্ত লোকারণ্য হয়ে গেছে। কিশোর, যুবক, বৃদ্ধ সবাই উপস্থিত আছে। আছে কিছু নারীও। তারা আপাদমস্তক আবৃতা হয়ে স্বজন মুজাহিদদের বিদায় জানাতে এসেছে।

আরব গরম দেশ। ভারতবর্ষের তুলনায় সে-দেশে গরম বেশি। সে-কারণে সূর্য উদিত হয়ে সামান্য উপরে উঠে এলেই প্রখর উত্তাপ ছড়িয়ে পড়ে এবং বালুকাময় প্রান্তর উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। বেলা বাড়ার সঙ্গে-সঙ্গে আগুনের মতো গরম হয়ে ওঠে পরিবেশ। কিন্তু মুসলমানরা এই উত্তাপ সহ্য করতে অভ্যস্ত। যতই গরম হোক, তারা কোনো কষ্টই অনুভব করে না। আজ কিছুটা বাতাস বইছে। তাই গরম খানিকটা কম।

দুপুরে সবাই মিনার ময়দানে বসেই আহার করে। প্রায় পঞ্চাশ হাজার মানুষ। দূর-দূরান্ত পর্যন্ত কোথাও তিল ধারণের ঠাঁই নেই। মুজাহিদগণ এবং তাদেরকে বিদায় জানাতে আসা স্বজনদের পদচারণায় গমগম করছে মিনার বিস্তৃত ময়দান।

নারী-পুরুষ সবাই উৎফুল্ল। সবচে বেশি আনন্দিত শিশু-কিশোররা। তারা এদিক-ওদিক ছোটাছুটি করছে এবং পিতা-মাতার সঙ্গে জিহাদে গমনকারী অন্য-শিশুদের সঙ্গে মিলিত হচ্ছে।

আহার সমাপ্তির কিছুক্ষণ পর আমীরুল মুমিনীর হযরত ওসমান (রা.) এসে উপস্থিত হন। সঙ্গে শেরে-খোদা হযরত আলী (রা.), আবুযর গিফারী (রা.), আমর ইবনুল আস (রা.), তালহা ও যুবাইর (রা.)।

হযরত ওসমান (রা.) মুজাহিদ-বাহিনী এবং তাদের বিদায় জানাতে আসা মুসলমানদের দেখে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন। জুমার নামাযের সময় হয়ে গেছে। কয়েক ব্যক্তি সম্মিলিতকণ্ঠে হৃদয়ছোঁয়া সুরে আযান দেয়।

আযানের আওয়াজ শোনামাত্র মুসলমানগণ সব কাজ পরিত্যাগ করে ওজু করতে শুরু করে। মহিলারাও একধারে সমবেত হয়ে ওজু করে নামাযের প্রস্তুতি গ্রহণ করে।

প্রস্তুত হয়ে সকলে বিস্তৃত এক মাঠে সমবেত হয়। খলীফাতুল মুসলিমীন হযরত ওসমান (রা.) একটি উটের পিঠে দাঁড়িয়ে খুতবা দেন। খুতবা সমাপ্ত করে তিনি মুসল্লায় এসে দাঁড়ান। হযরত আলী (রা.) ইকামত দেন।

নামায় শেষে হযরত ওসমান (রা.) যুবক মুজাহিদদের মধ্য থেকে হযরত হাসান, হযরত হুসাইন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ও আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইরকে (রা.) কাছে ডাকেন।

তারা খলীফা হযরত ওসমানের নিকট এসে বসেন। হযরত তালহা, আলী, যুবাইর ও আমর ইবনুল আসও (রা.) এসে উপস্থিত হন।

হযরত ওসমান বললেন–

'আমার সন্তানগণ, আমি এখনও কাউকে এই বাহিনীর সেনাপতি নিযুক্ত করিনি। একজন যুবক মুজাহিদকে আমি সেনাপতি নিযুক্ত করতে চাই। বীর যুবক মুজাহিদদের মাঝে তোমরা রাসূলে খোদা (সা.)-এর দুই নাতি হাসান ও হুসাইন, ফারুকে আজম হযরত ওমরের পুত্র আব্দুল্লাহ, প্রিয়নবীর চাচা হযরত আব্বাসের পুত্র আব্দুল্লাহ এবং ইসলামের সিংহ হযরত যুবাইরের পুত্র আব্দুল্লাহ উপস্থিত আছ। আমি তোমাদেরই একজনকে সেনাপতি নিযুক্ত করতে চাই। আরেকটি জরুরি কথা হচ্ছে, আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর এই বাহিনীর সঙ্গে যাবে না। তাকে অন্য বাহিনীর সঙ্গে প্রেরণ করব। আমি জানি, এই সিদ্ধান্তে সে কষ্ট পাবে; কিন্তু এটাই আমার সিদ্ধান্ত।'

আমীরুল মুমিনীনের সিদ্ধান্ত অমান্য করার সাহস কারও নেই। আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রা.) বললেন– 'আমি এই বাহিনীর সঙ্গে যাওয়ার জন্যই বের হয়েছিলাম। কিন্তু আমীরুল মুমিনীর না চাইলে আমি যাব না। আমীরুল মুমিনীনের সিদ্ধান্তকে আমি শিরোধার্য মনে করি।'

হযরত ওসমান বললেন– 'প্রিয় বৎস, আমি অনতিবিলম্বেই তোমাকে অন্য বাহিনীর সঙ্গে প্রেরণ করব। আচ্ছা, এবার আমরা সেনাপতি নিযুক্তির কাজটা শেষ করে ফেলি; তোমরা যার-যার অভিমত ব্যক্ত করো।'

হযরত হাসান (রা.) দাঁড়িয়ে বললেন– 'আমার মনে কখনও নেতৃত্বের আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হয়নি এবং আল্লাহ চাহেন তো কোনোদিন হবেও না। আমি আবু তোরাবের সন্তান। আমার আব্বাজানও কখনও নেতৃত্বের লোভ করেননি। যিনি নিজ সঙ্গীদের সবচে বেশি সেবা করেন, তিনিই নেতা নিযুক্ত হন। আমি এর যোগ্য নই। তাই সেনাপতি-নিযুক্তিতে আমার নাম প্রস্তাব না-করলেই আমি খুশি হব।'

পুত্রের ঈমান-আলোকিত বক্তব্যে হযরত আলী (রা.) খুশি হয়ে বললেন– 'আমার কলিজার টুকরো ঠিকই বলেছে এবং সে আমার মনের কথাই ব্যক্ত করেছে। নেতৃত্ব হচ্ছে কাঁটার মুকুট। সেনাপতি হওয়ার চেয়ে সাধারণ সৈনিক হয়ে কাজ করা অনেক সহজ ও নিরাপদ।'

হযরত ওসমান (রা.) হযরত আলীকে উদ্দেশ করে বললেন– 'আর বলবেন না। আপনি পুত্রদেরকে নেতৃত্ব গ্রহণ না-করার দীক্ষা দেবেন না। আপনি জানেন না, আপনার পুত্রদের প্রতি আমার ও সমস্ত মুসলমানদের অনুরাগ ও ভালবাসা কতখানি।'

হযরত আলী (রা.) বললেন– 'আমি তা জানি। আমি আপনার ও সকল মুসলমানের প্রতি কৃতজ্ঞ। আসল কথা হচ্ছে, আমি যেমন নিজে মুসলমানদের সেবক হতে আগ্রহী, তেমনি কামনা করি, আমার সন্তানরাও মুসলমানদের সেবা করুক। আপনি যদি আমার মতামত কামনা করেন, তা হলে এই অভিযানের সেনাপতি হিসেবে আমি ওমরের পুত্র আব্দুল্লাহকে উপযুক্ত মনে করি।'

হাসান (রা.) বললেন– 'আব্দুল্লাহ ভাই বয়সে আমার বড় এবং বেশি পরহেযগার ও বাহাদুর। তাই আমার মতে সে-ই সেনপাতি হওয়ার অধিক যোগ্য।'

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বললেন– 'কিন্তু যে-বাহিনীতে আল্লাহর রাসূল (সা.)-এর প্রিয় দৌহিত্র এবং শেরে-খোদা হযরত আলী ও নবীজির প্রিয়তমা কন্যা খাতুনে জান্নাত হযরত ফাতেমার পুত্ররা আছে, সেই বাহিনীর সেনাপতি আমি হই কী করে?'

হযরত হুসাইন (রা.) আব্দুল্লাহ ইবনে ওমরকে (রা.) উদ্দেশ করে বললেন– 'আব্দুল্লাহ ভাই, তোমার হৃদয়ে যদি আমাদের প্রতি অনুরাগ ও ভালবাসা থাকে, তা হলে আমি বলছি দায়িত্বটা নিয়ে নাও।'

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমরের চোখ অশ্রুসজল হয়ে ওঠে। বললেন– 'আমি আপনার আদেশ অমান্য করতে পারি না। আমার মনে আছে, একবার ইরান থেকে গনীমত এসেছিল। হযরত ওমর (রা.) ভাগে আপনাকে আমার চেয়ে বেশি দিলে বিষয়টি আমার কাছে অপ্রীতিকর ঠেকেছিল। আমি আপত্তি জানালে তিনি বলেছিলেন, তোমার নানা আর হুসাইনের নানা কি সমান? তোমার মা আর হুসাইনের মা কি এক? তোমার পিতা কি হুসাইনের পিতার সমান?

'এই উত্তরে আমার অন্তর শান্ত হয়ে গিয়েছিল। আমি অনুতপ্ত হয়ে নিজেকে ধিক্কার দিয়েছিলাম, কেন আমি রাসূলে খোদার নাতি হুসাইনের সমান হওয়ার দাবি করলাম।'

হযরত আলী (রা.) দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন– 'আল্লাহর কসম, ওমর একজন নিঃস্বার্থ মানুষ ছিলেন। আমাদের সঙ্গে তিনি কীরূপ আচরণ করেছেন, তা আমাদের জানা আছে। আমার সন্তানগণ, তাঁর কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তোমরা আমাদের হৃদয়ে বেদনার তির নিক্ষেপ করেছ। আল্লাহ তাঁকে জান্নাতুল ফিরদাউস নসীব করুন। তিনি কোনোদিন কোনো পরিস্থিতিতে আমাদেরকে ভোলেননি। আব্দুল্লাহ, এই বাহিনীর সেনাপতি হিসেবে আমি তোমার নাম প্রস্তাব করছি। তুমি দায়িত্বটা স্বাচ্ছন্দ্যে বরণ করে নাও।'

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর বললেন– 'আমীরুল মুমিনীন সিদ্ধান্ত দিলে আমি গর্বের সঙ্গে গ্রহণ করব।'

হযরত ওসমান (রা.) বললেন– 'কত ভালো মানুষ তোমরা। যতদিন মুসলমানদের মাঝে ঐক্য, ভ্রাতৃত্ব ও আন্তরিকতা বজায় থাকবে, ততদিন কোনো জাতি তাদের পদানত করতে পারবে না। আচ্ছা আব্দুল্লাহ, এই পতাকাটি নাও।'

ইসলামের ঝান্ডা হযরত ওসমানের মুসল্লার এক পার্শ্বে গাড়া ছিল। তিনি সেটি তুলে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমরের দিকে এগিয়ে ধরেন।

নয়.

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) দুপা এগিয়ে পতাকাটি হাতে নেন। হযরত হাসান ও হুসাইন (রা.) তাকবীরধ্বনি দিয়ে ওঠেন। সকল মুসলমান আল্লাহু আকবার স্লোগান তুলে আকাশ-বাতাস মুখরিত করে তোলে। মিনার সুবিশাল প্রান্তর কেঁপে ওঠে মুসলমানদের আকাশ-কাঁপানো তাকবীরধ্বনিতে।

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর পতাকাটি উর্ধ্বে তুলে ধরেন। বাতাসের ঝাপটায়

ইসলামী পতাকা পতপত করে উড়তে শুরু করে।

হযরত ওসমান (রা.) সেনাপতি আব্দুল্লাহ ইবনে ওমরকে বসতে ইঙ্গিত করেন। তিনি পতাকাটি হাতে নিয়ে বসে পড়েন। সকল মানুষ নীরব হয়ে হযরত ওসমানের বক্তব্য শুনতে উৎকীর্ণ হয়ে যায়।

খলীফাতুল মুসলিমীন হযরত ওসমান (রা.) যে-উটের পিঠে দাঁড়িয়ে জুমার খুতবা দান করেছিলেন, সেটিতে আরোহণ করে উচ্চকণ্ঠে বলতে শুরু করেন–

'ইসলামের মুজাহিদগণ, আমি সেই মহান আল্লাহর প্রশংসা করছি, যিনি বিশ্বজগতকে সৃষ্টি করেছেন। যিনি সমুদ্রের তলদেশে ও পাথরের অভ্যন্তরে বিরাজমান প্রাণীদেরকেও জীবিকা দান করেন। আমি গুণকীর্তন করছি আল্লাহর সেই রাসূলের, যিনি আবির্ভূত হয়ে কুফর ও গোমরাহির অন্ধকার দূর করে পৃথিবীকে ইসলামের আলোয় উদ্ভাসিত করেছেন।

'ইসলামের জানবাজগণ আফ্রিকা মহাদেশে সেনাভিযান পরিচালনা করবে এমন কোনো ইচ্ছা আমার ছিল না। কিন্তু সেখানকার খ্রিস্টান রাজা ইসলামের মূলোৎপাটন ও মুসলমানদের নিশ্চিহ্ন করার লক্ষ্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে। ইসলামের শিক্ষা হচ্ছে, কোনো শক্তি যদি কোনো-না-কোনোভাবে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে তৎপরতা চালায়, ইসলামের মর্যাদা ও সমুন্নতির পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে; তাদের বিরুদ্ধে সমুচিত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এ-জাতীয় শত্রুর বিরুদ্ধে জিহাদ করা ফরজ হয়ে দাঁড়ায়। জিহাদের মাধ্যমে ফেতনা নির্মূল করে পৃথিবীর বুকে ইসলামকে সমুন্নত করা মুসলমানদের ঈমানি কর্তব্য। তাই বাধ্য হয়ে আমি আফ্রিকা-আক্রমণের অনুমতি দিয়েছি।

'ইসলামের শত্রুদেরকে আমাদের জানিয়ে দিতে হবে, ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করার সাধ্য পৃথিবীর কোনো শক্তির নেই। পৃথিবীর পাতা থেকে আল্লাহর নাম মুছে ফেলার শক্তি কারও নেই। পৃথিবীর বুকে একজন মুসলমান বেঁচে থাকা পর্যন্ত ইসলাম ও আল্লাহর নাম জীবিত থাকবে। তোমরা আবেগের বশবর্তী হয়ে এমন কোনো কাজ করো না, যদ্দ্বারা ইসলামের দুর্নাম হবে এবং মুসলমানদের লজ্জিত হতে হবে। প্রথমে শত্রুকে সন্ধির প্রস্তাব দেবে। দুশমন যদি ইসলাম ও মুসলমানবিরোধী তৎপরতা পরিহার করার প্রতিশ্রুতি দেয় এবং সন্ধির প্রস্তাব মেনে নেয়, তা হলে সাবধান! কারও রক্ত ঝরাবে না, সন্ধি করে যুদ্ধ বন্ধ করে দেবে। কিন্তু যদি তারা হটকারিতা পরিহার না করে, ইসলামের সঙ্গে শত্রুতা পরিত্যাগ না করে; তা হলে আল্লাহর নাম নিয়ে তাঁর উপর ভরসা করে ঝাঁপিয়ে পড়বে এবং শক্তিমত্তা ও বীরত্বের প্রমাণ দেবে।

'আবেগ-আনন্দের সময়ও তোমাদের তরবারি যেন বৃদ্ধ, দুর্বল, পঙ্গু, নারী, শিশু ও ধর্মনেতাদের– যারা তোমাদের মোকাবেলায় যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়নি এবং কোনোভাবেই যুদ্ধের সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়– হত্যা করবে না। কারও বাসগৃহে আগুন দেবে না। গির্জা, খেতের ফসল ও ফলবান বৃক্ষ ধ্বংস করবে না। মানবতা, সভ্যতা ও ইসলামী আদর্শ পরিপন্থী কোন কাজ করবে না। পরস্পর মিলে-মিশে কাজ করবে। দুর্ভাগ্যবশত যদি আপসে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়ে যায়, তা হলে কৌশল অবলম্বন করে বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে মিটমাট করে ফেলবে। অন্যথায় তোমরা শক্তিহীন হয়ে পড়বে। তোমরা বঞ্চিত ও অপদস্থ হবে। সমস্ত পৃথিবীর সকল মুসলমান পরস্পর ভাই ভাই। ইসলামের এই শিক্ষাটা সর্বদা স্মরণ রাখবে। আরবি হও কিংবা অনারবি, মিসরি হও কিংবা সিরীয়, ধনী হও কিংবা গরীব, মনিব হও কিংবা গোলাম, কালো হও কিংবা সাদা– সব মুসলমান সমান, একে অপরের ভাই। কোনো বিষয়ে মতবিরোধ দেখা দিলে পরস্পর মতবিনিময় করে বিরোধ মিটিয়ে ফেলবে।

'কোনো অবস্থাতেই নামায ত্যাগ করবে না। বেনামাযি মুসলমান নাম ধারণের যোগ্য নয়। নামায ছাড়া জান্নাত পাওয়া যাবে না। নামায ত্যাগকারীর ঠিকানা জাহান্নাম। কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম নামাযের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হবে। বেনামাযি ও নামাযে অলসতাকারীরা সেদিন আক্ষেপ করবে। এবার রওনার জন্য প্রস্তুত হও। আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় অতি নিকটে।'

মুজাহিদগণ তাকবীরধ্বনি দিয়ে রওনার জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। উটের পিঠে হাওদা ও ঘোড়ার পিঠে যিন বাঁধা হয়। মুজাহিদরা খেজুরের থলে ও পানির মশক নিয়ে অস্ত্রসজ্জিত হয়ে ঘোড়ার লাগাম হাতে নিয়ে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে যায়।

প্রথমে মালামাল বহনকারী উটের সারি রওনা হয়। কয়েক হাজার উট। বিস্তৃত অঞ্চলজুড়ে ছড়িয়ে পড়ে উটের বহর। তার পর রওনা হয় মুজাহিদ কাফেলা। প্রায় দশ হাজার অশ্বারোহী পুরুষের পর চলতে শুরু করে নারী ও শিশুদের বহর। তাদের পিছনে এগিয়ে চলে অবশিষ্ট সেনাদল। আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর পতাকাহাতে বাহিনীর সঙ্গে এগোতে শুরু করেন।

ইসলামের নিবেদিতপ্রাণ সৈনিকরা এগিয়ে গেছে বহুদূর। মরুর ধূলি-বালিতে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে তারা। এখন আর বাহিনী দেখা যাচ্ছে না। খলীফাতুল মুসলিমীন হযরত ওসমান (রা.) এবং মুজাহিদদের বিদায় জানাতে আসা অন্য সকল মানুষ মদীনায় ফিরতে শুরু করেন।

দশ.

মিসরের গভর্নর আব্দুল্লাহ ইবনে সা'দ (রা.) মাত্র দশ হাজার মুজাহিদ নিয়ে আফ্রিকার উদ্দেশ্যে রওনা হন। বিপরীতে আফ্রিকার খ্রিস্টানরা যে মিসর আক্রমণের প্রস্তুতি গ্রহণ করছে এবং বিপুলসংখ্যক সৈন্যের সমাবেশ ঘটিয়েছে, সে-খবর তাঁর নেই। এত স্বল্পসংখ্যক মুজাহিদ দ্বারা খ্রিস্টানদের এই বিশাল বাহিনীর মোকাবেলা করা দুষ্কর বই কী। তিনি মূলত দারুল-খেলাফত থেকে যে-বাহিনী আসছে, তারা এসে পৌছানোর আগেই আফ্রিকার কিছু অংশ জয় করে ফেলতে চাচ্ছেন। মিসর-আফ্রিকার সীমান্তের একস্থানে পৌছে তিনি একটি দুর্গ দেখতে পান। এখান থেকে তারাবলিসের দূরত্ব মাইলকয়েকের পথ। আফ্রিকান সীমান্ত প্রহরার জন্য এই দুর্গটি নির্মিত। এই দুর্গের অধিপতি আফ্রিকার সম্রাট জর্জিরের অনুগত।

অভিযানে যাত্রাপথে কোনো নগরী বা দুর্গ পড়লে তা জয় করে সম্মুখে অগ্রসর হওয়া ছিল মুসলমানদের রীতি। আব্দুল্লাহ ইবনে সা'দও এই দুর্গটি জয় না-করে সম্মুখে অগ্রসর না-হওয়ার সংকল্প গ্রহণ করেন।

দুর্গের নাম যাবিলা। অবস্থান যেরবারাকার সন্নিকটে। দুর্গপতির নাম আরসানুস। দুর্গটি বেশ বড়সড়, বিলাসবহুল, সদৃঢ় ও দুর্ভেদ্য। দুর্গের অভ্যন্তরে পনেরো হাজার সৈন্য অবস্থান করে। বাহিনীর বীরত্ব ও দুর্গের সুরক্ষার ব্যাপারে আরসানুসের বেজায় দম্ভ।

ই লামী বাহিনী যাবিলায় পৌছামাত্র আরসানুস দুর্গে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করে। দুর্গের ফটক বন্ধ হয়ে যায়। আরসানুস জানে, মুসলমানদের সঙ্গে খোলামাঠে যুদ্ধ করে জয়ের আশা করা বৃথা। তাই নিজ বাহিনীকে দুর্গে অবস্থান করেই মোকাবেলার নির্দেশ প্রদান করে। তার সৈন্যরা তির, ধনুক ও পাথর নিয়ে প্রাচীরের উপর প্রস্তুত হয়ে যায়।

আরসানুস দুর্গ থেকে বের হয়ে মোকাবেলায় আসে কি-না দেখার জন্য আব্দুল্লাহ ইবনে সা'দ একদিন অপেক্ষা করেন। কিন্তু না, আরসানুস বের হয়নি। অগত্য আব্দুল্লাহ ইবনে সা'দ দ্বিতীয় দিন দুর্গ অবরোধ করে ফেলেন। তিনি চারদিকে আড়াই হাজার করে সৈন্য মোতায়েন করেন।

আরসানুস ও তার বাহিনী এসব দেখা সত্ত্বেও তাদের মাঝে কোনো নড়চড় পরিলক্ষিত হল না। খ্রিস্টানরা দুর্গের পাঁচিলের উপর এবং মুসলমানরা তাদের ক্যাম্পে সারারাত আগুন জ্বালিয়ে রাখে। দুর্গের নিচে একদল মুসলমান নিজবাহিনীর নিরাপত্তার লক্ষ্যে টহল দিতে থাকে।

রাত পোহালে মুসলমানরা জাগ্রত হয়ে প্রয়োজানাদি সেরে ফজর নামায আদায় করে। আব্দুল্লাহ ইবনে সা'দ কিছু সৈন্য সঙ্গে নিয়ে নিকট থেকে দুর্গ পর্যবেক্ষণ করতে চলে যান। নিকটে গিয়ে দেখেন, দুর্গ এত উঁচু ও মজবুত যে, তাতে আরোহণ ও অতিক্রম করা সম্ভব নয়। তিনি দুর্গের চারদিক ঘুরে-ঘুরেদেখেন। কিন্তু, কোথাও কোনো সুযোগ দেখতে পেলেন না। তিনি আরও দেখতে পান, দুর্গে বিপুলসংখ্যক খ্রিস্টানসেনা অবস্থান করছে।

তাঁর ফিরতে-ফিরতে দুপুর হয়ে যায়। তিনি প্রতিটি পয়েন্টের কমান্ডারকে নির্দেশ প্রেরণ করেন, আক্রমণে তাড়াহুড়া করা যাবে না। অবরোধ আরও কঠোর করতে হবে। একজন মানুষও যেন দুর্গে প্রবেশ এবং দুর্গ থেকে বের হতে না পারে।

তাঁর নির্দেশ অক্ষরে-অক্ষরে পালিত হয়। অবরোধ এত কঠোর করে তোলা হয় যে, মানুষ দূরে থাক, পাখিটিও ঢুকতে-বেরুতে পারবে না।

দিন শেষ হতে চলেছে। সময় দ্রুত কেটে যাচ্ছে। কিন্তু না খ্রিস্টানরা দুর্গ থেকে বের হয়েছে, না মুসলমানরা দুর্গের উপর আক্রমণ করেছে। এভাবে কেটে যায় কয়েক দিন।

একদিন দুর্গের পক্ষ থেকে এক দূত প্রস্তাব নিয়ে আসে, মুসলমানরা যদি অবরোধ প্রত্যাহার করে ফিরে যায়, তা হলে তারাবলিস জয় হলে তারা জিযিয়া আদায়ের শর্তে সন্ধি করে নেবে।

আব্দুল্লাহ ইবনে সা'দ তাদের এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেন, যতক্ষণ-না তোমরা আমাদের আনুগত্য মেনে নেবে কিংবা আমরা তোমাদেরকে পদানত করব, ততক্ষণ আমরা এ-অঞ্চল ত্যাগ করব না।

জবাব নিয়ে দূত ফিরে যায়। খ্রিস্টানরা নীরব হয়ে যায়। অবরোধের বয়স পনেরো দিন হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও খ্রিস্টানদের মাঝে কোনো প্রকার অস্থিরতা ও চাঞ্চল্য প্রকাশ না-পাওয়ায় আব্দুল্লাহ ইবনে সা'দ দুর্গের উপর আক্রমণ করার আদেশ জারি করেন। সব দিকের মুজাহিদদের জানিয়ে দেওয়া হয়, আগামী কাল ফজর নামাযের পরপর দুর্গে আক্রমণ চালানো হবে।

পরদিন ফজর নামায আদায় করেই মুসলমানরা অস্ত্রসজ্জিত হয়ে আল্লাহু আকবার ধ্বনি তুলে দুর্গের দিকে এগোতে শুরু করে।

খ্রিস্টানরা দেখল মুসলমানরা এগিয়ে আসছে। তারাও অস্ত্রসজ্জিত হয়ে প্রস্তুত হয়ে যায়। তারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, মুসলমানরা দুর্গের সন্নিকটে এসে পৌঁছামাত্র তির ও পাথরের বৃষ্টি বর্ষণ করে তাদের পিছনে হটিয়ে দেওয়া হবে।

তারা তা-ই করল। মুসলমানরা তাদের আয়ত্তে এসে পৌঁছার সঙ্গে-সঙ্গে তারা মিনজানিকের সাহায্যে পাথর ছুঁড়তে শুরু করে। জীবনসংহারী এই প্রস্তরখণ্ডগুলো ছিল ছুঁচালো– গায়ে আঘাত হানলে গেঁথে যাওয়ার মতো মারাত্মক পাথর। কিন্তু মুসলমানরা ঢাল দ্বারা এই আক্রমণ প্রতিহত করে। পাথরের আঘাতে অনেকের ঢাল ফুটো হয়ে যায়। কয়েকটি ঘোড়া আহত হয় এবং কয়েকজন জানবাজ মুসলমান শাহাদাতবরণ করে। মুজাহিদরা ঢাল দ্বারা নিজেদের ও পশুগুলোর হেফাজত করে-করে পা-পা এগোতে থাকে। খ্রিস্টানরা বৃষ্টির মতো পাথর ছুঁড়তে থাকে। পাথরে-পাথরে আঘাত খেয়ে-খেয়ে টুনটান শব্দ হচ্ছে।

মুসলমানরা এই আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা চালায়। তথাপি তাদের অনেকে আঘাতপ্রাপ্ত হচ্ছে। মুসলমান বীরের জাতি। তারা মৃত্যুকে পরোয়া করে না। তাই তারা এমনভাবে অগ্রসর হতে থাকে, যেন হতাহতের কোনো ঘটনাই ঘটছে না, যেন তাদের উপর কোনো আক্রমণই হচ্ছে না। খ্রিস্টানরা বিস্ময়ের সঙ্গে মুসলমানদের বীরত্ব ও সাহসিকতা অবলোকন করছে।

এবার খ্রিস্টানরা পাথর নিক্ষেপ ছাড়া তিরবৃষ্টিও শুরু করে দেয়। এত মুষলধারে তির বর্ষণ করে যে, মুসলমানদের অগ্রযাত্রা হঠাৎ থমকে যায়। কিন্তু পিছপা হতেও তারা লজ্জাবোধ করছে। তাই ওখানে দাঁড়িয়েই তারা ঢাল দ্বারা শত্রুর আঘাত প্রতিহত করছে।

জীবনসংহারী এই তির ও পাথরবৃষ্টি চলছে দুর্গের চতুর্দিকে। সব দিকেই খ্রিস্টানরা পাঁচিলের উপর থেকে বৃষ্টির মতো পাথর ও তির ছুঁড়ছে। আরসানুস তার কয়েকজন সহচরসহ একটি বুরুজে দাঁড়িয়ে পরিস্থিতি অবলোকন করছে। অনেকক্ষণ অবলোকন করার পর সঙ্গীদের উদ্দেশ করে বলল– 'তোমরা কি মুসলমানদের সাহসিকতা দেখেছ?'

এক সঙ্গী : জি হুজুর, দেখেছি। আমরা শুনতাম মুসলমান মানুষ নয়– জিন। আজ চোখে দেখছি। যে-পরিমাণ তির ও পাথরের বৃষ্টি তাদের উপর বর্ষিত হচ্ছে, অন্য কোনো জাতি হলে অনেক আগেই পালিয়ে যেত। কিন্তু এরা যেরূপ ধৈর্য ও দৃঢ়তার সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছে, তা সত্যিই প্রশংসার্হ।

আরেক সঙ্গী : শুনেছি, মুসলমানরা নেতার প্রতি এতই অনুগত যে, নেতা তাদের নদীতে কিংবা আগুনে ঝাঁপ দিতে আদেশ করলেও তারা হাসিমুখে তা মান্য করে।

আরসানুস : তুমি ঠিকই বলেছ। তাদের নেতা যেহেতু তাদেরকে আক্রমণ করার নির্দেশ দিয়েছে, তাই তারা পিছপা হচ্ছে না। আজ আমাকে স্বীকার করতেই হল, মুসলমানরা সত্যিই বীরের জাতি।

প্রথম সঙ্গী : আর হুজুর, এরা প্রতিশ্রুতি রক্ষায়ও বেশ পাকা। যা প্রতিজ্ঞা করে, তা করেই ছাড়ে।

আরসানুস চমকে ওঠে সঙ্গীর প্রতি বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে বলল– 'এটা তুমি জানলে কী করে?'

সঙ্গী : মুসলমানরা যখন সিরিয়ায় আক্রমণ করেছিল এবং খ্রিস্টানরা সেখান থেকে পালিয়ে আফ্রিকা চলে এসেছিল, তখন কয়েক ব্যক্তির সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। মুসলমানদের চরিত্র সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তারা আমাকে এ-তথ্য জানিয়েছিল।

অপর এক সঙ্গী বললো : একথা আমিও শুনেছি হুজুর! মুসলমানরা ওয়াদা রক্ষায় বড় পাকা। একবার যাকে যে কথা দেয়, তা পালন না-করে ছাড়ে না।

প্রথম সঙ্গী : আমি আরও শুনেছি, এক মুসলমান কোনো প্রতিজ্ঞা করলে সমগ্র জাতি মিলে তা পালন করে।

আরসানুস গভীর ভাবনায় হারিয়ে যায়। চিন্তার সাগরে এমনভাবে ডুবে যায় যে, সে ভুলেই গেছে এখন যুদ্ধ চলছে। তার সৈন্যরা মুসলমানদের উপর তির ও পাথর ছুঁড়ছে আর তার পার্শ্বে তার সভাসদরা দাঁড়িয়ে আছে। খানিক পর সম্বিৎ ফিরে পায়। সে ক্ষীণকণ্ঠে আনমনে বলে ওঠে– 'আমার জখম এরাই সারাতে পারে। এরাই আমার বক্ষে প্রজ্বলমান আগুন নেভাতে পারে।'

আরসানুস কথাটা অতি ক্ষীণকণ্ঠে বললেও কয়েক সঙ্গী শুনে ফেলে। তাদের একজন বলল– 'কী বলছেন হুজুর!'

আরসানুস হঠাৎ চমকে উঠে সতর্ক হয়ে যায়, যেন সে কিছুই বলছে না। এবার উদাসনয়নে সঙ্গীদের প্রতি দৃষ্টিপাত করে মুসলমানদের দিকে তাকাতে শুরু করে।

মুসলমানদের উপর তির ও প্রস্তরবর্ষণ এখনও চলছে। তবু তারা দৃঢ়তা ও সাহসিকতার সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছে। আক্রমণ প্রতিহত করে তারা এক পা-ও সম্মুখে অগ্রসর হতে পারছে না।

আব্দুল্লাহ ইবনে সা'দ যখন দেখলেন, মুসলমানদের সম্মুখে অগ্রসর হওয়া কঠিন হয়ে পড়েছে, তখন তিনি সবদিকের মুসলিম সৈন্যদের নিকট নির্দেশ প্রেরণ করেন, যেন ধীরে-ধীরে তারা পিছনে সরে যায়।

মুসলমানরা আস্তে-আস্তে পিছু হটতে শুরু করে। খ্রিস্টানদের তির-পাথরের বর্ষণ কমে যায়। আব্দুল্লাহ্ ইবনে সা'দ উচ্চৈঃস্বরে বললেন– 'মুসলমানগণ, তোমাদের জীবনবাজির পরীক্ষা দেয়ার এটিই সময়। দ্রুত এগিয়ে যাও এবং পাঁচিলের নিকটে পৌঁছে যাও।' একথা বলেই তিনি ঘোড়ার লাগাম শিথিল করে দেন। অনুগত ঘোড়া দ্রুতগতিতে দুর্গের পাঁচিলের নিকট পৌঁছে যায়।

সেনাপতিকে সম্মুখে এগিয়ে যেতে দেখে প্রত্যেক মুসলমানের অন্তরে আনন্দের বান বয়ে যায়। সঙ্গে-সঙ্গে তারাও লাগাম শিথিল করে ঘোড়া হাঁকায়। বাহিনী ঝড়ের গতিতে ছুটতে শুরু করে।

পাঁচিলের উপর থেকে মুসলমানদের দৌড়াতে দেখে খ্রিস্টানরা ভীত ও বিস্মিত হয়ে পড়ে। আত্মসংবরণ করে পুনরায় তির-পাথর নিক্ষেপের জন্য প্রস্তুত হওয়ার আগেই মুসলমানরা পাঁচিলের গোড়ায় পৌঁছে যায়।

আরসানুস ঘটনাটা অবলোকন করে। দেখে আক্ষেপভরা কণ্ঠে বলল– 'আফসোস! ভাগ্য বদলে গেছে! এখন যুদ্ধ করা বৃথা। এক্ষুনি জাতীয় পতাকা নামিয়ে সাদা পতাকা উড়িয়ে দাও।'

আরসানুস যে-বুরুজের ভিতরে দাঁড়িয়ে ছিল, তার উপর খ্রিস্টান পতাকা উড়ছিল। এক অফিসার দ্রুত এগিয়ে গিয়ে পতাকাটি নামিয়ে তদস্থলে সাদা পতাকা উড়িয়ে দেয়।

দেখে মুসলমানরা তাদের সেনাপতিকে বিষয়টি অবহিত করে। সেনাপতি আব্দুল্লাহ্ ইবনে সা'দ ওদিকে তাকিয়ে একটা মুচকি হাসি দিয়ে বললেন– 'আল্লাহর শোকর যে, খ্রিস্টানরা নিরাপত্তা প্রার্থনা করেছে। এখন না ফটক ভাঙার প্রয়োজন আছে, না পাঁচিলে আরোহণের আবশ্যকতা আছে। তোমরা এখানে দাঁড়িয়েই অপেক্ষা করো। খ্রিস্টানরা নিজেরাই ফটক খুলে দেবে।'

মুসলমানরা নিশ্চিন্তমনে দাঁড়িয়ে ফটক খুলে যাওয়ার অপেক্ষা করতে থাকে।

এগারো.

মুসলমানদের বেশি সময় অপেক্ষা করতে হল না। ফটক খুলে গেল। আরসানুস সঙ্গীদের নিয়ে দুর্গ থেকে বেরিয়ে আসে।

তার চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। সঙ্গীরা থরথর করে কাঁপছে। আরসানুস আরবি জানে। তার সঙ্গীদের কারও আরবি জানা ছিল না। তাই সে নিজেই কথা বলতে শুরু করল– 'মুসলমানগণ, আমার নাম আরসানুস। আমি এই দুর্গের অধিপতি। আমি তোমাদের সেনাপতির সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

আব্দুল্লাহ ইবনে সা'দ সঙ্গে-সঙ্গে সামনে এগিয়ে এসে বললেন– 'বলুন, কী বলতে চান?'

আরসানুস মনে করত, সে নিজে যেরূপ শান-শওকতের সঙ্গে বসবাস করে, মুসলমানদের সেনাপতিও তেমনই থাকেন। কিন্তু সে আব্দুল্লাহ ইবনে সা'দকে একেবারে সাধারণ পোশাকে এবং সাদাসিধা অবস্থায় দেখে হতবাক্ হয়ে যায়। মনের বিস্ময় দূর করার জন্য জিজ্ঞেস করে– 'আপনিই কি মুসলমানদের সেনাপতি?'

ঃ হ্যাঁ, মুসলমানরা তা-ই মনে করে। কিন্তু আমি ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের নেতা থাকব, যতক্ষণ আমি ইসলামী শরীয়তের উপর অটল থাকব। শরীয়ত থেকে সামান্যতম বিচ্যুত হলেও আমার আনুগত্য ফরজ থাকবে না।'

ঃ কিন্তু আপনার পোশাক-আশাক এত সাদাসিধে কেন?

ঃ আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এমন সাদাসিধা পোশাকই পরিধান করতেন। তাঁর খলীফাকগণও একই ধরনের সরল জীবনযাপন করতেন। খলীফা হযরত আবুবকর ও ওমর (রা.) কারুরই জীবনে কোনো আড়ম্বর ছিল না। বর্তমানে যিনি আমাদের রাজা, তাঁরও একই অবস্থা। আমরা বাহ্যিক অবয়বকে মর্যাদার মাপকাঠি মনে করি না। আমাদের মর্যাদার মাপকাঠি হচ্ছে তাকওয়া। যে-মুসলমান যত বেশি মুত্তাকি, আল্লাহর নিকট সে ততবেশি মর্যাদাবান। তাই আমরা সব মুসলমানই সহজ-সরল জীবন অতিবাহিত করি।

ঃ কোন শক্তির বলে আপনারা এভাবে দেশের-পর-দেশ জয় করে ফিরছেন?

ঃ আমরা মুসলমান। আমরা এক আল্লাহতে বিশ্বাসী। আমরা বিশ্বাস করি, আল্লাহ মহাশক্তিধর। জগতের সকল কিছু তাঁরই নির্দেশে সংঘটিত হয়ে থাকে। আমরা তাঁরই ইবাদত করি, তাঁরই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি। তিনি আমাদেরকে সাহায্য করেন। আমরা তাঁর উপর ভরসা করে সকল কাজ আঞ্জাম দিই। যুদ্ধও তাঁরই উপর ভরসা করে করি। তিনিই আমাদেরকে বিজয় দান করেন।

ঃ আজ আমি আপনাদের যে বীরত্ব, দৃঢ়তা ও সাহসিকতা দেখেছি, তাতেই বুঝে ফেলেছি, আপনারা যে-দেশই আক্রমণ করবেন, জয় আপনাদের পদচুম্বন করবেই। আপনাদের অগ্রযাত্রা কেউ ঠেকাতে পারবে না। আমাদের সম্রাট জর্জির আপনাদের যুদ্ধের আহ্বান জানিয়ে বড় ভুল করেছেন। আমার ভয় হচ্ছে, তার পাষাণহৃদয় বিশাল বাহিনীও আপনাদের সঙ্গে পেরে উঠবে না।

ঃ আমি কয়েকবার তাকে বোঝাবার এবং আক্রমণ থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করেছি। কিন্তু, তিনি মানলেন না। আমাদের বিনয় ও সরলতাকে তিনি

কাপুরুষতা মনে করেছেন। অথচ, যদি তার মাথায় সামান্যতম বিবেকও থাকত, তা হলে তিনি বুঝতেন, বড়-বড় অনেক প্রতাপশালী ও শক্তিধর রাজাও আমাদের মোকাবেলায় এসে টিকতে পারেননি। ইউরোপ থেকে এশিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত সাম্রাজ্যের অধিকারী শক্তিধর রাজাকেও আমাদের মোকাবেলায় এসে পরাজয় বরণ করে পালাতে হয়েছে। যে পারস্য সম্রাটের ভয়ে অন্যসব রাজা-মহারাজারা থরথর করে কাঁপত, আমাদের সঙ্গে সংঘাতে লিপ্ত হওয়ার পর তার সিংহাসনও উলটে গেছে, তাকে ইরান ছেড়ে পালাতে হয়েছে।

ঃ বর্তমান বিশ্বে পৃথিবীতে দুটি-ই পরাশক্তি ছিল। উভয়েরই মুসলমানদের হাতে পতন ঘটেছে। আফ্রিকারও এমন মুরোদ নেই যে, আপনাদের সঙ্গে মোকাবেলা করে টিকে থাকবে। জর্জিরকে নিজের কর্মফল ভুগতেই হবে। যা হোক, আমি নিজের ও দুর্গের অধিবাসীদের জন্য নিরাপত্তা ভিক্ষা করতে এসেছিলাম।

ঃ আমাদের শর্ত দুটি। তুমি তার যে-কোনো একটি মেনে নাও।

ঃ বলুন শর্তগুলো কী?

ঃ প্রথম শর্ত, ইসলাম গ্রহণ করে তুমি আমাদের ভাই হয়ে যাও; আমরা তোমার এবং তুমি আমাদের সহযোগী হয়ে যাব।

ঃ এটা কঠিন। পৈত্রিক ধর্ম ছাড়ি কী করে।

ঃ তা হলে তুমি জিযিয়া দাও; আমরা তোমার নিরাপত্তার দায়িত্ব নেব।

ঃ জিযিয়া যদিও একটি অপমানজনক কর, তবু যেহেতু এ-ছাড়া আর কোনো বিকল্প নেই, তাই এটি মেনে নিলাম। তা জনপ্রতি কত করে দিতে হবে?

ঃ চার দিনার।

ঃ ঠিক আছে। আপনারা কি দুর্গের বাইরেই অবস্থান করবেন? না-কি ভেতরে থাকবেন?

ঃ আমরা দুর্গে বন্দি থাকা পছন্দ করি না। তবে জিযিয়া উসুল করার জন্য আমাদের কিছু লোক দুর্গে থাকবে। তোমাদের দুর্গের চারদিকে ফটক খোলা রাখতে হবে।

ঃ মেনে নিলাম। যত সৈন্য প্রয়োজন মনে করেন, আমার সঙ্গে দিন।

আব্দুল্লাহ ইবনে সা'দ তখনই আরসানুসের সঙ্গে পাঁচশ সৈন্য প্রদান করেন। দুর্গের চতুর্দিকের ফটক খুলে দেওয়া হল। মুসলমানরা জেনে ফেলেছে, সন্ধির মাধ্যমে দুর্গ জয় হয়ে গেছে। তারা নিশ্চিন্তমনে দুর্গের চারদিকে অবস্থান গ্রহণ করে। আহতদের চিকিৎসা শুরু হয়ে যায়। দুর্গ থেকে বেরিয়ে এসে খ্রিস্টানরা মুসলিম সৈন্যদের মাঝে পসরা বসায়। মুসলমানরা কেনাকাটা শুরু করে।

চতুর্থ দিন আরসানুস সকল দুর্গবাসীর পক্ষ থেকে জিযিয়া আদায় করে আব্দুল্লাহ ইবনে সা'দকে চুপিচুপি বলল– 'আমি আপনাকে একটা কথা বলতে চাই।'

ঃ বলুন।

ঃ এক কাজে আমাকে আপনার সাহায্য প্রয়োজন।

ঃ আগে ব্যাপারটা বলুন। পরে বলব, আপনার কোনো উপকার করতে পারব কি-না।

ঃ সম্রাট জর্জিরের অতিশয় রূপসী এক মেয়ে আছে। তার রূপের খ্যাতি আপনিও হয়ত শুনে থাকবেন।

ঃ আমরা মুসলমানরা এ-জাতীয় বিষয়-আশয়ের প্রতি মনোযোগ দিই না।

আরসানুস মুচকি হেসে বলল– 'তার মানে রূপসীকে আপনি এখনও দেখেননি। সেজ্যনই এমন কথা বলছেন। দেখলে আপনিও দীন-দুনিয়া সব ভুলে তার জন্য পাগল হয়ে যাবেন। তখন তাকে ছাড়া আর কিছুই বুঝবেন না।

ঃ হতে পারে জর্জিরের মেয়ে খুব রূপসী। কিন্তু, যারা জানে, রূপের স্রষ্টা এসব রূপসীদের চেয়ে অনেক-অনেক বেশি সুন্দর, তাদের কাছে হুর-পরীদের কোনোই মূল্য নেই। তারা সেই সত্তার সঙ্গে প্রেম করে, যাঁর রূপের একটি ঝলক লাভ করে এরা জগদ্বিখ্যাত রূপসী হয়েছে।

ঃ বুঝেছি, আপনি শুকনা দরবেশ। তবে আমি দৃঢ়প্রত্যয়ের সঙ্গে বলতে পারি, এখনই রাজকুমারী হেলেনকে একনজর দেখবেন, তখন তার রূপের প্রশংসা না-করে পারবেন না।

ঃ হতে পারে। তা জর্জিরের মেয়েটির নাম বুঝি হেলেন?

ঃ হ্যাঁ। আমি যিশুখ্রিস্টের কসম খেয়ে বলছি, বর্তমানে শুধু আফ্রিকায়ই নয়– অন্য কোনো দেশেও তার মতো সুন্দরী মেয়ে দ্বিতীয়টি নেই।

ঃ আপনি তো তার প্রশংসায় সীমা টেনে দিয়েছেন।

ঃ আসলে তার প্রশংসা করার ভাষা আমার জানা নেই। কোনো কবির পক্ষেও সম্ভব নয় জর্জিরকন্যার রূপের যথার্থ বর্ণনা দেবে।

ঃ আচ্ছা, আপনার আবদারটা কী বলুন।

ঃ আপনি যখন জর্জিরের উপর জয় লাভ করবেন, তখন হেলেনকে আমার হাতে তুলে দেবেন।

ঃ দেখুন, এ-ব্যাপারে আমি চূড়ান্ত কিছু বলতে পারব না। ফলাফল কী হয় অগ্রিম বলা তো কঠিন। হতে পারে আমি পরাজিত হব। হতে পারে, জয়ী হব ঠিক; কিন্তু হেলেন আমার হাতে বন্দি হবে না। হলেও কী করব, এই মুহূর্তে বলতে পারি না।

ঃ আমার ধারণা, রাজকুমারী তার পিতার সঙ্গে রনাঙ্গনে অবতীর্ণ হবে।

ঃ মনে হয় তারা পিতা-কন্যা খুবই অন্তরঙ্গ?

ঃ হ্যাঁ, তবে আরও একটি ব্যাপার আছে।

ঃ কী সেটা?

ঃ রাজকুমারী যতটা রূপসী, ততটা বীরাঙ্গনা। অবশ্যই সে মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে আসবে।

ঃ যদি সে গ্রেফতার হয়, তা হলে সিদ্ধান্ত একটা নেব।

ঃ আপনি ওয়াদা করুন, ফুলকলিটা আপনার হাতে গ্রেফতার হলে আমাকে দিয়ে দেবেন। আপনি যত অর্থ বলবেন দেব। আপনি যদি তাকে দাসী বানান, আমি তাকে ক্রয় করব। মূল্য যা বলবেন আদায় করব।

ঃ আচ্ছা, আমি ওয়াদা করছি, রাজকুমারী হেলেন যদি আপনার কাছে যেতে আপত্তি না-করে, তা হলে আমি তাকে তোমার হাতে তুলে দেব।

ঃ আপনাকে ধন্যবাদ।

আরসানুস প্রসন্নমনে ফিরে যায়।

আব্দুল্লাহ ইবনে সা'দ তাঁবু থেকে বের হয়ে মিসরের দিককার আকাশে ঘন মেঘসদৃশ ধূলি উড়ছে দেখতে পান। মুসলমানরা সেদিকে তাকিয়ে দেখতে থাকে। আব্দুল্লাহ ইবনে সা'দও তাকিয়ে থাকেন।

ধূলিঝড় কাছে এলে তার মধ্য থেকে একটি ইসলামী বাহিনী আত্মপ্রকাশ করে। মুসলমানরা তাদের দেখে আল্লাহু আকবার ধ্বনি দিয়ে আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে তোলে। তারা অগ্রসরমান বাহিনীকে স্বাগত জানানোর জন্যে এগিয়ে যায়।

বারো.

যাবিলার দুর্গপতি আরসানুসের সঙ্গে সন্ধি হয়ে যাওয়ার পর এখন মুসলিম সৈন্যরা দুর্গের চারদিক থেকে সরে এসে একস্থানে অবস্থান করছে। নতুন আগত বাহিনীকে দেখে তারা আকাশফাটা তাকবীরধ্বনি দিয়ে উল্লাস প্রকাশ করে।

'নারায়ে তাকবীর আল্লাহু আকবার' খ্রিস্টানদের কাছে একটি নতুন ধ্বনি। এমন ধ্বনি তারা জীবনে কখনও শোনেনি। কী ঘটল বুঝবার জন্য তারা দুর্গের পাঁচিলের উপর উঠে আসে। আরসানুসও একটি বুরুজে এসে দাঁড়ায়। খ্রিস্টানরা মিসরের দিক থেকে একটি ইসলামী বাহিনীকে এগিয়ে আসতে দেখে। বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত বিশাল এক সেনাবহর। আরসানুস বলল—

'মুসলমানদের সঙ্গে সময়মতো সন্ধি করে আমি ভালোই করেছি। তাদের ফৌজ আসছে। এরা সেই আরব, যারা কোনো দেশে আক্রমণ করে বসলে তাকে পদানত না-করে ছাড়ে না। তাদের উপর আক্রমণ চালানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে আমাদের সম্রাট জর্জির মারাত্মক ভুল করলেন।'

আরসানুসের এক সঙ্গী বলল– 'মনে হচ্ছে, শিগগিরই মিসর, সিরিয়া ও ইরানের ন্যায় আফ্রিকারও ভাগ্যের ফয়সালা হয়ে যাবে।'

আরসানুসের দৃষ্টি আগত ইসলামী বাহিনীর প্রতি নিবদ্ধ। সে বলল– 'তোমার ধারণা সম্পূর্ণ সঠিক। দেখো, আগে থেকে যে-পরিমাণ মুসলিম সৈন্য আছে, এখন আরও তার দুইগুণ এসে পড়েছে। বোধ হয় এই বাহিনী খেলাফতের রাজধানী থেকে এসেছে। জানি না, এরূপ আরও কত বাহিনী আসবে।'

ঃ মুসলমানদের মাঝে বিস্ময়কর ঐক্য বিরাজমান। একটি মৌমাছিকে খোঁচালে যেমন চাকের সমস্ত মাছি সক্রিয় হয়ে ওঠে, তেমনি একজন মুসলমান হুমকির সম্মুখীন হলে সমগ্র ইসলামী জগতে ক্ষোভ ও ক্রোধের আগুন জ্বলে ওঠে।

ঃ তুমি ঠিকই বলেছ। হায়, আমাদের খ্রিস্টানদের মাঝেও যদি এমন ঐক্য থাকত! আমরা খ্রিস্টানরা অনৈক্যে জর্জরিত। আমাদের জাতীয় মর্যাদা বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছে। আমাদের রাজ্য ও শাসনক্ষমতা হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে।

ঃ আরও একটি ব্যাপার আছে হুজুর!

আরসানুস সঙ্গীর প্রতি দৃষ্টিপাত করে বিস্ময়মাখা কণ্ঠে বলল– 'কী ব্যাপার?'

ঃ মুসলমানরা খোদাভীরু ও পরহেযগার মানুষ। তাদের নবী তাদের জন্য নামাযের যে-সময় নির্ধারণ করে দিয়েছেন, সেই সময় এলে তারা সব ব্যস্ততা পরিত্যাগ করে নামায আদায় করে থাকে। তারা তাদের খোদার ও নবীর সকল আদেশ-নিষেধ পালন করে।

ঃ হ্যাঁ, আমি তা-ও দেখেছি। সাধারণ সৈনিক থেকে সেনাপতি পর্যন্ত কেউই একবেলার নামাযও বাদ দেয় না। আমাদের বড়রা মনে করে, খোদা তাদেরকে গির্জার দায়-দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়েছেন এবং যিশুখ্রিস্ট সুপারিশ করে তাদের মাফ করিয়ে দেবেন। আর ছোটরা জীবিকার ধান্ধায়ই সময় পার করে দেয়। উপাসনা করার সুযোগ তাদের মিলেই না। এ-কারণে আমাদের গির্জাগুলো শূন্যই পড়ে থাকে। দু-একজন পাদরি ও ধর্মনেতা ছাড়া অন্য কেউ উপাসনা করে না।

ঃ দেখুন হুজুর, মুসলমানরা কীরূপ উদ্দীপনা ও আনন্দের সঙ্গে কোলাকুলি করছে, যেন তারা পরস্পর আপন ভাই!

আগত ইসলামী বাহিনীটি দুর্গের অনেক নিকটে এসে পৌঁছয়। তারা ঘোড়া থেকে নেমে আগের বাহিনীর সৈন্যদের সঙ্গে কোলাকুলি করছে।

আরসানুস শীতল নিঃশ্বাস ছেড়ে বলল– 'হ্যাঁ, এ-ই হল ভ্রাতৃত্ব। এইমুহূর্তে মুসলমানদের দেখে কেউ বলতে পারবে না, তারা একই পিতার সন্তান নয়।'

এমন সময় এক পাদরি বুরুজে প্রবেশ করে বলল– 'অবাক্ হওয়ার কিছু নেই জনাব! এ-সবই মুসলমানদের নবীর শিক্ষার ফল।'

আরসানুস ও তার সঙ্গীরা মোড় ঘুরিয়ে পাদরিকে দেখে তার প্রতি মনোনিবেশ করে। আরসানুস বলল– 'পবিত্র পিতা, দেখেছেন তো মুসলমানদের মিলনের দৃশ্য কীরূপ চিত্তাকর্ষক?'

ঃ হবেই তো। ঐক্যেই বরকত। আমি কিছুকাল বাইতুল মোকাদ্দাস ছিলাম। সেখানে মুসলমানদের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ হয়েছিল। আমি জানি, মুসলমানদের মাঝে পরস্পর আপন ভাইয়ের চেয়েও বেশি ভালবাসা আছে। মুসলমানরা আমাকে বলেছে, তাদের নবী বলেছেন, এক মুসলমান আরেক মুসলমানের ভাই। আরও বলেছেন, নিজের পছন্দের বস্তুটি ভাইয়ের জন্য পছন্দ না-করা পর্যন্ত কোনো মানুষ মুমিন হয় না। তাদের নবীর এসব শিক্ষা-ই তাদেরকে পরস্পর আপন ভাই বানিয়ে রেখেছে। মুসলমানরা যতক্ষণ-না এসব শিক্ষা ভুলে যাবে, ততদিন কেউ তাদের পদানত করতে পারবে না।

ঃ এ-মুহূর্তে মুসলমানদের ঐক্য ও ভ্রাতৃত্বসুলভ হৃদ্যতা দেখে আমার মনে ঈর্ষা জাগছে। আমি খুব প্রভাবিত হচ্ছি।

ঃ হওয়ারই কথা। এককালে খ্রিস্টানদের মাঝেও ঐক্য ছিল। কিন্তু সত্য হচ্ছে, যেরূপ ঐক্য মুসলমানদের মাঝে রয়েছে, তেমনটি খ্রিস্টানদের মাঝে কখনও ছিল না। দেখুন, দেখুন, নবাগত বাহিনীটির সঙ্গে নারী-শিশুরাও রয়েছে!

ঃ তাই তো! শিশুরা ছোটাছুটি করছে। মুসলমানরা তাদের মমতার সঙ্গে কোলে তুলে নিচ্ছে।

ঃ এই হল মুসলমানদের ভ্রাতৃত্ব। বিস্ময়ের ব্যাপার হল, মুসলমানরা পরিবার-পরিজনসহ শত্রুর দেশে এমনভাবে গমন করে, যেন তারা এখানে স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য এসেছে!

ঃ বাসিন্দা হয়েও যাচ্ছে। দেখেননি, ইরান, সিরিয়া ও মিসরে হাজার-হাজার মুসলমান আবাদ হয়ে গেছে? এরা নির্ভীক জাতি। এরা আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় করে না। মোকাবেলার আহ্বান জানিয়ে সম্রাট জর্জির খুবই মন্দ করেছেন।

ঃ আমি সাবতিলা নগরীর প্রধান পাদরি থেভডোসকে বলেছিলাম, জর্জির যেহেতু আপনাকে মান্য করেন, তাই বুঝিয়ে-সুঝিয়ে তাকে ইসলামী রাজ্যের উপর আক্রমণ করা থেকে বিরত রাখুন। কিন্তু তিনি আমার অনুরোধে কান দিলেন না। বললেন, মুসলমানরা আমাদের খোদার ঘর (বাইতুল মুকাদ্দাস) দখল করে নিয়েছে। আমরা মিসর দখল করে জেরুজালেম পর্যন্ত আমাদের সাম্রাজ্য সম্প্রসারিত করব।

ঃ সংকল্প তো মহৎ। কিন্তু দেখুন, এখনও তারা প্রস্তুতিতে ব্যস্ত আর মুসলমানরা তাদের আক্রমণের সংবাদ পেয়ে তাদের দেশে ঢুকে পড়েছে!

ঃ কোনো ভয় করবেন না। আমি সাবতিলা গিয়েছি। সম্রাট জর্জির যে-প্রস্তুতি গ্রহণ করেছেন, তাতে নিশ্চিত করে বলা যায়, তিনি মুসলমানদেরকে পরাজিত করে মিসর ও সিরিয়া দখল করে নেবেন।

রাজধানী থেকে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমরের সেনাপতিত্বে যে-বাহিনীটি রওয়া হয়েছিল, নবাগত এই বাহিনীই সেই বাহিনী। বাহিনীটি মিসর পৌঁছে জানতে পারে, মিসরের গভর্নর আব্দুল্লাহ ইবনে সা'দ মাত্র দশ হাজার সৈন্য নিয়ে আফ্রিকার উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেছেন। আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর ভাবলেন, একটি দেশ আক্রমণের জন্য এই সৈন্য খুবই কম। তাই তিনি সময়ক্ষেপণ না-করে দ্রুত আফ্রিকার উদ্দেশ্য রওনা হন।

যাবিলার দুর্গ জয় করতে আব্দুল্লাহ ইবনে সা'দের কয়েকদিন সময় ব্যয় হয়ে যায়। সে-কারণেই ইবনে ওমর এসে তাকে এখানে পেয়ে গেছেন। উভয় বাহিনী এই সীমান্ত এলাকায় একত্রিত হয়। নবাগত বাহিনীর সঙ্গে নারী এবং শিশুও ছিল। শিশুরা হাওদা থেকে লাফিয়ে-লাফিয়ে নামতে শুরু করে। ইবনে সা'দের বাহিনীর সৈন্যরা তাদের কোলে নিয়ে আদর করে। শিশুরাও তাদের এমনভাবে বরণ করে নেয়, যেন তারা তাদের ঘনিষ্ট আত্মীয়।

আব্দুল্লাহ ইবনে সা'দ প্রবল আগ্রহে এগিয়ে ইবনে ওমরের সঙ্গে মোসাফাহা করেন ও আলিঙ্গনাবদ্ধ হন। তিনি জানতে পারেন, যে-দুজন সাহাবীকে রাসূল (সা.) সবচে বেশি স্নেহ করতেন, সেই হযরত হাসান-হুসাইনও এই বাহিনীতে রয়েছেন। তিনি অধিকতর উদ্দীপ্ত ও আনন্দিত হয়ে তাদের খেদমতে উপস্থিত হন।

হযরত হাসান-হুসাইনও ঘোড়া থেকে অবতরণ করে সাধারণ সৈন্যদের সঙ্গে কোলাকুলি করছেন। আব্দুল্লাহ ইবনে সা'দ বললেন– 'আল্লাহর অশেষ মেহেরবানি যে, আপনারাও এসেছেন এবং আমি আপনাদের সাক্ষাৎলাভে ধন্য হয়েছি।'

হুসাইন (রা.) বললেন– 'মহামান্য খলীফার অনুগ্রহে আমরাও জিহাদে শরীক হয়েছি।'

ঃ আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আপনাদের উপস্থিতির বরকতে আল্লাহ্ আমাদের প্রতিটি সমস্যার সমাধান করে দেবেন এবং আফ্রিকার উপর মুসলমানদেরকে বিজয় দান করবেন।

ঃ আল্লাহর ওয়াদা আছে তিনি মুসলমানদেরকে বিজয় দান করবেন। কিন্তু আমরা উপস্থিত থাকলে বিশেষ বরকত নাযিল হবে এমন ধারণা করা ঠিক হবে না। আমরা কখনও এই বলে গর্ব করিনি যে, আমরা রাসূলে খোদার নাতি, তাঁর প্রিয় কন্যা ফাতেমার পুত্র। আল্লাহর দৃষ্টিতে বংশমর্যাদা বলতে কিছু নেই। যে যত বেশি মুত্তাকি, তিনি তাকে তত বেশি ভালোবাসেন। তবে আমরা মুসলমানদের প্রতি কৃতজ্ঞ যে, তারা আমাদেরকে বিশেষভাবে শ্রদ্ধা করে থাকে।

ঃ কেন করবে না? আপনারা নবীবংশের প্রদীপ। সৌভাগ্যবানদেরই আপনাদের খেদমত করা নসিব হয়। আল্লাহর শোকর যে, আপনারা এসেছেন এবং আমি আপনাদের সেবা করে কিছু পুণ্য অর্জন করার সুযোগ পেয়েছি।

আব্দুল্লাহ্ ইবনে সা'দ হযরত হাসান ও হুসাইনকে সঙ্গে নিয়ে তাঁবুতে ফিরে যান। নিজের তাঁবুর পার্শ্বেই তাদের জন্য তাঁবু স্থাপন করান। ইবনে ওমরের বাহিনী ইবনে সা'দের বাহিনীর সঙ্গে অবস্থান গ্রহণ করে।

নবাগত বাহিনীর সৈন্য বিশ হাজার। আব্দুল্লাহ্ ইবনে সা'দের আছে দশ হাজার। এখন মুসলিম বাহিনীর মোট সৈন্য ত্রিশ হাজার। মুসলমানরা এ-দিনটি ওখানেই অবস্থান করে। আব্দুল্লাহ্ ইবনে সা'দ ইবনে ওমরের নিকট পরদিন রওনা হওয়ার ইচ্ছা ব্যক্ত করেন। কিন্তু ইবনে ওমর বললেন, আমাদের নারী ও শিশুরা লাগাতার সফর করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। তাই তাদেরকে আরও একদিন বিশ্রামের সুযোগ দেয়া উচিত।

পরিকল্পনা দু-দিনের জন্য মুলতবি হয়ে যায়।

তেরো.

যাবিলার সন্নিকটে একটি ঝরনা আছে। পাহাড়ের উঁচু চূড়া থেকে কলকল রবে নিচে পাথরের উপর পানি গড়িয়ে পড়ছে এবং সাদা ফেনা তুলে ঢালুর দিকে প্রবাহিত হচ্ছে। দৃশ্যটি বেশ চমৎকার ও মনোরম। চারদিকে দূর-দূরান্ত পর্যন্ত সবুজের সমারোহ। রং-বেরঙয়ের নানা ফুল ও ছোট-বড় নানা পাহাড়ি বৃক্ষ। দৃশ্যটি উপভোগ করার জন্য আব্দুল্লাহ্ ইবনে সা'দের সঙ্গীরা অনেক

সময় এদিক-ওদিক চলে যেত। এখন নরাগতরাও যেতে শুরু করেছে। নারীরাও পার্বত্য অঞ্চলের এই নৈসর্গিক মনোরম দৃশ্য দেখার আগ্রহ ব্যক্ত করে। ইবনে ওমর তাদের অনুমতি প্রদান করেন। তারাও যেতে শুরু করে।

নতুন বাহিনীটি এসেছে অনেক দ্রুতগতিতে। তাই পশু ও মানুষ সবাই পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছে। সকলেরই বিশ্রামের প্রয়োজন। ইবনে ওমর বিষয়টি অনুধাবন করেন। একজন দলনেতার দলের সদস্যদের সুবিধা-অসুবিধা বুঝতে হয়। তাই এই ক্লান্তি দূর করার জন্য তিনি এখানে দুদিন অবস্থানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

সরোয়ার আব্দুল্লাহ ইবনে সা'দের বাহিনীতে আছে। তার অধীনে পাঁচশত মুজাহিদের একটি দল। যাবিলার সম্মুখে অবস্থান গ্রহণের পর থেকে তার অভ্যাস গড়ে উঠেছে, সে ফজর নামায আদায় করেই ঝরনার পার্শ্বের কোনো একটি সবুজ পর্বতের উপর চড়ে বসে এবং সেখানেই কুরআন তিলাওয়াত করে।

একদিন ফজর নামায আদায় করে সরোয়ার যথারীতি ঝরনার দিকে রওনা হয়। মহিলাদের ক্যাম্পের নিকট দিয়ে পথ অতিক্রম করার সময় এক আরব তরুণী তাঁবুর পর্দা ফাঁক করে বাইরের দিকে তাকায়। মেয়েটি অতিশয় রূপসী। হঠাৎ তাঁবুর পর্দা তুলে তার দৃষ্টিপাতে মনে হল, যেন ঘোর আঁধার চিরে পূর্ণিমার চাঁদ উদিত হয়েছে। মেয়েটি সরোয়ারকে দেখে। তার সুকোমল রাঙা ঠোঁটে মুচকি হাসি ফুটে ওঠে। মুখে রূপের বান বয়ে যায়। কাজল-কালো হরিণ চোখে এক বিস্ময়কর চমক খেলে ওঠে। কিন্তু সহসা পর্দা ছেড়ে দিয়ে তাঁবুর ভিতরে ঢুকে যায়। কয়েক মিনিট পরই একটি সাদা চাদরে আবৃতা হয়ে সরোয়ারের পিছু-পিছু হাঁটতে শুরু করে।

সরোয়ার বিষয়টি মোটেও টের পায়নি। এক রূপবতী তরুণী যে তাকে অনুসরণ করছে, তাও বুঝতে পারেনি। সে মাথাটা নত করে এদিক-ওদিক না-তাকিয়ে শান্তমনে, ভাবনাহীনচিত্তে কেবলই সামনের দিকে এগিয়ে যায়। ইসলামী ক্যাম্প থেকে তিন-চার ফার্লং দূরে পর্বতমালার ধারা শুরু হয়ে সামনের দিকে এগিয়ে গেছে। উক্ত পার্বত্য অঞ্চলে একটি প্রাকৃতিক ঝরনা কলকল রবে বয়ে চলেছে।

এখনও সাতসকাল। আকাশে সূর্য উদিত হয়নি। তাই এদিকে এখনও মানুষের আনাগোনা শুরু হয়নি। সরোয়ার অনুচ্চকণ্ঠে মুখস্থ কুরআন তিলাওয়াত করতে-করতে পার্বত্য অঞ্চলের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। মেয়েটি সরোয়ারকে অনুসরণ করছে। আত্মসংবরণ করে দেহের প্রতিটি অঙ্গ চাদরে আবৃত করে পা টিপে-টিপে অতি সন্তর্পণে হাঁটছে মেয়েটি। সরোয়ার একটি

পাহাড়ের উপর উঠে পড়েছে। মেয়েটিও কয়েক পা ব্যবধান রেখে একই পাহাড়ে উঠে আড়ালে গিয়ে দাঁড়ায়। পাহাড়ের এই অংশটি সবুজে ঢাকা। চারদিক ঘন ঝোপ-লতা, বৃক্ষ-ফুলে পরিপূর্ণ। উপর থেকে পানি গড়িয়ে পড়ার শব্দ স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে।

সরোয়ার আরও অগ্রসর হয়ে ঝরনার নিকটে পৌছে যায়। পাশাপাশি দুটি পাহাড় দুদিক থেকে উচ্চ হয়ে-হয়ে অনেক উঁচুতে এসে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে আর উভয়ের মধ্যখান দিয়ে ঝরনাধারা প্রবাহিত হচ্ছে। সে এক চিত্তহারী ও মনোরম দৃশ্য। সরোয়ার কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে পাহাড় ও ঝরনার শোভা-সৌন্দর্য অবলোকন করে। তারপর একটি পাথরের উপর বসে উচ্চশব্দে কুরআন তিলাওয়াত শুরু করে।

সরোয়ার মনের মাধুরি মিশিয়ে ললিতকণ্ঠে কুরআন তিলাওয়াত করছে আর পর্বতমালা মহান আল্লাহর সেই মধুর বাণী শ্রবণ করছে। এই পাহাড় সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন– 'আমি যদি এই কুরআনকে কোনো পাহাড়ের উপর নাযিল করতাম, তা হলে তুমি দেখতে পাহাড় আল্লাহর ভয়ে ফেটে টুকরো-টুকরো হয়ে যেত।' আজ পাহাড়রা শুনছে মহাপ্রভূর সেই অমীয় বাণী।

সরোয়ার কুরআন তিলাওয়াত করছে। চাঁদসুন্দর আরব তরুণী আড়াল থেকে উঁকি মেরে তাকে দেখছে ও গভীর মনোযোগ সহকারে তার তিলাওয়াত শুনছে।

এখন পূর্ব আকাশে সূর্য উদিত হয়েছে। সূর্যের রক্তিম কিরণমালা সবুজ পাহাড়ের গায়ে লুটিয়ে-লুটিয়ে পড়ছে। ঝরনার স্বচ্ছ পানির উপর প্রতিবিম্বিত হয়ে বিস্ময়কর এক দৃশ্যের অবতারণা করছে। কিছু রসিক কিরণ রূপসী আরব তরুণীর মুখে বসে-বসে তার নরম গালে চুমো খেতে শুরু করেছে। ভোর-বিহানের মিষ্টি রোদের সোনালি কিরণে মেয়েটির গোলাপি মুখমন্ডল চিকচিক করতে শুরু করেছে। রূপের বান বইতে শুরু করেছে তার চেহারায়। সকালের মনোমুগ্ধকর শীতল বায়ু তার সোনালি চুলগুলো নিয়ে যেন খেলা করছে। কিন্তু রূপসীর সেসবের প্রতি কোনোই খেয়াল নেই। সে পলকহীন চোখে, লোভাতুর দৃষ্টিতে কেবলই সরোয়ারের কুরআনপাঠ শুনছে।

কিছুক্ষণ পর সরোয়ার তিলাওয়াত বন্ধ করে চুপচাপ বসে প্রকৃতির শিল্প-সৌন্দর্য অবলোকন করতে শুরু করে। তরুণী ধীরে-ধীরে সামনের দিকে এগিয়ে যায়। গায়ের চাদরটা খুলে ভাঁজ করে বাঁ হাতে নিয়ে নেয়। এখন তার গায়ে পূর্ণাঙ্গ আরবি পোশাক, যা তার রূপ-সৌন্দর্যকে ফুটিয়ে তুলেছে। মাথার কয়লা-কালো সুদীর্ঘ চুলগুলো দুটি বেণী করা। হাঁটু ছুয়ে-যাওয়া বেণী দুটো

সাপের মতো পিঠের উপর ছড়িয়ে রয়েছে। তরুণীর মাথায় কালো রুমাল বাঁধা। তাতে সাতিশয় চমৎকার লাগছে তাকে। রুমালের উপর গোলাপি রঙয়ের ওড়না ছেড়ানো।

মেয়েটি পা টিপে-টিপে সরোয়ারের সম্মুখস্থ ঝরনাটি দেখতে-দেখতে এমনভাবে এগিয়ে যায়, যেন সরোয়ারকে সে দেখতেই পায়নি, যেন সে চিত্তহারী ঝরনাটি দেখার তালেই ব্যস্ত। যেইমাত্র সরোয়ারের তার প্রতি চোখ পড়ে, অমনি সে চমকে ওঠে। সরোয়ার চাঁদসুন্দর মেয়েটিকে দেখেই উঠে দাঁড়ায় এবং অলক্ষ্যে বলে ওঠে– 'সালমা!'

মেয়েটির নাম সালমা। ডাক শুনে সালমা অকস্মাৎ থমকে দাঁড়ায়। মোড় ঘুরিয়ে সরোয়ারের প্রতি তাকায়। তার রসিক চোখ থেকে কিছু আনন্দ, কিছু বিস্ময়ের ঝলক ঝলসে ওঠে। দুই ঠোঁটের ফাঁক গলে মুচকি হাসির আভা ছড়িয়ে পড়ে। প্রথম-প্রথম পরিধানের কাপড়-চোপড় সামলে নিয়ে গাম্ভীর্য প্রদর্শন করার চেষ্টা করে। কিন্তু পরক্ষণেই চঞ্চল হয়ে উঠে আগ্রহভরা কণ্ঠে বলে– 'আচ্ছা, আপনি?'

সালমা সরোয়ারের বাগদত্তা। সরোয়ার সালমার প্রতি এগিয়ে গিয়ে বলে– 'তুমি কখন এসেছ সালমা?'

সালমার চঞ্চলতা মিইয়ে যায়। চেহারাটা গম্ভীর হয়ে ওঠে– 'আপনি যখন দেখেছেন।'

সরোয়ার রূপবতী মেয়েটির কাছঘেঁষে দাঁড়ায়। জিজ্ঞেস করে– 'ভালো আছ? মনটা কেমন?'

সালমা রুক্ষকণ্ঠে জবাব দেয়– 'ভালো থাকতে দিলেন কোথায়?'

সরোয়ার বুঝে ফেলে, সালমা তার প্রতি নাখোশ। বলল– 'তুমি আমার উপর রুষ্ট সালমা?'

সালমা ঝরনার প্রতি তাকিয়ে অন্যমনস্ককণ্ঠে বলল– 'আপনার প্রতি রুষ্ট হওয়ার কি আমার অধিকার আছে?'

সরোয়ার রূপসীর পেলবকোমল ডান হাতটা নিজের হাতে নিয়ে বলল– 'অধিকার! তুমি তো আমার আত্মার শান্তি।'

সালমা ধীরে-ধীরে সরোয়ারের মুঠি থেকে হাতটা ছাড়িয়ে নিতে-নিতে বলল– 'দয়া করে আমাকে কষ্ট দেবেন না!'

সরোয়ার সালমার সুপুষ্ট গোলাপি গণ্ডদেশের প্রতি তাকিয়ে বলল– 'আল্লাহর শপথ, আমি সত্য বলছি।'

ঃ কিন্তু আপনি তো আমাকে কিছু না-জানিয়েই চলে এসেছেন।...

সরোয়ার সালমার কথা কেটে বলল– 'হ্যাঁ, এই অন্যায়টা আমি করেছি। কিন্তু তুমি কি জান ভুলটা কেন হয়েছে? শুধু জিহাদের স্পৃহা এবং শাহাদাতের প্রবল আকাঙ্খার কারণে।'

ঃ আপনি সত্য বলছেন?

ঃ আল্লাহর শপথ, আমি সত্য বলছি।

ঃ তা হলে তো আমি এতক্ষণ ভুলের মধে ছিলাম। একজন মুসলমানের মাঝে এমন জযবা থাকা-ই তো চাই।

ঃ তা তুমি কি আমার অপরাধ ক্ষমা করে দিয়েছ?

ঃ হ্যাঁ, আপনিও আমাকে ক্ষমা করে দিন।

ঃ তুমি আবার কী অন্যায় করেছ?

ঃ আপনার প্রতি আমার সন্দেহ জেগেছিল।

ঃ আমি তোমাকে মাফ করে দিলাম। শোনো সালমা, এ-কারণেই ইসলামের শিক্ষা হচ্ছে, স্বচক্ষে না-দেখে কিংবা নিজকানে না-শুনে কোনো ব্যাপারে কারও প্রতি সন্দেহ করতে নেই।

ঃ তা হলে তো আমি আল্লাহর দরবারেও গুনাহগার হয়েছি। হে আল্লাহ, তুমিও আমাকে ক্ষমা করে দাও।

সালমা দুই হাতের করতল একত্রিত করে দু'আর পদ্ধতিতে আকাশের পানে তাকায়। সরোয়ার মুচকি হেসে বলল– 'তুমি নিশ্চিন্ত থাকো। যে রূপস্রষ্টা তোমাকে রূপের ঐশ্বর্য দান করেছেন, তিনি অবশ্যই তার এই রূপসী দাসীটার অপরাধ ক্ষমা করে দেবেন।'

সালমা বাঁকা চোখে সরোয়ারের প্রতি তাকিয়ে বললো– 'আপনি মনে হয় খ্রিস্টানদের দেশে এসে আরবসভ্যতা ভুলে গেছেন।'

ঃ তা কেমন?

ঃ শুনেছি খ্রিস্টান পুরুষরা সামনাসামনি মেয়েদের রূপের প্রশংসা করে থাকে। কিন্তু ইসলামে তো এমনটি করা নিষেধ আছে।

ঃ তুমি সঠিক বলেছ। আমার ভুল হয়ে গেছে। আল্লাহ্ আমাকে ক্ষমা করুন।

সরোয়ার আরও কিছু বলতে চাচ্ছিল। কিন্তু সালমা তাকে থামিয়ে দিয়ে ফিসফিসিয়ে বলল– 'চুপ থাকুন, কে যেন আসছে!'

সরোয়ার মাথা উঁচু করে তাকায়। দেখে, কয়েকটি শিশু ও কিশোরী এদিকে আসছে। সরোয়ার বলল– 'আমার আর এখানে থাকা ঠিক হবে না। আবার কবে দেখা হবে প্রিয়া?'

ঃ যখন সুযোগ মিলবে। এখন যান। আল্লাহ হাফেজ।

সরোয়ার উঠে একদিকে কেটে পড়ে। সালমা ওখানেই বসে মিটিমিটি হাসতে থাকে। সরোয়ার ওখান থেকে উঠে ঝটপট বড় একটি গাছের আড়ালে চলে যায় এবং দ্রুত সেখান থেকে ক্যাম্প অভিমুখে হাঁটা দেয়। কিশোরী ও শিশুরা হল্লা করে-করে সালমার নিকট এসে পৌছয়। সালমা তাদের নিয়ে এই মনোরম পার্বত্য অঞ্চলে আনন্দে মেতে ওঠে।

চৌদ্দ.

দিনকয়েক অবস্থানের পর নবাগত বাহিনীটির শরীর-মন চাঙ্গা হয়ে ওঠে। এখন তারা সম্মুখে অগ্রসর হতে প্রস্তুত।

মিস্‌রের গভর্নর আব্দুল্লাহ ইবনে সা'দ আফ্রিকায় সেনাভিযানের অনুমতি দরবারে-খেলাফত থেকে লাভ করেছিলেন। তাই তিনিই বাহিনীর সেনাপতি নিযুক্ত হন। আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর তাকে বললেন– 'যদিও আমি মদীনা থেকে আসা বাহিনীর সেনাপতি নিযুক্ত হয়ে এসেছি, তথাপি এখন থেকে আমার বাহিনী আপনারই অধীন হয়ে যুদ্ধ করবে। আমাকে আপনি যা আদেশ করবেন, আমি মান্য করতে বাধ্য থাকব।'

আব্দুল্লাহ ইবনে সা'দ বললেন– 'কিন্তু আমি তো চাচ্ছিলাম, এই সমগ্র বাহিনীর নেতৃত্ব আপনারই হাতে তুলে দেব।'

ঃ না, এটা ঠিক হবে না। আমি এর সমর্থন করি না। আমার এবং সকল মুসলমানের ঐকান্তিক কামনা, গোটা বাহিনীর সেনাপতি আপনিই হবেন।

ঃ ঠিক আছে, আপনারা সকলেই যখন আমাকে এই মর্যাদা দিতে চাচ্ছেন, তো আমি মেনে নিলাম। এখন আমাদের আগে তারাবলিস অভিমুখে রওনা হওয়া দরকার।

ঃ আমার অভিমতও তা-ই। যাবিলার পরে তারাবলিসের দুর্গ– যা অত্যন্ত শক্ত ও দুর্ভেদ্য– তাকে পদানত করার পরই আমরা আফ্রিকার রাজধানী সাবতিলার দিকে অগ্রসর হতে পারব।

ঃ তা-ই হোক। এখন আমরা আল্লাহর উপর ভরসা করে রওনা হই।

ঃ আপনি কি অল্প-অল্প করে সৈন্য প্রেরণ করতে চাচ্ছেন?

ঃ হ্যাঁ, আমার সে-রকমই ইচ্ছা।

ঃ কিন্তু আমি তা সমীচীন মনে করি না। কারণ, তারাবলিসে খ্রিস্টানদের অনেক সৈন্য থাকা বিচিত্র নয়। এমতাবস্থায় যখন সেখানে আমাদের

স্বল্পসংখ্যক সৈন্য গিয়ে উপনীত হবে, তারা হঠাৎ আক্রমণ করে বসতে পারে।

ঃ তা হতে পারে।

ঃ আমাদের পথও অত্যন্ত দুর্গম ও বিপদসংকুল। তাই অল্প-অল্প সৈন্য প্রেরণ করা ঠিক হবে না।

ঃ আপনার অভিমত যথার্থ। আগামী কাল সমস্ত ফৌজ একসঙ্গেই রওনা হবে।

ঃ যাবিলায় কত সৈন্য রেখে যাবেন?

ঃ একজনও না।

ঃ আরসানুস যদি গাদ্দারি করে এবং পেছন থেকে আমাদের উপর আক্রমণ করে বসে, তখন কী হবে?

ঃ আমার ধারণা, সে এমনটি করবে না।

ঃ এর বিশেষ কোনো কারণ আছে কি?

ঃ আছে। আরসানুস জর্জিরের রূপসীকন্যা হেলেনের প্রতি আসক্ত। আর আমাদের মাধ্যমে সে তাকে পেতে চায়।

ঃ মিসরে প্রবেশ করেই আমি ওই মেয়েটির রূপের প্রশংসা শুনেছি। মনে হচ্ছে, মেয়েটি খুবই সুন্দরী।

ঃ আমিও তেমনই শুনেছি। বরং রূপসী হওয়ার পাশাপাশি বীরাঙ্গনা যোদ্ধাও।

ইবনে ওমর মুচকি হেসে বললেন– 'বীরত্বটা তার বাড়তি রূপের কারণে। কারণ, সে যার উপর আঘাত হানতে উদ্যত হয়, সে তার রূপে মুগ্ধ হয়ে পালটা আঘাত করা থেকে বিরত থাকে।

ঃ ব্যাপারটা বোধ হয় এমনই।

ঃ তা হলে আরসানুসের পক্ষ থেকে কোনো আশঙ্কা নেই?

ঃ আমি তা-ই মনে করি।

ঃ খ্রিস্টানদেরকে বিশ্বাস করা যায় না। তবু আমাদের ভরসা তো আল্লাহর উপর। তিনি যা মঞ্জুর করবেন, তা-ই হবে।

সেদিনই সমগ্র বাহিনীতে ঘোষণা করে দেওয়া হয়, আগামী কাল ফৌজ রওনা হবে। মুসলমানগণ নিজ-নিজ মালপত্র গোছানো ও বাঁধছাদা শুরু করে।

আরসানুসও সংবাদটা পেয়ে যায়। সে আব্দুল্লাহ ইবনে সা'দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে নিবেদন জানায়– 'শুনেছি, আপনি নাকি তারবলিসের উদ্দেশ্যে রওনা হচ্ছেন?'

ঃ আপনি ঠিকই শুনেছেন।

ঃ আপনি অনুমতি দিলে আমিও আমার বাছাইকরা কিছু বীরযোদ্ধা নিয়ে আপনার সঙ্গে যেতে চাই।

ঃ আপনি যেতে চাইলে আমার পক্ষ থেকে অনুমতি আছে। কিন্তু আপনি এত কষ্ট কেন স্বীকার করতে চাচ্ছেন?

ঃ আশা করি, আমি মনের মানুষটিকে পেয়ে যাব।

ঃ ঠিক আছে, ভাগ্য পরীক্ষা করে দেখতে দোষ কী। আমাদের একজন পথপ্রদর্শকেরও তো প্রয়োজন।

ঃ আর গুপ্তচরেরও তো প্রয়োজন আছে।

ঃ আপনি ঠিক বলেছেন। পথপ্রদর্শক, গুপ্তচর– দু-ই প্রয়োজন।

ঃ উভয় কাজই আমার বিশ্বস্ত সৈনিকরা আঞ্জাম দেবে।

ঃ আমি আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকব।

ঃ বেশি নয়– মাত্র আড়াইশ।

ঃ ঠিক আছে, আপনি প্রস্তুত হোন।

আরসানুস চলে যায়। আব্দুল্লাহ ইবনে সা'দ বিষয়টি ইবনে ওমরকে জানান। তিনি বললেন– 'ভালোই হল, আরসানুস আমাদের সঙ্গে থাকবে। তাতে যাবিলাবাসীদের বিদ্রোহের আর কোনো আশঙ্কা থাকবে না।'

ইবনে ওমর বললেন– 'আমারও সে-রকমই ধারণা।'

সেদিনই সন্ধ্যা নাগাদ দুর্গের বাইরে আরসানুসের তাঁবু দাঁড়িয়ে যায়। তার দুইশ পঞ্চাশজন সৈন্যও এসে তার তাঁবুর আশপাশে অবস্থান গ্রহণ করে।

পরদিন ফজর নামাযের পরপরই ইসলামী বাহিনীতে চাঞ্চল্য শুরু হয়ে যায়। সেনাপতি আব্দুল্লাহ ইবনে সা'দ বাহিনীকে কয়েক ভাগে বিভক্ত করে দেন। ইবনে ওমর, ইবনে আব্বাস, হাসান, হুসাইন ও ইবনে জাফর (রা.) একেকটি ইউনিটের কমান্ডার নিযুক্ত হন। প্রত্যেকের অধীনে তিন হাজার করে সৈন্য দেওয়া হয়। অবশিষ্ট সৈন্য সেনাপতি ইবনে সা'দ নিজের অধীনে রাখেন। সরোয়ারকে এক হাজার অশ্বারোহীসহ মহিলা ও শিশুদের নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত করা হয়।

বাহিনী রওনা হয়েছে। সকলের আগে আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর ও তাঁর সেনাদল। তাঁর এক মাইল পথ অতিক্রম করার পর রওনা হন ইবনে আব্বাস। তার পর হযরত হাসান। হাসানের পেছনে হযরত হুসাইন। তার পর হযরত ইবনে জাফর (রা.)। প্রতিটি ইউনিটের মাঝে ব্যবধান রাখা হয় এক মাইল করে। সবশেষে সেনাপতি আব্দুল্লাহ ইবনে সা'দ অবশিষ্ট সকল সৈন্য ও আরসানুসসহ রওনা হন।

যেহেতু প্রতি ইউনিটের মাঝে এক মাইল পথ ফাঁকা, তাই ইসলামী বাহিনী দশ-এগারো মাইল এলাকাজুড়ে বিস্তৃত হয়ে পড়েছে। সরোয়ার রওনা হয় দুপুরে।

মুসলিম বাহিনী যে-ভূখন্ড অতিক্রম করতে শুরু করেছে, সেটি অত্যন্ত দুর্গম। প্রথম-প্রথম কিছু অঞ্চল সবুজ-শ্যামল ছিল। এখানে ঘাস, ঝোপ, গাছপালা, পানি সবই পাওয়া যায়। কিন্তু ক্রমান্বয়ে শ্যামলিমা নিঃশেষ হয়ে পানি ও বৃক্ষলতাহীন মরু অঞ্চল শুরু হয়ে যায়। এই মরূদ্যানে হরিণের পাল ও উট পাখির সাক্ষাৎ মেলে। মুসলমানরা ইচ্ছে মতো হরিণ শিকার করে রান্না করে খেতে থাকে।

আরও কিছুদূর অতিক্রম হওয়ার পর মরু অঞ্চল শেষ হয়ে বন-বনানির পালা শুরু হয়, যা এতই দুর্গম যে, আরোহীরা তো দূরের কথা, পদাতিকদেরই গাছের ফাঁক গলিয়ে অতিক্রম করতে কষ্ট হচ্ছে। গাছপালা একটি অপরটির সঙ্গে এমনভাবে মিশে দাঁড়িয়ে আছে এবং তার ডাল-পালা এতো নিচু যে, পথই পাওয়া যাচ্ছে না। অগত্যা এক হাজার সৈন্য তরবারি ও কুঠারের সাহায্যে মোটা-মোটা ডাল কেটে-কেটে পথ করে নিতে শুরু করে। কিন্তু এভাবে বাহিনীর পথ অতিক্রম করতে অনেক সময় নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। মুসলমানরা দেখতে পায়, বনে নানা বিস্ময়কর ধরনের সাপ-অজগর বিপুল পরিমাণে পড়ে আছে। কোথাও অসংখ্য বানর ছোটাছুটি করছে, যা উপমহাদেশের বানরের তুলনায় অনেক বড় ও শক্তিশালী। কোথাও সাদা শরীর ও কালো মুখবিশিষ্ট বিপুলসংখ্যক হনুমান দেখা যাচ্ছে। তারা দশ-পনেরো গজ দীর্ঘ লাফ দেওয়ার সময় মুসলমানদের দেখার ফলে মাঝপথ থেকেই মোড় ঘুরিয়ে যেখান থেকে লাফ শুরু করেছিলো সেখানে ফিরে যাচ্ছে।

কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর তারা এমনসব প্রাণীদের দেখতে পায়, যাদের দেহকাঠামো মানুষের মতো। তাদের সমস্ত শরীরে শিয়ালের মতো কালো ও লম্বা লোম। মুখমন্ডল ঠিক মানুষের মতো। মানুষেরই ন্যায় দুই পায়ে হাঁটা-চলা করে। এদের নাম গরিলা। এদের চালচলন সম্পূর্ণ মানুষের ন্যায়। ডারউইন নামক এক ইংরেজ বিজ্ঞানী দীর্ঘ গবেষণার পর আবিষ্কার করেছিলেন, মানুষ বানরের বংশধর। সম্ভবত তিনি গরিলা দেখেছিলেন আর তাদেরকে মানুষের অনুরূপ দেখে ধরে নিয়েছিলেন, মানুষ গরিলা থেকে এসেছে। আর গরিলাকেই তিনি ভেবেছিলেন বানর।

আরবরা এর আগে কখনও গরিলা দেখেনি। এখন দেখে এবং তাদের আচরণে তারা বিস্মিত হয়। গরিলারাও আরবদের দেখে অবাক্ হয়। গাছের ডাল ও লতা-পাতার আড়াল থেকে উঁকি দিয়ে-দিয়ে তারা আরব মুসলামানদের দেখতে থাকে এবং নানা অঙ্গভঙ্গি করতে থাকে। তারা ঝোপের আড়ালে পালিয়ে কিংবা গাছে চড়ে এক ডাল থেকে আরেক ডালে লাফালাফি করছে।

মুসলমানরা মানুষরূপী এই প্রাণীদের এক-দুটি ধরে আরবে পাঠিয়ে দেওয়ার মনস্থ করে। আরবরা এদের দেখে মুগ্ধ হবে। কিন্তু প্রাণীগুলো অত্যন্ত ধূর্ত, ভয়ানক ও রক্তখোর। মুসলমানরা একটি গরিলাও ধরতে সক্ষম হল না। মুসলমানরা বনের একস্থানে বিশালকায় অনেকগুলো হাতি দেখতে পায়। হাতিগুলো আকার– গঠনে ভারতবর্ষের হাতির মতো।

সীমাহীন কষ্ট বরণ করে বনের পথ অতিক্রম করার পর এখন মুসলিম বাহিনীর সম্মুখে একটি নদী। তারা নদী পার হওয়ার জন্য উপরে পুল তৈরি করতে শুরু করে। সেখানেই তারা ছাউনি ফেলে। একদিন মুসলমানরা দেখতে পায়, নদী সাঁতরে কয়েকটি ঘোড়া কূলের দিকে এগিয়ে আসছে। অত্যন্ত ভয়ংকর ও শক্তিমান ঘোড়া। কূলে পৌছেই তারা পাড়ে উপবিষ্ট আরব মুসলমানদের উপর আক্রমণ করে তাদেরকে নদীতে টেনে নিতে চেষ্টা করে। কিন্তু আরবরা দ্রুত পিছনে সরে যায় এবং তির ছুঁড়লে ঘোড়াগুলো তড়িঘড়ি নদীতে চলে যায়। পরে জানা যায়, ওগুলো ছিল জলঘোড়া।

পুল তৈরী হয়ে গেলে ইসলামী বাহিনী তার উপর দিয়ে নদী পার হয়ে সম্মুখে এগিয়ে যায়। কয়েক ফার্লং পথ অতিক্রম করার পর সম্মুখে তারাবলিসের বিখ্যাত ও দুর্ভেদ্য দুর্গ চোখে পড়তে শুরু করে। তারাবলিস নদীর কূলে অবস্থিত। নদী পার হয়ে মুসলমানরা দুর্গের সম্মুখে গিয়ে উপনীত হলে দুর্গের ফটক খুলে যায়। ভিতর থেকে খ্রিস্টানসেনারা স্রোতের মতো বের হয়ে-হয়ে মাঠে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে।

পনেরো.

খ্রিস্টান বাহিনী দুর্গ থেকে দ্রুতগতিতে বেরিয়ে আসছে। মাঠে এসে-এসে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে তারা। মুসলিম বাহিনীতে সর্বাগ্রে আছেন আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর ও তাঁর সেনাদল। খ্রিস্টান বাহিনীর গতি-প্রকৃতি দেখে খানিক দূরত্ব বজায় রেখে ইবনে ওমর নিজ বাহিনীকে বিন্যস্ত করতে শুরু করেন।

এখনও ইবনে ওমরের সারি বিন্যস্ত হয়নি। ইতিমধ্যে ইবনে যুবাইর তার বাহিনীসহ পৌছে যান। ইবনে ওমর তাঁর বাহিনীকে মায়মানা-মায়সারারূপে বিন্যস্ত করছিলেন। কিন্তু এবার তিনি বাহিনীকে গুটিয়ে কালবে নিয়ে নেন এবং ইবনে যুবাইর মায়মানায় পৌছে যান। তার অব্যবহিত পরই ইবনে আব্বাস এসে পৌছান। তিনি মায়সারায় দাঁড়িয়ে যান। অবশেষে এসে পৌছান হযরত হাসান ও হুসাইন (রা.)। এরা দুজন ইবনে ওমরের পিছনে সারিবদ্ধ হয়ে যান।

এই ফাঁকে পনেরো হাজার খ্রিস্টানসেনা দুর্গ থেকে বেরিয়ে যথারীতি বিন্যস্ত হয়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়।

এ-পর্যন্ত মুসলমানদের সৈন্য এসে পৌঁছেছে মাত্র দশ হাজার। খ্রিস্টানদের মোকাবেলায় এই সংখ্যা অকিঞ্চিতকর। তারাবলিসের খ্রিস্টানরা মুসলমানদের উপর আক্রমণ চালিয়ে দেয়। লৌহবর্মপরিহিত খ্রিস্টানসেনারা বীরবেশে এগোতে শুরু করে। তাদের একহাতে লম্বা বর্শা আরেক হাতে ঢাল। তারা এমনভাবে অগ্রসর হতে শুরু করে, যেন পলকের মধ্যে মুসলমানদের পিষে ফেলবে।

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর খ্রিস্টানদের এগোতে দেখে মুসলমানদেরকে প্রস্তুত হতে ইঙ্গিত করেন। খ্রিস্টানরা কাছাকাছি এসে পৌঁছুলে তিনি উচ্চকণ্ঠে আল্লাহু আকবর ধ্বনি তোলেন। জবাবে মুসলিম সৈন্যরা হাতে বর্শা তুলে নেয়, পিঠের ঢাল হাতে নিয়ে নেয়। ইবনে ওমর পুনরায় তাকবীর দেন। মুসলমানরা ধীরে-ধীরে অগ্রসর হতে শুরু করে।

খ্রিস্টানরা অত্যন্ত দ্রুতগতিতে এগিয়ে আসছিল। একেবারে নিকটে এসে পৌঁছুলে ইবনে ওমর তৃতীয়বারের মতো ধ্বনি দেন। উত্তরে মুসলমানরা কণ্ঠ ছেড়ে উচ্চৈঃস্বরে তাকবীর ধ্বনি তোলে। নারায়ে তাকবীর– আল্লাহু আকবার ধ্বনিতে তারাবলিসের মাটি কেঁপে ওঠে। মুসলমানদের সবকটি ইউনিট সক্রিয় হয়ে ওঠে। প্রতিটি ইউনিট বীরবেশে সম্মুখে এগিয়ে যায়। অপরদিক থেকে খ্রিস্টানরাও এগিয়ে আসছিল। উভয় বাহিনী সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে পড়ে। যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। আঘাত-পালটা আঘাত চলতে শুরু করে।

এতক্ষণ দিবসের এক প্রহরেরও বেশি সময় চলে গেছে। সর্বত্র ও প্রতিটি বস্তুর উপর সোনালি রোদ ছড়িয়ে পড়েছে। সূর্যকিরণে বর্শার আগাগুলো চকমক করতে শুরু করেছে।

খ্রিস্টান ও মুসলমানরা এক পক্ষ অপর পক্ষের উপর জোরদার আক্রমণ করে চলেছে। খ্রিস্টানদের স্বপ্ন ছিল, তারা অল্প সময়ের মধ্যে মুসলমানদের পিষে ফেলবে, বর্শার আঘাতে জর্জরিত করে মাটিতে ফেলে দেবে এবং তাদের রক্তে তারাবলিসের মাটিকে সিঞ্চিত করবে। কিন্তু যখন মুসলমানরা তাদের উপর আক্রমণ করল এবং ক্ষুদ্র বর্শার আঘাতে তাদের বুক ও পেট বিদীর্ণ করতে শুরু করল, তখন তাদের সম্বিৎ ফিরে এল। তারা বুঝে ফেলল, মুসলমানরা মোম নয় যে, যেমন খুশি ভেঙে ফেলব। তারা বরং দেখতে শুরু করেছে, তাদের স্বপ্নের বিপরীতে মুসলমানরা অতিশয় বীর, কঠিন ও নির্ভীক; তারা রণাঙ্গনকে শিশুদের খেলাঘর এবং যুদ্ধকে খেলার চেয়ে বেশি কিছু মনে করে

না। কিন্তু খ্রিস্টানরা সংখ্যায় মুসলমানদের চেয়ে বেশি। তাদের মনোবলও অধিক। তারা নির্ভয়ে ও পূর্ণ উদ্দীপনার সঙ্গে যুদ্ধ করছে।

মুসলমানরা যখন দেখল, যুদ্ধ দীর্ঘতা লাভ করছে এবং তাদের বর্শা তাদের আশানুরূপ কাজ করছে না, তখন তারা বর্শা ছেড়ে হাতে তারবারি তুলে নেয়। হাতে তরবারি নিয়েই তারা আল্লাহু আকবার ধ্বনি তোলে এবং পূর্ণশক্তিতে বীরত্বের সঙ্গে আক্রমণ করে বসে। এই পরিস্থিতি দেখে খ্রিস্টানরাও বর্শা ফেলে তরবারি বের করে মুসলমানদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।

রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ চলছে। মুসলমানরা জোরদার আক্রমণ করে-করে খ্রিস্টানদের অভ্যন্তরে ঢুকে যেতে থাকে। খ্রিস্টানরাও মুসলমানদের মাঝে ঢুকে পড়ে। লড়াই ঘোরতর রূপ লাভ করতে থাকে। ধবধবে সাদা ধারালো তরবারিগুলো বিদ্যুৎ-চমকের মতো প্রতিপক্ষের মাথার উপর চমকাতে শুরু করে।

মারমার কাটকাট রবে যুদ্ধ চলছে। উভয় পক্ষের বীর সৈন্যরা পূর্ণ উদ্দীপনার সঙ্গে লড়াই করছে। তারবারির আঘাতে তরবারি ভেঙে যাচ্ছে। ধড় থেকে মাথা বিচ্ছিন্ন হচ্ছে। মস্তকবিহীন দেহগুলো ধপাস-ধপাস করে মাটিতে লুটিয়ে পড়ছে। রক্তের স্রোত প্রবাহিত হচ্ছে। সূর্যের কিরণে সাদা তরবারিগুলো বিজলির মতো চমকাচ্ছে।

খ্রিস্টান সৈন্যরা বর্মপরিহিত। মাথায় লোহার শিরস্ত্রাণ। তাই মুসলমানদের তরবারি পরাকাষ্ঠা দেখাতে বেগ পাচ্ছে। মুসলমানদের অধিকাংশই বর্মহীন। তাই খ্রিস্টানদের তরবারি তাদের অনায়াসে ক্ষতি করে চলেছে। মুসলমানরা শহীদও হচ্ছে, জখমিও হচ্ছে। কিন্তু বিস্ময়কর ব্যাপার হল, একজন মুসলমান আহত হয়ে পড়লে সে নিরতিশয় ক্রোধান্বিত হয়ে জীবনের মায়া সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করে শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে। আহত হওয়ার পরও দু-একজন খ্রিস্টানকে হত্যা না-করে নিজে শহীদ হচ্ছে না।

লড়াই এখন গণযুদ্ধের রূপ লাভ করেছে। কোনো পক্ষেরই সারিবিন্যাস অক্ষুন্ন নেই। উভয় পক্ষই ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ে যুদ্ধ করছে। উভয় পক্ষেরই প্রতিজন সৈন্য লড়াইয়ে লিপ্ত। খ্রিস্টানরা গলা ফাটিয়ে চিৎকার করছে। মুসলমানরা নীরব। হাজার-হাজার খ্রিস্টান দুর্গের পাঁচিলে উঠে যুদ্ধ দেখছে। পাঁচিল, সমগ্র দুর্গ ও গোটা ময়দান মুখরিত হয়ে ওঠেছে। সবখানে সাজ-সাজ রব। যে-কোনো পক্ষের জয় কিংবা পরাজয় এখন সময়ের ব্যাপার।

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর একহাতে পতাকা, অপর হাতে তরবারি ধারণ করে যারপরনাই জোশ ও উদ্দীপনার সঙ্গে আক্রমণ করছেন এবং শত্রুসেনাদের

হতাহত করে-করে এগিয়ে চলছেন। তিনি এমন শত্রুদলের উপর আক্রমণ করছেন, যারা সংখ্যায় বেশি। জোরদার আক্রমণ করে দলের অধিকাংশকে হত্যা করে ফেলছেন। জীবনে রক্ষা-পাওয়া দু-চারজন খ্রিস্টান তার ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে এদিক-ওদিক পালিয়ে যাচ্ছে কিংবা অন্যদলে গিয়ে যোগ দিচ্ছে। ইবনে ওমর আরেকটি দলের উপর আক্রমণ করছেন।

ইবনে জাফর একহাতে ঢাল অপর হাতে তরবারি নিয়ে যুদ্ধ করছেন। তিনি যে-খ্রিস্টানসেনাদের উপর আক্রমণ করছেন, তাকে খাক-খুনের বিছানায় শুইয়ে দিচ্ছেন। কারও মাথায় আঘাত হানছেন তো তার শিরস্ত্রাণ কেটে মাথা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। তার হাতেও বহু খ্রিস্টানসেনা নিহত ও আহত হয়।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসও একের-পর-এক শত্রুসেনাদের হত্যা করে চলছেন। তিনি যে-অশ্বারোহী সেনার উপর আক্রমণ করছেন, তাকে হত্যা না-করে পিছু হটছেন না।

হযরত হাসান বাঁ হাতে তরবারি নিয়ে পূর্ণ শক্তিমত্তার সঙ্গে লড়াই করছেন। তার প্রিয় তরবারি যার গায়ে আঘাত হানছে, সে আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না। লোহার বর্ম ভেঙে কেটে বক্ষে আঘাত হানছে। গলায় আঘাত করছেন, তো মাথাটা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে।

হযরত হাসান ছুটে-ছুটে আক্রমণ করছেন। প্রতিটি আক্রমণে কমপক্ষে একজন করে খ্রিস্টানকে হত্যা করছেন। হাসান তরুণ যুবক। তাই খ্রিস্টানরা অপরিপক্ব ছোকড়া ভেবে এক আঘাতে হত্যা করে ফেলার মানসে তার উপর আক্রমণ করছে। কিন্তু তিনি সেই আক্রমণ প্রতিহত করে উলটো আক্রমণকারীর উপরই ঝাঁপিয়ে পড়ছেন। আক্রমণকারী খ্রিস্টান হযরত হাসানের রুদ্রমূর্তি দেখে ভয়ে-আতঙ্কে থমকে যাচ্ছে। এই সুযোগে হযরত হাসানের তরবারি তার ইহলীলা সাঙ্গ করে দিচ্ছে।

হযরত হুসাইনও বেজায় ব্যস্ত। জোরদার আক্রমণ করে তিনিও খ্রিস্টানদের এক-এক করে যমের হাতে তুলে দিচ্ছেন। যেদিকেই আক্রমণ করছেন দু-চারজন খ্রিস্টানকে হত্যা না-করে ফিরছেন না। যে-দলের উপর আঘাত হানছেন, তাকে নিঃশেষ না-করে ক্ষান্ত হচ্ছেন না।

হযরত হুসাইনের বয়স হযরত হাসান অপেক্ষাও কম– তরুণ। খ্রিস্টানরা আনাড়ি ভেবে এক আঘাতে শেষ করে ফেলার উদ্দেশ্যে তার উপর হামলা চালায়। কিন্তু প্রমাণিত হয়, তিনি একজন পরিপক্ব বীর লড়াকু। তার তরবারির চমক দেখে খ্রিস্টানদের কলিজার পানি শুকিয়ে যেতে শুরু করে।

খ্রিস্টানরা জানে না, এরা দুজন হাশেমি নওজোয়ান। এরা বিশ্বনবীর প্রাণপ্রিয় দৌহিত্র। তাদের জানা নেই, এদের গায়ে আচড়টি লাগাবার শক্তি তাদের নেই। তারা জানে না, তাদের সমগ্র বাহিনীর মোকাবেলায় এরা দুজনই যথেষ্ট। এদের আল্লাহপ্রদত্ত শক্তির মোকাবেলা করা মানুষ তো ভালো, বনের রাজা সিংহের পক্ষেও সম্ভব নয়।

আল্লাহর সিংহ হযরত আলী এবং রাসূলতনয়া হযরত ফাতেমার কলিজার টুকরা হযরত হাসান ও হুসাইন এত শক্তিমান বীর ছিলেন যে, পৃথিবীর বিখ্যাত বীর যোদ্ধারাও তাদের মোকাবেলায় পেরে উঠত না। যে-ই তাদের সামনে আসত, তাকেই তারা মৃত্যুর হাতে তুলে দিতেন, যেন মহান আল্লাহ এই সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছেন, তাঁরা দুজন যারই উপর আক্রমণ চালাবে, তার আর বেঁচে থাকার অধিকার থাকবে না, যেন আকাশের ফেরেশতারা তাদের সাহায্য ও হেফাযত করছেন।

খ্রিস্টানরা পূর্ণশক্তি ও উদ্দীপনার সঙ্গে আক্রমণ করছে। কিন্তু তেমন কিছু অর্জন করতে পারছে না। বিপরীতে প্রত্যেক মুসলমান যেন এক একটি রক্তপায়ী ব্যাঘ্র। তারা তীব্রগতিতে লাফিয়ে-লাফিয়ে আক্রমণ করে খ্রিস্টানদের হত্যা করছে। ভীষণ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ চলছে। দেহ থেকে মাথা বিচ্ছিন্ন হয়ে টুপটুপ করে মাটিতে পড়ছে। হাত কেটে-কেটে শরীর থেকে আলাদা হয়ে যাচ্ছে। রক্ত পানির মতো প্রবাহিত হচ্ছে।

যেসব অশ্বারোহী আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে পড়ে পড়ে মারা যাচ্ছে, তাদের ঘোড়াগুলো সীমাহীন বিশৃঙ্খলভাবে পলায়ন করছে এবং সামনে যাকেই পাচ্ছে পিষে ফেলছে। খ্রিস্টানরা যতই উদ্দীপনা ও ক্ষোভের সঙ্গে ধেয়ে এসে আক্রমণ করছে, মুসলমানরা ততধিক বীরত্বের সঙ্গে পালটা আঘাত হেনে তাদের হত্যা করছে। বিস্তৃত রণাঙ্গনে লাশের স্তূপ জমে গেছে। রক্তমাখা তরবারিগুলো ঊর্ধ্বে উঠে-উঠে রক্তের বৃষ্টি বর্ষণ করছে। প্রতিজন যোদ্ধার পরিধেয় রক্তে এমনভাবে ভিজে গেছে, যেন তারা রক্ত দ্বারা গোসল করেছে।

বিপুলসংখ্যক খ্রিস্টান মৃত্যুমুখে পতিত হলেও এখনও তাদের উৎসাহ-উদ্দীপনায় ভাটা পড়েনি। তারা যথারীতি যুদ্ধ করে যাচ্ছে এবং এখনও এই ভাবনায় বিভোর যে, পরাজিত করে মুসলমানদের তাড়িয়ে দেবে। কিন্তু মুসলমানরা কোনোভাবেই তাদের কাবুতে আসছে না। যারপরনাই বীরত্বের সঙ্গে আক্রমণ করে-করে খ্রিস্টানদের হত্যা করছে।

তারাবলিসের ময়দানে এমনই এক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ চলছে এবং মৃত্যু-

ফেরেশতা বীরযোদ্ধাদের আত্মা বের করে নিচ্ছে। ঠিক এমন সময়ে যাবিলার দিক থেকে ঘন মেঘের মতো ধূলিঝড় উত্থিত হতে দেখা যায়। ধীরে-ধীরে এই ঝড় সামনের দিকে এগিয়ে আসতে শুরু করে।

মুসলমানরা বুঝে ফেলে, ইসলামী বাহিনী আসছে। তারা এই বাহিনী এসে পৌঁছার আগে-আগেই যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটাতে মরিয়া হয়ে ওঠে। তারা জোরদার আক্রমণ চালায়। আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর আল্লাহু আকবার ধ্বনি তোলেন। প্রত্যেক মুসলমান প্রতিধ্বনি তুলে আকাশ-বাতাস মুখরিত করে তোলে। সিংহহৃদয় মুসলিম সৈন্যরা পূর্ণশক্তিতে আঘাত হানে।

যাবিলার দিক থেকে অগ্রসরমান ধূলিঝড়টিকে দেখেছে খ্রিস্টানরাও। তারাও ধরে নেয়, নিশ্চয়ই কোনো ইসলামী বাহিনী আসছে। কারণ, ওদিক থেকে খ্রিস্টান বাহিনী আসবার কোনো আশা নেই। তাই তারাও আত্মসংবরণ করে তীব্রগতিতে আক্রমণ করে। যুদ্ধ পূর্বাপেক্ষা ঘোরতর রূপ লাভ করে।

মুসলমানরা শহীদ হচ্ছে। বিপুলসংখ্যক খ্রিস্টানসেনা মৃত্যুমুখে নিপাতিত হচ্ছে।

ধূলিঝড় কাছাকাছি চলে এসেছে। এটি মিসরের গভর্নর আব্দুল্লাহ ইবনে সা'দের বাহিনী। এই বাহিনীকে দেখামাত্র খ্রিস্টান বাহিনীর হাত-পা অবশ হয়ে গেছে। মনোবল হারিয়ে তারা দুর্গের দিকে পালাতে শুরু করে। মুসলমানরা ধাওয়া করে তাদের নির্বিচার হত্যা করতে শুরু করে। খ্রিস্টানরা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পলায়ন করেছে। তাই স্থির হয়ে পুনরায় মোকাবেলা করা আর তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। যদি তারা নিয়মতান্ত্রিকভাবে পিছপা হত, তা হলে এত ক্ষতি হত না, যতটা এখন হয়েছে। অবশেষে তারা পালিয়ে দুর্গে ঢুকে পড়ে।

ইত্যবসরে মুসলমানরা হঠাৎ ফটকের নিকট পৌঁছে যায়। তাদের দেখে খ্রিস্টানরা ঝটপট ফটক বন্ধ করে দেয়। মুসলমানরা ফটকের সম্মুখে দাঁড়িয়ে যায়। আব্দুল্লাহ ইবনে সা'দ এসে পৌঁছেন। তিনি দুর্গ অবরোধ করার নির্দেশ প্রদান করেন। মুসলমানরা দুর্গ অবরোধ করে ফেলে। একদল মুসলিম সৈন্য শহীদদের লাশগুলো একত্রিত করে। মাত্র তেয়াত্তরজন মুসলমান শহীদ হয়েছে। খ্রিস্টানরা মারা গেছে ছয় হাজার। শহীদদের লাশগুলো দাফন করা হল। মুসলমানরা কঠোরভাবে তারাবলিস দুর্গ অবরোধ করে ফেলে।

ষোলো.

খ্রিস্টানরা তারাবলিসের দুর্গে ঢুকে পড়েছে। মুসলমানরা দুর্গ অবরোধ করে ফেলেছে। তারা ক্রমান্বয়ে অবরোধ এত শক্ত করে ফেলে যে, পাখিটিও

ঢুকতে-বেরুতে পারছে না। এই অবস্থা দেখে খ্রিস্টানরা দারুণ ভয় পেয়ে যায়। তারা দেখতে পায়, যদি বাইরে থেকে সাহায্য না আসে, তা হলে বেশিদিন টিকে থাকা সম্ভব হবে না। দুর্গের অধিপতির নিকট বিশিষ্ট নাগরিকদের একটি প্রতিনিধি দল এসে উপস্থিত হয়। দলনেতা বলল– 'অবরোধের এই অবস্থা যদি দুই থেকে চার মাস বহাল থাকে, তা হলে দুর্গবাসীরা মনোবল হারিয়ে ফেলবে। তাই আমাদের পরামর্শ হচ্ছে, আফ্রিকার সম্রাটের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে দূত প্রেরণ করা হোক।'

তারাবলিসের দুর্গপতি হারকুস একজন অতিশয় দাম্ভিক বীর পুরুষ। বলল– 'অভাগা আরবরা সত্যিই কঠিন অবরোধ করেছে। সম্রাট জর্জিরের সমীপে দূত প্রেরণের কথা আমিও ভাবছি। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, মুসলমানদের দৃষ্টি এড়িয়ে বের হওয়া কারও পক্ষে সম্ভব নয়। তারা রাতেও প্রতিটি ফটকের উপর কড়া দৃষ্টি রাখছে। আমার মনে হয় না, তাদের চোখ ফাঁকি দিয়ে বের হওয়া কারও পক্ষে সম্ভব হবে।'

ঃ আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে।

ঃ কী বুদ্ধি?

ঃ এ-কথা ঠিক যে, মুসলমানরা দিনরাত দুর্গের ফটকের উপর দৃষ্টি রাখছে এবং তাদের চোখ এড়িয়ে কারও পক্ষে বের হওয়া সম্ভব নয়। তবে একটা পথ আছে। পয়ঃপ্রণালি বেয়ে দুর্গ থেকে বের হওয়া সম্ভব।

হারকুস খুশি হয়ে বলল– 'আপনি চমৎকার বুদ্ধি বের করেছেন তো! এটা হতে পারে!'

তৎক্ষণাৎ এক ব্যক্তিকে সাবতিলা যাওয়ার জন্য প্রস্তুত করা হয়। হারকুস একখানা পত্র লিখে তাকে দেন।

দূত রাতে পয়ঃপ্রণালিতে ঢুকে পড়ে। নালাটি কয়েকটি কক্ষের নিচ দিয়ে অতিক্রম করে গেছে। দূত ভিতরে ঢুকে পড়ে অনেক কষ্টে হামাগুড়ি দিয়ে-দিয়ে দুর্গ থেকে বেরিয়ে যায়। বের হয়ে দাঁড়িয়েই দেখতে পায় সম্মুখেই মুসলিম সেনাক্যাম্প এবং তাতে বাতি জ্বলছে। দূত এদিক-ওদিক তাকায়। একদিকে আবছা অন্ধকার অনুমিত হয়। লোকটি সেদিকে হাঁটা দেয়। অন্ধকার রাত। সে চুপি-চুপি পা টিপে-পিটে তাদের নাগালের বাইরে চলে যায়।

তারাবলিসের চারটি আলিশান ফটক আছে। সব কটিতে মুসলমানরা কঠোর প্রহরা বসিয়ে রেখেছে। কিন্তু তারা জানতে পারল না, তাদের চোখ ফাঁকি দিয়ে তারাবলিসের অধিপতি জর্জিরের নিকট দূত পাঠিয়ে দিয়েছে।

যে-কোনো মুহূর্তে যে-কোনো দিক থেকে খ্রিস্টানরা আক্রমণ করে বসতে

পারে। তাই মুসলমানরা নারী ও শিশুদেরকে যাবিলার পথের দিকে ইসলামী ক্যাম্পের পিছনে অবস্থানের ব্যবস্থা করে। সরোয়ার নারীক্যাম্পে এক হাজার জানবাজ সৈনিক নিয়ে অবস্থান নিয়েছে।

নারীক্যাম্পের অবস্থান ইসলামী সেনাক্যাম্প ও সরোয়ার-বাহিনীর মধ্যখানে। দু-দিকেই এতটুকু ফাঁকা আছে যে, মহিলাদের স্বাচ্ছন্দে হাঁটা-চলায় বেপর্দা হওয়ার কোনো আশঙ্কা নেই। ক্যাম্পের অদূরেই নদী। আরব মহিলারা মাঝে-মধ্যে নদীর কূলে গিয়ে বসে গল্প করছে, নদীতে গোসল ও কাপড় ধৌত করছে, মশক ভরে পানি এনে রান্না করছে।

এক রাতে সরোয়ার নিজতাঁবু থেকে বের হয়ে নারীক্যাম্পের দিকে রওনা হয়। এভাবে সে প্রায়শই যাওয়া-আসা করে। আজও মহিলাদের খবরাখবর নেওয়ার জন্য রওনা হয়। কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর সরোয়ার আরব নারীদের হাসাহাসি ও কথা বলার শব্দ শুনতে পায়। সে বুঝে ফেলে, মেয়েরা খেলছে। তাই একবার ভাবে, এখন ফিরে যাই, পরে আসব। কিন্তু পরক্ষণেই কী একটি আকর্ষণ তাকে সামনের দিকে টেনে নিয়ে যায়। সরোয়ার অগ্রসর হতে থাকে। আর শ-দেড়েক পা এগোলেই নারীক্যাম্প। সরোয়ার মেয়েদের হাসি ও কথার শব্দ স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে। আপন হবু স্ত্রী সালমার কণ্ঠও তার কানে আসে। সরোয়ার থমকে দাঁড়িয়ে যায়।

সময়টা চান্দ্র মাসের প্রথম দশক। সাত কি আট তারিখ। আকাশে চাঁদ ওঠেছে। সবুজ গাছ-গাছালির উপর আবছা জোৎস্নালোক ছড়িয়ে পড়েছে। ক্ষীণ চন্দ্রালোকে অনেক দূরের বস্তুও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। সরোয়ার দেখে, মেয়েগুলো হরিণীর মতো লাফালাফি করছে। সে একটি গাছের আড়ালে লুকিয়ে ভাবতে থাকে, মেয়েগুলো যখন ক্যাম্পে যাবে, তখন এখান থেকে বেরিয়ে তাঁবুতে চলে যাব। সরোয়ার গাছটির আড়ালে এমনভাবে দাঁড়ায় যে, পিঠটা তার মেয়েগুলোর দিকে, যেন তাদের দেখতে পাচ্ছে না। তবে কান পেতে তাদের কথাবার্তা শুনছে। সরোয়ার শুনতে পায়, সালমা বলছে– 'এই, আমি লুকোচ্ছি; তোমরা আমাকে খুঁজে বের করো।'

'ঠিক আছে লুকোয়'– অনেকগুলো মেয়ে একসঙ্গে বলে ওঠে।

পরক্ষণেই পলায়ন ও ছোটাছুটির শব্দ আসতে শুরু করে। খানিক পর এক মেয়ে সেই গাছটির নিকট এসে পড়ে; সরোয়ার যার আড়ালে লুকিয়ে আছে। সরোয়ারকে দেখেই মেয়েটি আঁৎকে ওঠে থমকে দাঁড়ায়। সরোয়ার একদৃষ্টে তার পানে তাকিয়ে থাকে– 'সালমা!'

ঃ কথা দাও, এরপর আর কখনও এভাবে চোরের ন্যায় আসবে না।

ঃ আসব না, দিলাম কথা।

সালমা খিলখিল করে হেসে ওঠে– 'এই হল তোমার বীরত্ব যে, একটি নারীর এক হুমকিতেই কুপোকাত হয়ে গেলে! দাবি তো কর বড় বীর পুরুষ!'

সরোয়ার বুঝে ফেলে সালমা তার সঙ্গে রসিকতা করেছে। বলল– 'সালমা! তুমি বড় ফাজিল হয়ে গেছ!'

ঃ আর তুমি খুব সাধু, না?

ঃ দুষ্টু কোথাকার!

সালমা ক্রুদ্ধচোখে সরোয়ারের প্রতি তাকায়– 'যাও, আমি দুষ্টুই।'

ঃ না, তুমি বুদ্ধিমতী, তুমি খু-উব ভালো।

সালমা তীক্ষ্ণচোখে সরোয়ারের প্রতি তাকায়– 'হ্যাঁ, আমি বুদ্ধিমতী, আমি ভালো।'

সরোয়ার বিনীতকণ্ঠে বলল– 'তুমি সরল।'

এমন সময় অন্য মেয়েদের পদশব্দ এগিয়ে আসে। সালমা বলল– 'এই, তাড়াতাড়ি এখান থেকে চলে যাও। বান্ধবীরা আমাকে খুঁজতে আসছে।'

সরোয়ার গাছের আড়ালে-আড়ালে কিছু পথ হেঁটে যায়। তারপর আরেকটি গাছের আড়ালে লুকোয়। মেয়েটি তাকে পুনরায় লুকোতে দেখেনি। ভেবেছে, সে চলে গেছে। ইতিমধ্যে মেয়েটিও স্থান ত্যাগ করার লক্ষ্যে একই গাছের নিকট চলে আসে। তার জানা নেই, সরোয়ার এই গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে। তার দৃষ্টি নারীক্যাম্পের প্রতি। এখন সে যে-স্থানে দন্ডায়মান, তারই সামান্য পিছনে সরোয়ার দাঁড়িয়ে। সরোয়ার তাকে দেখে ফেলেছে। কিন্তু সে সরোয়ারকে দেখেনি। হঠাৎ সে দ্রুতগতিতে পিছনের দিকে সরে যায়। এত দ্রুত যে, ধাক্কা ঠেকানোর জন্য সরোয়ার সুযোগই পায়নি। মেয়েটি সরোয়ারের সঙ্গে ধাক্কা খায়।

আরবকন্যা সালমা হঠাৎ চমকে ওঠে। খানিকটা ভয়ও পায়। ক্ষীণ, অথচ আতঙ্কিত কণ্ঠে 'এ্যা' বলে মোড় ঘুরিয়ে সরোয়ারের প্রতি তাকায় এবং প্রথম দৃষ্টিতেই লোকটিকে চিনে ফেলে মুচকি হেসে বলে ওঠে– 'তাওবা! তুমি আমাকে ভয় দেখাচ্ছ! যাওনি কেন? এখানে এসে আবার কোন মতলবে দাঁড়িয়ে আছ?'

সরোয়ার সালমার সুন্দর মুখশ্রীর পানে তাকিয়ে বলল– 'কিন্তু এতে আমার কেনো দোষ নেই; তুমিই এসে আমাকে ধাক্কা দিয়েছ। আমি তো আমারই স্থানে দাঁড়িয়ে আছি।'

সালমা সরোয়ারের প্রতি তীক্ষ্ণচোখে তাকিয়ে বলল– 'তা চোরের মতো এখানে এসে লুকিয়েছ কেন?'

ঃ আমি নারীক্যাম্পের দিকে যাচ্ছিলাম।

সালমা সহজ-সরল মেয়ের মতো বলল– 'ও আচ্ছা।'

ঃ আচ্ছা সালমা, আশপাশে অন্য কোনো মেয়ে নেই তো?

সালমা দু-চোখে দুষ্টুমির ভাব ফুটিয়ে সরোয়ারের প্রতি তাকিয়ে বলল– 'কেন জিজ্ঞেস করছ? কোনো দুষ্টুমির মতলব এঁটেছ না-কি?'

সরোয়ার গম্ভীরকণ্ঠে বলল– 'দুষ্টুমি-চঞ্চলতা এসব তোমাকেই ভালো মানায়। আমি তো ফিরে যাওয়ারই ভাবনায় ছিলাম। ওই তো, তোমার চোখেই তো দুষ্টুমিরা ছুটে বেড়াচ্ছে।'

সালমা মুখে ভাব ফুটিয়ে বলল– 'ফিরে যাওয়ার ভাবনাই যখন ছিল, তো এখানে দাঁড়িয়েছ কেন? আচ্ছা, আরও কতক্ষণ দাঁড়াও; আমি বান্ধবীদের ডেকে আনছি। ওরাই তোমার মনের খবর বের করবে।' বলেই সালমা হাঁক দেওয়ার জন্য মুখ হা করে।

সরোয়ার চট করে তার মুখে হাত রেখে বিনীতকণ্ঠে বলল– 'পাগলামি করো না সালমা! ওরা এদিকে এলে আমার-তোমার উভয়েরই বদনাম হবে।'

'আমার বদনাম হবে কেন? হলে তোমার হবে। না, আমি বান্ধবীদের ডাকছি।' বলেই মেয়েটি আবারও মুখ খোলে।

সরোয়ার চটজলদি পুনরায় তার মুখে হাত রেখে বলল– 'না, না সালমা, অমন করো না।'

সতেরো.

জর্জির যুদ্ধপ্রস্তুতির কাজে মহাব্যস্ত। মুসলমানরা অনতিবিলম্বে আফ্রিকা আক্রমণ করতে আসছে সে খবর তিনি পেয়ে গেছেন। তিনি চাচ্ছেন, মুসলমানদের আফ্রিকা আক্রমণ করার আগেই তিনি মিসরের উপর আঘাত হানবেন। জর্জিরের সকল অফিসার এবং নেতৃবর্গও বেজায় তৎপর। সর্বত্র যুদ্ধপ্রস্তুতি নিয়ে দৌড়ঝাঁপ চলছে। তারা ভাবছে, মুসলমানদের আফ্রিকা আক্রমণের আগে মিসর আক্রমণ করতে পারলে খ্রিস্টানজগতে তাদের সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়বে। জর্জির চাচ্ছেন, এমন বিশাল এক বাহিনী নিয়ে অভিযানে রওনা হবেন, যাদের সংবাদ শোনামাত্র মুসলমানদের পিলে চমকে যাবে। এ-পর্যন্ত তার সৈন্যের সংখ্যা এক লাখ ছাড়িয়ে গেছে। তিনি সৈন্যসংগ্রহের কাজে তৎপরতা চালাচ্ছেন।

ইতিমধ্যে জর্জির সংবাদ পান, মুসলমানরা যাবিলা দুর্গ অবরোধ করে ফেলেছে। শুনে তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন, যে-মুসলমানদের উপর তিনি আক্রমণ করার প্রস্তুতি গ্রহণ করছেন, নিজে এখনও আপন রাজধানীতে থাকতেই তারা মিসর থেকে বেরিয়ে এসে তার দেশের উপর আক্রমণ করে বসেছে! তিনি তৎপরতা আরও জোরদার করেন। তার সমবেত লক্ষাধিক সৈন্যের দুর্গে স্থান সংকুলান হচ্ছে না। তাই তিনি বাহিনীকে দুর্গের বাইরে বিস্তৃত মাঠে অবস্থান গ্রহণ করার আদেশ প্রদান করেন। সৈন্যরা মাঠে অবস্থান গ্রহণ করে।

একদিন তিনি সংবাদ পান, মুসলমানরা যাবিলা দখল করে নিয়েছে এবং এখন তারা তারাবলিসের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। তার ক্রোধ আরও বেড়ে যায়। ক্ষোভে তার মাথাটা গুলিয়ে যায়। কালবিলম্ব না-করে এই বাহিনী নিয়েই রওনা হবেন সে বুদ্ধিটাও মাথা থেকে উধাও হয়ে যায়।

জর্জির ঘোষণা করেছিলেন, এই যুদ্ধ খ্রিস্টানদেরকে ইসলাম থেকে রক্ষা করার যুদ্ধ। তাই সমগ্র আফ্রিকা বরং কনস্টান্টিনোপল পর্যন্ত এই যুদ্ধের দামামা ছড়িয়ে পড়েছে এবং আফ্রিকার প্রতিটি কোণ থেকে খ্রিস্টান যোদ্ধাদের দল আসতে শুরু করেছে। এরা দেশের বাছাইকৃত সেরা বীরযোদ্ধা। এই অনিয়মিত স্বেচ্ছাসেবী যোদ্ধাদের পেয়ে জর্জির অত্যন্ত আনন্দিত হন। বেতনভোগী পেশাদার যোদ্ধার তুলনায় এই স্বেচ্ছাসেবী ধর্মযোদ্ধারা জীবন বাজি রেখে যুদ্ধ করে সেই তথ্য জর্জিরের জানা আছে। সেইসঙ্গে গির্জার চার দেওয়াল ভেদ করে বেরিয়ে আসতে শুরু করেছেন পাদরিরাও। তারা আছেন যোদ্ধাদের উৎসাহিত ও উজ্জীবিত করতে।

আবার সংবাদ আসে, মুসলমানরা তারাবলিস অবরোধ করে ফেলেছে। জর্জির সার্বতিলার দুর্গ থেকে বেরিয়ে এসে বাহিনীর তদারকি করছিলেন। এই সংবাদের পর তিনি আর ঠিক থাকতে পারলেন না। ইত্যবসরে হঠাৎ দেখতে পান, তারাবলিসের দিক থেকে অতিশয় দ্রুতগতিতে এক অশ্বারোহী এগিয়ে আসছে। তার পার্শ্বে তার প্রধান সেনাপতি মারকুস এবং আরও কয়েকজন অফিসার দণ্ডায়মান। জর্জির অশ্বারোহীর প্রতি তাকিয়ে থেকে বললেন– 'মনে হচ্ছে, এই আরোহী তারাবলিস থেকে আসছে।'

সেনাপতি মারকুস বললেন– 'আর দুটির যে-কোনো একটি সংবাদ নিয়ে আসছে। হয়ত মুসলমানরা পরাজিত হয়ে পালিয়ে গেছে কিংবা তারাবলিসবাসীদের পতন ঘটেছে।'

ঃ তোমার ধারণাই সঠিক। দেখো, দেখো, লোকটি দুর্গের দিকেই মোড় ঘুরিয়েছে! একজন সৈনিক পাঠিয়ে তাকে এখানে নিয়ে আসো।

ঃ তা-ই করছি।

মারকুস এক অশ্বারোহী সেনাকে ইঙ্গিত করলে সে ছুটে গিয়ে আগন্তুক অশ্বারোহীকে নিয়ে আসে। আগন্তুক এসে ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে মাথা ঝুঁকিয়ে সম্রাট জর্জিরকে কুর্নিশ করে। জর্জির জিজ্ঞাসা করেন– 'তুমি কোথা থেকে এসেছ? মুসলমানরা কি তারাবলিস পর্যন্ত এসে পড়েছে?'

ঃ তারা অত্যন্ত বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করেছে। আমরাও জীবন বাজি রেখে যুদ্ধ করেছি।...

জর্জির খুশি হন। তার চেহারায় আনন্দের দ্যোতি খেলে ওঠে। তিনি ধরে নেন, তারাবলিসবাসী যখন বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করেছে, তা হলে তো তারা মুসলমানদের পরাজিত করে হটিয়েই দিয়েছে। তিনি আগন্তুককে থামিয়ে দিয়ে বললেন– 'তার মানে তারাবলিসবাসী মুসলমানদের পরাজিত করেছে?'

ঃ না, আমরা যুদ্ধ করেছি, জীবনবাজি লড়াই করেছি। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত পরাজয় আমরাই বরণ করেছি। টিকতে না-পেরে আমাদেরকে দুর্গে ঢুকে আশ্রয় নিতে হয়েছে। তারাবলিসের দুর্গ এখন মুসলমানদের দ্বারা অবরুদ্ধ।

ঃ মুসলিম সৈন্যের সংখ্যা কত ছিল?

ঃ সঠিক পরিসংখ্যান জানা সম্ভব হয়নি। তবে ত্রিশ হাজারের কম হবে না।

ঃ মাত্র ত্রিশ হাজার?

ঃ জি।

ঃ আর হারকুসের সঙ্গে কত সৈন্য ছিল?

ঃ দুর্গে প্রায় পঞ্চাশ হাজার সৈন্য ছিল। মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে বের হয়েছিল ত্রিশ হাজার।

ঃ হারকুস বোকামি করেছে। ত্রিশ হাজার মুসলমানের মোকাবেলায় মাত্র ত্রিশ হাজার সৈন্য নেয়া ভুল হয়েছে। আরো সৈন্য নেয়ার প্রয়োজন ছিল।

ঃ মুসলমানদের প্রথম ইউনিটটি যখন আত্মপ্রকাশ করে, তখন তারা তিন হাজারের বেশি ছিল না। হারকুস ভেবেছিলেন, শেষ পর্যন্ত মুসলমানদের সংখ্যা দশ হাজারের বেশি হবে না। তাই তিনি ত্রিশ হাজার তথা মুসলমানদের তিনগুণ সৈন্য নিয়ে আক্রমণ করেন। কিন্তু মুসলমানরা একের-পর-এক ইউনিট আসতে থাকে এবং যুদ্ধে অংশ নিতে থাকে।

ঃ কিন্তু যখন দেখল মুসলমানদের সংখ্যা বেড়ে গেছে, তখন দুর্গ থেকে বাকি সৈন্যদের ডেকে পাঠাল না কেন?

ঃ সেই সুযোগ পাওয়া যায়নি মহারাজ!

ঃ ব্যাপার তা নয়। বরং হারকুসকে আমি যতটা বিচক্ষণ ভেবেছিলাম, সে তত বিচক্ষণ নয়।

ঃ আচ্ছা, এখন তারা সকলে দুর্গে আশ্রয় নিয়েছে?

ঃ জি। মুসলমানরা এমন শক্ত অবরোধ করে রেখেছে যে, কারও পক্ষে দুর্গ থেকে বের হওয়া সম্ভব হচ্ছে না।

ঃ তা তুমি আসলে কীভাবে?

ঃ পয়ঃনিষ্কাষণের নালা দিয়ে বেরিয়ে এসেছি।

ঃ আর হারকুস সম্ভবত তোমাকে সাহায্যের আবেদন নিয়ে প্রেরণ করেছে।

ঃ জি আলমপনা, অনতিবিলম্বে সাহায্য না-পাঠালে আশঙ্কা আছে, হতভাগা মুসলমানরা দুর্গও জয় করে নেবে।

ঃ আমি বেশ করে জানি, তারাবলিসের দুর্গ অত্যন্ত শক্ত ও দুর্ভেদ্য; তাকে পদানত করা সহজ নয়। তথাপি আমি আর কালবিলম্ব করব না। আগামী কালই বাহিনী রওনা করাব। তারাবলিস পৌঁছে আমরা মুসলমানদের পরাজিত করে তাড়িয়ে দেব।

এমন সময়ে প্রধান পাদরি থেভঢোসও এসে পৌঁছান। তাকে দেখামাত্র সকল অফিসার, সেনাপতি ও স্বয়ং জর্জির তার সম্মুখে অবনত হয়ে যায়। থেভঢোসের হাতে একটি মুক্তাখচিত কালো ক্রুশ। তিনি ক্রুশটা ডান হাতে নিয়ে ঊর্ধ্বে তুলে ধরেন।

জর্জির এগিয়ে গিয়ে ক্রুশটিতে চুমো খান। থেভঢোস জিজ্ঞেস করেন– 'আপনি কি কালই বাহিনী রওনা করাবার সিদ্ধান্ত স্থির করেছেন?

ঃ জি। বাহিনী কালই রওনা হবে।

ঃ আমি ধ্যানে বসেছিলাম। জানতে চেয়েছিলাম, বাহিনীকে কবে রওনা করানো ভালো হবে।

ঃ তা কী জানতে পারলেন?

ঃ এ-সপ্তাহে এমন কোনো শুভদিন নেই, যেদিন বাহিনী রওনা হতে পারে। আজ শনিবার। কাল রবিবার। আগামী রবিবার উপাসনার পর বাহিনী রওনা হলে জয় নিশ্চিত।

জর্জির খুশি হয়ে যান। বললেন– 'ঠিক আছে, আগামী রবিবারই রওনা হবে।'

পার্শ্ব থেকে তারাবলিসের দূত বলল– 'কিন্তু হুজুর, এ-সময়ের মধ্যে মুসলমানরা তারাবলিস জয় করে নেয়ার আশঙ্কা রয়েছে।'

জর্জির তিরস্কারের সুরে বললেন– 'করবেই তো। তারাবলিসবাসী যদি

কাপুরুষ না হত, তা হলে তারা মুসলমানদের হাতে পরাজিত হয়ে দুর্গে আশ্রয় নিত না। তুমি নিশ্চিন্ত থাকো; মুসলমানরা তারাবলিস জয় করতে পারবে না।'

থেভডোস বললেন– 'আমি তো রাতে অবহিত হয়েছি, মুসলমানরা তারাবলিসেই পরাভূত হবে।'

জর্জির জিজ্ঞেস করেন– 'কোনো অলী-বুযুর্গ কি আপনাকে এ-কথা বলেছেন?'

ঃ অলী-বুযুর্গ নয়– স্বয়ং যিশুখ্রিস্ট বলেছেন।

ঃ যিশু বোধ হয় স্বপ্নে আপনার নিকট এসেছিলেন?

ঃ এসব আমার গোপন রহস্য, যা বলা সমীচীন নয়। কিন্তু এটি বিশেষ একটি সময়। তা আমি কোনো কিছুই লুকোব না। রাতে স্বপ্নে যিশু আমার নিকট এসেছিলেন। তিনি বললেন– 'থেভডোস, তুমি অহেতুক চিন্তা করছ। আমার পিতা বলেছেন, মুসলমানরা তারাবলিসেই পরাজয়বরণ করবে। তুমি রাজাকে বলে দাও, এ-সপ্তাহটা বাহিনী প্রেরণের জন্য শুভ নয়। আগামী রবিবার উপাসনার পর রওনা হোক।'

থেভডোস দুনিয়াবিমুখতা ও ধার্মিকতায় বিখ্যাত এক ব্যক্তি। তার মুখনিসৃত বক্তব্যকে পাথরের অঙ্কন মনে করা হত। এখন তিনি যে-স্বপ্নের উল্লেখ করলেন, তা শুনে উপস্থিত সকলে অত্যন্ত আনন্দিত হয়। তারা সমস্বরে বলে ওঠে– 'খোদা ও খোদার পুত্রের জয় হোক।'

থেভডোস বললেন– 'আমি নিশ্চিত, আফ্রিকার অধিবাসীরা হিংস্র মুসলমানদেরকে পরাজিত করে খ্রিস্টবাদের জন্য ইসলামের শঙ্কা দূর করে ফেলবে এবং যিশুখ্রিস্টের পবিত্র জন্মভূমি জেরুজালেমকে ওই অধার্মিকদের দখল থেকে মুক্ত করবে। আমাদের সম্রাট জর্জিরের জন্য সেই সময়টি কতই-না আনন্দের হবে। তখন বিশ্বময় তাঁর সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়বে এবং তিনি 'মহান বিজেতা' আখ্যায়িত হবেন। তখন পৃথিবীর সকল চার্চ ও গির্জায় তার দীর্ঘায়ু ও সমৃদ্ধির প্রার্থনা করা হবে। মানুষ পঞ্চমুখে তার প্রশংসা করবে। স্বয়ং জর্জিরের সামনেও এমন চিত্র ভেসে ওঠে। তিনি কল্পনার জগতে নিজেকে বিজয়ী সম্রাট হিসেবে দেখতে পান। বললেন– 'খোদার ইচ্ছায় আমি অবশ্যই জয়ী হব।'

থেভডোস বললেন– 'নিশ্চিত থাকুন, আপনিই জয়ী হবেন। আপনার খ্যাতি-মর্যাদা সুপ্রতিষ্ঠিত হবে। তাবৎ বিশ্বের সকল খ্রিস্টান আপনাকে শ্রদ্ধা করবে।'

হাস্যোজ্জ্বল জর্জির তারাবলিসের দূতের প্রতি মুখ ফিরিয়ে বললেন– 'তুমি ফিরে যাও। তারাবলিসবাসীকে বোলো, সাহায্য আসছে; তোমরা ভয় পেয়ো না।'

দূত পুনরায় অবনত হয়ে সম্রাটকে কুর্নিশ করে। তারপর মাথা তুলে উঠে ঘোড়ায় চড়ে তারাবলিস অভিমুখে রওনা হয়ে যায়।

সম্রাট জর্জির, প্রধান পাদরি থেভঢোস ও প্রধান সেনাপতি মারকুস সাবতিলার দুর্গে প্রবেশ করেন।

আঠারো.

মুসলমানরা তারাবলিস অবরোধ করে আছে। তাদের দৃঢ় বিশ্বাস, এই কঠোর অবরোধ অতিক্রম করে না-কেউ দুর্গ থেকে বের হতে পারবে, না-কেউ ভেতরে প্রবেশ করতে সক্ষম হবে। অথচ, ইতিমধ্যে তারাবলিসবাসীদের একজন দূত দুর্গ থেকে বের হয়ে সাবতিলার উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেছে।

মুসলমানরা রাতদিন সমানে দৃষ্টি রাখছে, যেন দুর্গ থেকে কেউ বেরুতে না পারে। এভাবে কয়েকদিন কেটে গেছে। এ-যাবৎ খ্রিস্টানরা না মুসলমানদের নিকট কোনো দূত প্রেরণ করেছে, না দুর্গ থেকে বের হয়েছে। আব্দুল্লাহ ইবনে সা'দ ভাবলেন, তদন্ত করে দেখা দরকার ব্যাটারটা আসলে কী?

তদন্তের জন্য তিনি এক ব্যক্তিকে দূত বানিয়ে প্রেরণ করেন। দূত দুর্গের ফটকের সম্মুখে গিয়ে দাঁড়ায় এবং সাধ্যপরিমাণ উচ্চকণ্ঠে হাঁক দেয়– 'খ্রিস্টানগণ! আমি দূত, তোমাদের সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

সঙ্গে-সঙ্গে হারকুসকে সংবাদটা জানানো হল। তিনি বুরুজে এসে দাঁড়ান। বললেন– 'বলো, তোমার বক্তব্য কী?'

ঃ আমাকে ইসলামী বাহিনীর সেনাপতি আপনার নিকট প্রেরণ করেছেন। তিনি সন্ধির প্রস্তাব দিয়েছেন।

ঃ তোমাদের সেনাপতি ও তার বাহিনী বোধহয় অবরোধে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে।

ঃ আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, মুসলমান এতটুকুতেই ক্লান্ত হয় না। এ-অবস্থায় যদি দু-বছরও কেটে যায়, তবুও আমাদের মনোবল এতটুকু হীন হবে না।

ঃ দু-বছর নয়– একশ বছর অবরোধ করে রেখেও তোমরা এই দুর্গ জয় করতে পারবে না।

ঃ আপনাদের এই দুর্গ দামেশ্‌ক, হাল্‌ব, এন্‌কাতিয়ার দুর্গ থেকে বেশি মজবুত নয়। আমরা উল্লেখিত দুর্গসমূহ জয় করেছি। ইনশাআল্লাহ এটিও জয় করব।

ঃ এই দুর্ভাবনায় অযথা সময় নষ্ট করো না। আচ্ছা বলো, তোমাদের সেনাপতি সন্ধির জন্য কী শর্ত আরোপ করেছেন?

ঃ প্রথম প্রস্তাব হচ্ছে, তোমরা সকলে মুসলমান হয়ে যাও, তা হলে তোমরা আমাদের ও পৃথিবীর সমস্ত মুসলমানদের ভাই হয়ে যাবে, ইসলামী সরকার ও রাষ্ট্রে অংশীদারত্ব পাবে এবং যথারীতি দুর্গে বহাল থাকতে পারবে। কেউ তোমাদের দিকে চোখ তুলে তাকাবার সাহস পাবে না।

প্রস্তাবটি হারকুসের নিকট অপ্রীতিকর ঠেকে। তিনি চিৎকার করে বলে ওঠেন– 'না, কোনো খ্রিস্টান কোনোদিন এ-প্রস্তাবে সম্মত হতে পারে না।'

হারকুস বুরুজে দণ্ডায়মান আর মুসলিম দূত নিচে। উভয়ই উচ্চৈঃস্বরে কথা বলছে। দূত বলল– 'তা হলে তোমরা জিযিয়া প্রদানে সম্মত হও। আমরা তোমাদের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তার যিম্মাদার হয়ে যাব। তখন আমরা তোমাদেরকে তোমাদের শত্রুর কবল থেকেও সুরক্ষা করব।'

এই প্রস্তাবও হারকুসের অপছন্দ হল। বললেন– 'জিযিয়া প্রদানের অর্থ হচ্ছে, আমরা তোমাদের দাসত্ব মেনে নেব। একটি আত্মমর্যাদাসম্পন্ন জাতি এমনটি মেনে নিতে পারে না। জিযিয়া প্রদান অপেক্ষা আমরা মৃত্যুকে শ্রেয় মনে করি।'

ঃ আমাদের আর কোনো প্রস্তাব নেই। আপনাকে দুদিন সময় দিলাম। এই সময়ের মধ্যে ভেবে সিদ্ধান্ত নিন দুটির কোনটি বরণ করবেন। গভীরভাবে চিন্তা করুন।

ঃ দুদিন নয়– দু-বছর পরও আমি এ-উত্তরই দেব।

ঃ তার মানে আপনি ভেবেচিন্তে উত্তর দিতে প্রস্তুন নন?

ঃ বিলকুল না। আমার উত্তর স্পষ্ট।

ঃ তা হলে এবার আপনার ভাগ্যের ফয়সালা শুনে নিন।

ঃ শোনাও।

ঃ আমাদের সেনাপতি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন, আপনারা যদি এই দুটি প্রস্তাবের একটিও গ্রহণ না করেন, তা হলে দুর্গ আক্রমণ করা হবে এবং তাকে পদানত করে সকল খ্রিস্টান নারী-পুরুষকে দাস-দাসী বানানো হবে।

ঃ এই হুমকি কাপুরুষদের দাও। যদি আক্রমণ করো, তা হলে পরাজিত হয়ে লেজ গুটিয়ে পালাতে বাধ্য হবে।

ঃ দেখুন, যুদ্ধ শুরু করার আগে সন্ধির প্রস্তাব দেয়া আমাদের যুদ্ধরীতির একটি অংশ। সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে আসাকে দুর্বলতা ভাবলে ভুল করবেন। এখন মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত হোন।

দূত ফিরে আসে। হারকুস ফিরে গিয়ে তার মন্ত্রী ও অফিসারদের বিষয়টি অবহিত করে বললেন– 'এতদিন মনে করতাম, মুসলমানরা আপাতত দুর্গ

আক্রমণ করবে না, ততদিনে সাবতিলা থেকে সাহায্য এসে পড়বে। কিন্তু আজ একজন দূত আসল। তার বক্তব্যে জানতে পারলাম, মুসলমানরা শীঘ্রই আক্রমণ করছে। আমি যতটুকু জানি, ওই হতভাগারা যখন কোনো নগরী কিংবা দুর্গ আক্রমণ করে, তাকে জয় না-করে ক্ষান্ত হয় না। আফসোস, সাবতিলা থেকে এখনও কোনো সাহায্য এল না!'

সেনাপতি বললেন– 'আমাদের সাধারণ সৈন্যরাও মুসলমানদের বীরত্ব সম্পর্কে অবহিত। তারা আক্রমণ করলে সৈন্যরা অস্ত্র ফেলে পালায় কি-না সে ভয়-ই করছি।'

ঃ আমারও ভয় লাগছে।

সেনাপতি বললেন–, 'আবারও একজন দূত প্রেরণ করুন। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব গিয়ে সম্রাটকে বলুক, আপনি যদি সাহায্য প্রেরণ বিলম্ব করেন, তা হলে আশঙ্কা দেখা দিয়েছে, দুর্গ হাতছাড়া হয়ে যাবে।'

ঃ আমিও তা-ই ভেবেছি। আমি আজ রাতই দূত প্রেরণ করছি। তোমরা পাঁচিলের উপর গিয়ে সৈন্যদের সবদিকে অধিক পরিমাণ ছড়িয়ে দাও। আর সবাইকে দিনরাত সতর্ক থাকার পরামর্শ দাও।

সেনাপতি বললেন– 'তা-ই হবে।'

সেনাপতি চলে যান। হারকুস এক চৌকস যুবককে ডেকে বললেন– 'তুমি সম্রাট জর্জিরের নিকট আমার পত্র নিয়ে যাও। মুখেও বোলো, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব যেন সাহায্য প্রেরণ করেন। সম্ভব হলে এবং সমীচীন মনে করলে নিজেও যেন চলে আসেন। তোমাকে রাতে পয়ঃপ্রনালির পথে দুর্গ থেকে বের হতে হবে। যাও, এক্ষুনি প্রস্তুত হও।'

'জি, ঠিক আছে' বলে যুবক চলে যায়। হারকুস তৎক্ষণাৎ পত্র ও কিছু নগদ অর্থ যুবকের নিকট পাঠিয়ে দেন।

এদিকে আরব দূত সেনাপতি আব্দুল্লাহ ইবনে সা'দের নিকট ফিরে এসে বলল– 'তারাবলিসের অধিপতির নিকট আপনার বার্তা পৌছিয়ে দিয়েছি। তিনি আপনার উভয় প্রস্তাবই প্রত্যাখ্যান করেছেন।'

আব্দুল্লাহ ইবনে সা'দ বললেন– 'আমি আগে থেকেই জানতাম, তিনি এরূপ উত্তরই দেবেন। দুর্গটা শক্ত হওয়ার কারণে তারাবলিসবাসীদের দম্ভ আছে। তা ছাড়া মনে হয় তারা বাইরে থেকে সাহায্যেরও আশাবাদী। যা হোক, আমরা আমাদের নিয়ম পালন করেছি। এখন আমি একটি মুহূর্তও নষ্ট করব না। আজ রাতেই খুঁজে দেখব কোনো দিক থেকে দুর্গে প্রবেশ করার কোনো পথ পাই কি-না।'

সেইসঙ্গে আব্দুল্লাহ ইবনে সা'দ নির্দেশ জারি করেন, দুর্গের অবরোধ আরও কঠোর করে তোলো। রাতদিন সর্বক্ষণ দুর্গকে চোখে-চোখে রাখো। কাউকে দুর্গ থেকে বের হতে এবং দুর্গে প্রবেশ করতে দিয়ো না।

বাহিনীর কমান্ডারগণ বুঝে ফেলে, সেনাপতি অতিসত্বর দুর্গ আক্রমণ করতে যাচ্ছেন।

এখন রাত। ঈশার জামাত হয়ে গেছে। আব্দুল্লাহ ইবনে সা'দ দশ ব্যক্তিকে সঙ্গে নিয়ে নীরবে ও সাবধানে দুর্গের দিকে এগিয়ে যান। দশজনের একজন সরোয়ার। অবশিষ্ট নয়জন আরবের বিখ্যাত বীর সৈনিক। আকাশে চাঁদ আছে। তবে পরিবেশ ততটা ফকফকা নয়। আবছা অন্ধকার বিরাজ করছে। দুর্গবাসীরা এই জানবাজ মুজাহিদদের দেখতে পায়নি। তারা পা টিপে-টিপে দুর্গের পাঁচিলের নিকট পৌঁছে যায়। আব্দুল্লাহ ইবনে সা'দ পাঁচিলের চারদিকে চক্কর দিতে শুরু করেন। দেওয়ালগুলো পর্যবেক্ষণ করলেন। অত্যন্ত শক্ত ও উঁচু দেওয়াল, যা ভাঙা কিংবা বেয়ে উপরে আরোহণ করা দুষ্কর। আব্দুল্লাহ ইবনে সা'দ দুর্গের চারদিকটা একবার ঘুরে ভিতরে প্রবেশের কোনো পথ না-পেয়ে বললেন– 'মুসলমানগণ, এবার বসে দেখো এমন কোনো নালা পাও কি-না, যদ্দ্বারা ভেতরে প্রবেশ করা যেতে পারে।'

সরোয়ার বলল– 'নিশ্চয়ই আছে। দুর্গের ভেতরের পানি কোনো-না-কোনো উপায়ে বাইরে নিষ্কাষিত হয়ে থাকবে।'

সবাই ঝুঁকে দেখতে-দেখতে এগিয়ে চলে। কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর তারা সেই নালাটি দেখতে পায়, যে-পথে খ্রিস্টানরদের দূত দুর্গ থেকে বের হয়ে জর্জিরের নিকট গিয়েছিল।'

নালাটা ভালোভাবে নিরীক্ষা করে আব্দুল্লাহ ইবনে সা'দ নিশ্চিত হন, এই পথ অতিক্রম করে ভিতরে প্রবেশ করা সম্ভব। তিনি বললেন– 'মুসলমানগণ, আল্লাহর শোকর আদায় করো যে, আমরা পথ পেয়ে গেছি। এই নালাপথে আমি দুইশত ব্যক্তিকে দুর্গে প্রবেশ করাতে চাই!'

সরোয়ার বলল– 'কিন্তু সেনাপতি, যদি নালাটা ভেতর থেকে লোহার জাল কিংবা অন্য কিছুতে বন্ধ থাকে, তা হলে?'

সেনাপতি বললেন– 'তা থাকবে আমি জানি। কিন্তু সেটি অবশ্যই অনেক পুরনো এবং জংধরা হবে। তাই টান দিয়ে উপড়ে ফেলা কঠিন হবে না। সরোয়ার, তুমি যাও; দুইশত যোদ্ধাকে চুপিচুপি নিয়ে আসো।'

সরোয়ার 'জি আচ্ছা' বলে চলে যায়।

এই নালাটা সারাক্ষণ প্রবাহমান থাকে। এর মধ্য দিয়ে দুর্গের ময়লা-আবর্জনা ও ব্যবহৃত পানি নিষ্কাষিত হয়ে নদীতে গিয়ে পড়ে। আব্দুল্লাহ ইবনে সা'দ সঙ্গীদের নিয়ে নালার কাছে চুপচাপ বসে আছেন। তিনি একজন-একজন করে ভিতরে প্রবেশ করানোর প্রস্তুতি নিচ্ছেন। এমন সময় নালার মুখের ভিতরে কিসের যেন একটা শব্দ হল। আব্দুল্লাহ ইবনে সা'দ তাড়াতাড়ি তাঁর লোকদেরকে পিছনে সরে যেতে ইঙ্গিত করেন। সবাই পিছনে সরে যায়। শুধু তিনি নিজে নালার মুখে দাঁড়িয়ে বিষয়টি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করতে থাকেন।

হঠাৎ নালার মুখ দিয়ে একটি মাথা বেরিয়ে আসে। তারপর আস্ত একটি মানুষ বের হয়ে দাঁড়িয়ে যায়। লোকটি পুরোপুরি বের হওয়ামাত্র আব্দুল্লাহ ইবনে সা'দ তার ঘাড় ঝাপটে ধরেন। লোকটি সীমাহীন ভয়ে কাঁপতে শুরু করে। আব্দুল্লাহ ইবনে সা'দ অনুচ্চকণ্ঠে বললেন– 'নীরব থাকায় তোমারই মঙ্গল। উচ্চকণ্ঠে কথা বললে গলা টিপে মেরে ফেলব।'

লোকটি সেই দূত, যে হারকুসের পত্র নিয়ে জর্জিরের নিকট যাচ্ছিল। সে থরথর করে কাঁপছে। কম্পিতকণ্ঠে ফ্যাঁসফেঁসে গলায় বলল– 'নিশ্চিত থাকুন; আমি শব্দ করব না। আপনি আমার ঘাড় ছেড়ে দিন। আমার খুব কষ্ট হচ্ছে।'

আব্দুল্লাহ ইবনে সা'দ তার ঘাড় ছেড়ে দিয়ে বললেন– 'এ-সময়ে তুমি এভাবে বের হলে কেন?'

ঃ গোয়েন্দাগিরি করার জন্য।

ঃ এই নালার অপর মাথায় কোনো জালি-টালি আছে না-কি?

ঃ আপনি আমাকে ও আমার গোটা পরিবারকে নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দিন; আমি আপনার সকল প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দেব।

ঃ ঠিক আছে, আমি তোমার ও তোমার পরিবারের সকলের নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দিলাম।

ঃ তা হলে শুনুন, এই নালার অপর প্রান্তে কোনো জালি নেই।

ঃ যেখান থেকে নালার শুরু, সেখানে কোনো প্রহরা আছে?

ঃ না। ফটকের কোলঘেঁষে একটি সুনসান গলি আছে। আপনি কোনো সমস্যা ছাড়াই নালাপথে দুর্গে প্রবেশ করতে পারেন। সেখান থেকে খানিক বাঁ দিকে গেলে একটি রাস্তা পাবেন। রাস্তাটি অনেকখানি পথ ঘুরে আবার ফটকের সঙ্গে এসে মিলিত হয়েছে।

ইতিমধ্যে সরোয়ার দুশ জানবাজ নিয়ে ফিরে আসে।

আবদুল্লাহ ইবনে সা'দ দু-ব্যক্তিকে আদেশ করেন, তোমরা ধৃত লোকটির মুখ বেঁধে সামনে বসিয়ে পাহারা দাও। তিনি নিজে নালায় ঢুকে পড়েন। তার পিছনে সরোয়ার প্রবেশ করে। তার পর একজন-একজন করে সব কজন ঢুকে পড়ে। ধৃত খ্রিস্টান লোকটি লাল-লাল চোখে তাদের প্রতি তাকিয়ে থাকে।

উনিশ.

সকলের আগে সেনাপতি আব্দুল্লাহ ইবনে সা'দ নালা থেকে বের হয়ে দুর্গে প্রবেশ করেন। তারপর বের হয় সরোয়ার। তারপর এক-এক করে অবশিষ্ট সব কজন মুজাহিদ নালা থেকে বেরিয়ে দুর্গে ঢুকে পড়ে। এখন সামনে একটি সরু গলিপথ।

আব্দুল্লাহ ইবনে সা'দ এক মুজাহিদকে বললেন– 'তুমি এই নালাপথে ফিরে যাও। ওদিককার সকল মুজাহিদকে অস্ত্রসজ্জিত হয়ে ফটকের ঠিক সামনে এসে দাঁড়াতে বলে বোলো, যখন তারা ভিতর থেকে তাকবীরধ্বনি শুনবে, যেন সঙ্গে-সঙ্গে দুর্গে ঢুকে পড়ে।'

মুজাহিদ পুনরায় নালায় ঢুকে পড়ে। আব্দুল্লাহ ইবনে সা'দ ক্ষুদ্র বাহিনীটিকে নিয়ে সরু গলিপথে এগোতে শুরু করেন। বাঁ দিকে মোড় ঘুরিয়ে কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর এখন একটি প্রশস্ত রাস্তা। আব্দুল্লাহ ইবনে সা'দ তাতে উঠে অগ্রসর হতে থাকেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই তিনি ফটকের নিকট পৌঁছে যান।

আব্দুল্লাহ ইবনে সা'দ সঙ্গীদের বললেন– 'যে-লোকটিকে ক্যাম্পো প্রেরণ করেছি, তার গিয়ে পৌঁছা পর্যন্ত অপেক্ষা করো এবং চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকো। একটা কাশিও কেউ দিও না।'

সকলে নীরব দাঁড়িয়ে থাকে। তাদের চোখের সামনে ফটকের প্রহরীরা নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে।

এখন মধ্যরাত। সবদিকে সুনসান নীরবতা বিরাজ করছে। দুর্গের কুকুরগুলো পর্যন্ত কোনো শব্দসাড়া করছে না।

এতক্ষণে ফেরত-যাওয়া মুজাহিদ ক্যাম্পে পৌঁছে গেছে। আব্দুল্লাহ ইবনে সা'দ বললেন– 'বীর মুজাহিদগণ, এখনই উপযুক্ত সময়। তোমরা আল্লাহর নাম নিয়ে সম্মুখে অগ্রসর হও।'

সকলে সতর্কতার সঙ্গে ফটকের দিকে এগোতে শুরু করে। রক্ষীরা এখনও ঘুমোচ্ছে। তাদের মনে কোনো চিন্তা বা শঙ্কা নেই। মুজাহিদগণ বিনা বাঁধায়

দুর্গের আলিশান ফটকের দরজার পৌঁছে যায়। কিন্তু তাদের ফটকের সম্মুখে পৌঁছামাত্র প্রহরীদের চোখ খুলে যায়। তারা হন্তদন্ত হয়ে উঠে মুজাহিদদের দেখে বিস্মিত হয়ে পড়ে। পরক্ষণেই ভয়ে কাঁপতে শুরু করে।

মুসলমানগণ তরবারি উঁচু করে তাদের নির্বিচারে হত্যা করতে শুরু করে। প্রহরীরা চিৎকার করে বলতে আরম্ভ করে– 'মুসলমান এসে পড়েছে!'

পাঁচিলের উপরে যেসব সৈনিক পাহারা দিচ্ছিল, ফটকের প্রহরীদের চিৎকারে তারা দ্রুত নিচে নেমে আসে। ঘটনাক্রমে দুর্গপতি হারকুসও টহল দিচ্ছিলেন। তিনিও পালিয়ে নিচে নেমে আসেন। অল্পক্ষণের মধ্যে প্রায় তিন হাজার সৈনিক ফটকে এসে সমবেত হয়।

খ্রিস্টানসেনারা এসেই দেখতে পায়, মুসলমানরা ফটক দখল করে নিয়েছে। কিন্তু মুসলমানরা দুর্গে ঢুকল কী করে? খ্রিস্টানরা ভেবে বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে যায়। হারকুস উচ্চকণ্ঠে বললেন– 'বীর খ্রিস্টানগণ, এরা স্বল্প কজন মুসলমান মাত্র, এদের হত্যা করে ফেলো।'

কিন্তু খ্রিস্টানদের বিস্ময় কাটছে না। মুসলমানদেরকে দুর্গের ভিতরে দেখে তাদের মনে ভয় ধরে গেছে। তারা ধরে নিয়েছে, মুসলমানরা জিন ছাড়া অন্য কিছু নয়। নিশ্চয়ই তারা উপর দিয়ে উড়ে ভিতরে প্রবেশ করেছে। মানুষ হলে দুর্গে ঢুকল কী করে। তাই খ্রিস্টানসেনারা মুসলমানদের প্রতি অগ্রসর হতে ভয় পাচ্ছে।

হারকুস পুনরায় উচ্চকণ্ঠে হাঁক দেন– 'কাপুরুষগণ, দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে কী দেখছ? সামনে অগ্রসর হও; সব কটা মুসলমানকে মেরে ফেলো।'

অগত্যা খ্রিস্টানসেনারা তরবারি উঁচু করে অগ্রসর হতে শুরু করে। কিন্তু, এতক্ষণে মুসলমানরা ফটক খুলে ফেলেছে। খ্রিস্টানদেরকে আক্রমণোদ্যত দেখে উলটো আল্লাহু আকবার ধ্বনি তুলে তারাই আক্রমণ করে বসে এবং ছুটে-ছুটে খ্রিস্টানদের হত্যা করতে থাকে।

মুসলমানদের আক্রমণের সংহারীমূর্তি দেখে খ্রিস্টানদের মনে উদ্দীপনা জেগে ওঠে। তারাও পালটা জোরদার আক্রমণ করে। হারকুস কয়েকজন লোক প্রেরণ করে আরও সৈন্য তলব করেন। মুসলমানগণ ফটক থেকে বের হয়ে সড়কের উপর সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে যায়। লড়াই চলতে থাকে। মুসলমান সৈন্য মাত্র দুইশত, খ্রিস্টান তিন হাজার। তবু খ্রিস্টানরা মুসলমানদের ভয়ে ভীত হয়ে পড়েছে। তারা অতিশয় সাবধানতা অবলম্বন করে আক্রমণ করছে। মুসলমানগণ আক্রমণ চালাচ্ছে পূর্ণ জোশ ও উদ্দীপনার সঙ্গে। তাদের ধারালো তরবারি খ্রিস্টানদের নির্বিচারে হত্যা করে চলেছে। ইতিমধ্যে তারা

বহুসংখ্যক খ্রিস্টানকে মৃত্যুর কোলে পৌছিয়ে দিয়েছে। খ্রিস্টানরাও উদ্দীপনার সঙ্গে আক্রমণ করছে। যুদ্ধ ঘোরতর রূপ লাভ করেছে। খ্রিস্টানরা চিৎকার করছে। তাদের চিৎকারধ্বনি শুনে দুর্গবাসীরা ভীত হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে রাস্তায় নেমে আসছে এবং ডাক-চিৎকারের কারণ জানার চেষ্টা করছে।

হারকুসের আদেশ পাওয়ামাত্র খ্রিস্টানসেনারা পাঁচিল থেকে নেমে ফটকের দিকে ছুটতে শুরু করেছে। বিপুলসংখ্যক নতুন খ্রিস্টানসেনা এসে যোগ দিয়েছে।

মুসলমানদের সংখ্যা যৎসামান্য। এখন তারা অগ্রসর হয়ে যুদ্ধ করতে পারছে না। তারা সাহায্য এসে পৌছার অপেক্ষা করছে। তবে আব্দুল্লাহ ইবনে সা'দ ও সরোয়ার অগ্রসর হয়ে-হয়ে খ্রিস্টানদের হত্যা করছে। দীর্ঘসময় যুদ্ধ চলার পর আব্দুল্লাহ ইবনে সা'দ পুনরায় উচ্চকণ্ঠে তাকবীর ধ্বনি তোলেন। জবাবে সকল মুসলিম সৈন্য আল্লাহু আকবার ধ্বনি দিয়ে ওঠে। সাবতিলার দুর্গ আরেকবার আল্লাহু আকবার ধ্বনিতে কেঁপে ওঠে। এই ধ্বনির সঙ্গে দুর্গের বাইরে থেকেও অনুরূপ তাকবীরধ্বনি ভেসে আসে। মুসলিম সেনারা দুর্গে ঢুকতে শুরু করে। আব্দুল্লাহ ইবনে সা'দ, সরোয়ার ও তাদের অন্যান্য সঙ্গীরা পূর্ণোদ্যমে আক্রমণ করে। তারা আক্রমণ করে-করে খ্রিস্টানদের পিছনে অনেক দূর পর্যন্ত হটিয়ে দেয়। সরোয়ার এক অশ্বারোহী খ্রিস্টানসেনাকে হত্যা করে তার ঘোড়াটা নিয়ে দ্রুত তাতে চড়ে বসে। এবার মারমার কাটকাট রব তুলে সে খ্রিস্টানদের হত্যা করতে ও পিছনে সরিয়ে দিতে শুরু করে।

ইতিমধ্যে বাইরের মুসলমানগণ বানের মতো দুর্গে ঢুকে পড়েছে এবং তীব্র আক্রমণ শুরু করে দিয়েছে। তারা খ্রিস্টানদের মোকাবেলায় এদিক-ওদিক ছড়িয়ে পড়তে এবং আক্রমণ করে তাদের পিছনে হটিয়ে দিতে আরম্ভ করেছে।

খ্রিস্টানরা যদিও সংখ্যায় অনেক বেশি, তবু তারা মুসলমানদের ভয়ে ভীত। তাই তারা যুদ্ধে সাহসিকতা ও বীরত্বের পরিচয় দিতে ব্যর্থ হচ্ছে। মুসলমানরা তাদের উপর বীর বিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। তারা তাদের হত্যা করে-করে পিছনে হটিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। খ্রিস্টানরা পরাজয় আর মুসলমানরা বিজয়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

এতক্ষণে যুদ্ধ বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে। তাই যুদ্ধের আগুনও দূর-দূরান্ত পর্যন্ত জ্বলে ওঠেছে। হাজার-হাজার তরবারি একবার উপরে উঠছে আবার নিচে নামছে। মানবমুন্ড দেহ থেকে আলাদা হয়ে মাটিতে পড়ে যাচ্ছে। রক্তের ছিটা বাতাসে উড়ছে। লাশের উপর লাশ পড়ছে। হই-হল্লা প্রতিমুহূর্তে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

রাত পোহায়ে ভোর হয়েছে। আকাশের পূর্বদিগন্তে একটি সাদা রেখা আত্মপ্রকাশ করে ধীরে-ধীরে বড় হতে-হতে আকাশময় ছড়িয়ে পড়েছে। এখন কাছে-ধারের বস্তু স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

দুর্গের সাধারণ খ্রিস্টানরা স্থানে-স্থানে দলবদ্ধ হয়ে আশা-নিরাশার মাঝে দাঁড়িয়ে মুসলমানদের দুর্গে প্রবেশের ব্যাপারটি নিয়ে আলোচনা করছে। তাদের সকলের চোখে-মুখে ভীতি ও উৎকণ্ঠার ছাপ পরিস্ফুট। খ্রিস্টানরা বলাবলি করছে, মুসলমানরা মানুষ নয়– জিন। সে-কারণেই তারা দিনে হুমকি দিয়ে রাতে উড়ে দুর্গে ঢুকে পড়েছে। তাই তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে লাভ নেই। সকলেরই ধারণা বদ্ধমূল হয়ে গেছে, এখন কোনো শক্তি-ই মুসলমানদের হাত থেকে দুর্গকে রক্ষা করতে পারবে না। খ্রিস্টানরা নিদারুণ চিন্তিত হয়ে পড়েছে। তারা ভাবতে শুরু করেছে, দুর্গ থেকে কীভবে বের হবে!

মুসলমানরা শক্তভাবে দুর্গ অবরোধ করে রেখেছে। এই অবরোধ ভেদ করে বের হওয়া অসম্ভব। দুর্গ হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে। এখন তাদের উপায় কী হবে। তারা ভয়ে জড়সড় হয়ে পড়েছে। মুসলমানরা এখন ফটক অতিক্রম করে ভিতরে ঢুকে যুদ্ধ করছে। তারা পরম উদ্দীপনার সঙ্গে দুর্বারগতিতে আক্রমণ চালাচ্ছে। প্রতিটি মুহূর্তে লাশ পড়ছে। আব্দুল্লাহ ইবনে সা'দের সঙ্গে যে-দুশ যোদ্ধা এসেছিল, তাদেরকে পিছনে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। কারণ, তারা পদাতিক। এখন যুদ্ধ করার জন্য পর্যাপ্ত তাজাদম ঘোড়া রয়েছে। কিন্তু পদাতিকরাও থেমে নেই। তারাও মওকামতো শত্রুনিধন করে চলছে এবং নিহত শত্রুসেনাদের ঘোড়াগুলো নিয়ে তাতে চড়ে যুদ্ধ করছে। দুশর পঞ্চাশ-ষাটজনই ঘোড়া পেয়ে গেছে। সরোয়ার পেয়েছে অনেক আগেই। আব্দুল্লাহ ইবনে সা'দও এখন অশ্বারোহী। সরোয়ার সকলের আগে বীরত্বপূর্ণ যুদ্ধ লড়ছে, যারপরনাই শক্তিমত্তার সঙ্গে আক্রমণ চালাচ্ছে।

বেলা বেড়ে গেছে। এখন দূরের বস্তুও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। সরোয়ার চোখ তুলে তাকায়। দেখে, এক ব্যক্তি ঘোড়ায় চড়ে নিজ সৈন্যদের উত্তেজিত করছে। লোকটি ঝলমলে রেশমি পোশাক ও মুক্তাজড়ানো সোনার অলংকার পরিহিত। মাথায় সোনার মুকুট। সরোয়ার বুঝে ফেলে, ইনিই এই দুর্গের অধিপতি হারকুস। হারকুসের আশপাশে যে-বাহিনীটি ছিল, সরোয়ার তাদের উপর আক্রমণ চালায়। আক্রমণের তীব্রতা দেখে হারকুসের বিশেষ বাহিনীটি ঘাবড়ে যায়। সরোয়ারের তরবারি নির্বিচারে হত্যা করে চলে। সরোয়ারকে সম্মুখে অগ্রসর হতে দেখে জনাবিশেক মুজাহিদ তাকে শত্রু থেকে রক্ষা করে-

করে এবং খ্রিস্টানদের উপর আক্রমণ করতে-করতে অগ্রসর হতে শুরু করে। একদিকে এই ক্ষুদ্র দলটি হারকুসের দিকে এগিয়ে যায়, অন্যদিকে আব্দুল্লাহ ইবনে সা'দ তার ইউনিটটির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। হারকুসের বিশেষ বাহিনীটি দুদিক থেকে আক্রমণের শিকার হয়ে পড়ে।

মুজাহিদগণ চারদিকে ছড়িয়ে-থাকা-খ্রিস্টানদের সঙ্গে ঘোরতর যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। যুদ্ধের আগুন এতক্ষণে লেলিহান রূপ ধারণ করেছে। হাজার-হাজার তরবারি দ্রুত উর্ধ্বে উঠে-উঠে মুন্ডুপাত করে চলছে। খ্রিস্টানরাও সবটুকু শক্তি ব্যয় করে যুদ্ধ করছে। তাদের যুদ্ধ যেন মরনপণ রূপ ধারণ করেছে। তাদের তরবারিগুলোও মুসলমানদের গায়ে আঘাত হানছে। মুসলমানরাও হতাহত হচ্ছে।

সাবতিলার দুর্গের প্রতিইঞ্চি মাটি রক্তের বানে ভাসছে। কিন্তু মুসলমানরা এত বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করছে যে, খ্রিস্টানরা সফল হতে পারছে না। খ্রিস্টানরা হয়ত নিহত হয়ে পড়ে যাচ্ছে, নতুবা মুসলমানরা তাদেরকে পিছনে সরিয়ে দিচ্ছে।

এখন যুদ্ধ ফটকের অনেক ভিতরে ছড়িয়ে পড়েছে। মুসলমানরা দুর্গের কিছু অংশ দখল করে ফেলেছে।

সরোয়ার হারকুসের নিকটে পৌঁছে গেছে। সে হাঁক দিয়ে বলল– 'হতভাগা! কাপুরুষ! লোকগুলোকে এভাবে ধ্বংস করছ কেন? যদি বীরযোদ্ধা হয়ে থাকো, তো সামনে এসে মোকাবেলা করো।'

ঘোষণাটা হারকুসের আত্মমর্যাদায় আঘাত হানে। তিনি উত্তেজিত হয়ে তরবারি হাতে এগিয়ে এসে সরোয়ারের উপর আক্রমণ করেন। উভয়ে অসিচালনার যোগ্যতার প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হন। চারদিকে মুসলিম ও খ্রিস্টান সৈন্যরা দাঁড়িয়ে তাদের প্রতিযোগিতা অবলোকন করতে শুরু করে।

সরোয়ার এমনভাবে আক্রমণ চালায় যে, তার তরবারির আঘাতে হারকুসের তরবারিটা হাত থেকে ছুটে ছিটকে এক খ্রিস্টানসেনার গলায় গিয়ে আঘাত হানে। ফলে লোকটির মাথা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

হারকুস ভয় পেয়ে যান। তিনি পিছনে সরে যেতে মনস্থ করেন। কিন্তু সরোয়ার তাকে সেই সুযোগটা দিল না। ধেয়ে এসে দুহাতে গলাটা চেপে ধরে উর্ধ্বে তুলে এমনভবে আছাড় মারে যে, মটমট করে হারকুসের পাজরের হাড় ভেঙে যায়। হারকুস মাটিতে শুয়ে তড়পাতে শুরু করে। সরোয়ার তাড়াতাড়ি ঘোড়া থেকে নেমে তার ঘাড়ে তারবারির আঘাত হানে। হারকুসের মাথাটা

দেহ থেকে আলাদা হয়ে যায়। খ্রিস্টানরা সরোয়ারের উপর আক্রমণ করতে উদ্যত হয়। কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে মুসলমানরা এগিয়ে এসে তার চারপার্শ্বে ব্যূহ রচনা করে ফেলে। তারাই বরং খ্রিস্টানদের উপর আক্রমণ চালায়।

সরোয়ার হারকুসের মাথাটা বর্শায় গেঁথে উপরে তুলে ধরে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা দেয়– 'খ্রিস্টানগণ, তোমাদের নেতা মারা গেছে, আর যুদ্ধ করে লাশের সংখ্যা বাড়িয়ে লাভ কী?'

বর্শার আগায় গাঁথা হারকুসের কর্তিত মস্তক দেখামাত্র খ্রিস্টানদের মনোবল ভেঙে যায়। তারা একযোগে পিছপা হয়ে পালাতে শুরু করে। মুসলমানরা ধাওয়া করে-করে তাদেরকে হত্যা করতে থাকে।

মুসলমানরা দুর্গের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। তারা বেছে-বেছে খ্রিস্টানসেনাদের হত্যা করতে থাকে। সমগ্র দুর্গ, প্রতিটি রাস্তায়-গলিতে এবং প্রতিটি মাঠে খ্রিস্টানদের লাশের স্তূপ জমে গেছে। খ্রিস্টানরা এতই দিশেহারা হয়ে পড়েছে যে, তারা নিরাপত্তা প্রার্থনা করতেও ভুলে গেছে। তারা এলোপাতাড়ি পালাচ্ছে আর মারা পড়ছে। পনেরো-বিশ হাজার সৈন্য মৃত্যুবরণ করার পর তাদের সম্বিৎ ফিরে আসে। এবার তারা 'নিরাপত্তা নিরাপত্তা' বলে চিৎকার জুড়ে দেয়।

মুসলমানগণ সঙ্গে-সঙ্গে তরবারি সংবরণ করে ফেলে। হত্যাযজ্ঞ বন্ধ করে খ্রিস্টানদের গ্রেফতার করতে শুরু করে।

সেনাপতি আব্দুল্লাহ ইবনে সা'দ প্রতিশ্রুতি মোতাবেক হারকুসের দূতকে মুক্ত করে দেন এবং তার পরিবারের সকল সদস্যকে নিরাপত্তা প্রদান করেন।

বিশ.

খ্রিস্টানদের বিশ্বাস ছিল, তাদের তারাবলিস দুর্গ এতই শক্ত ও দুর্ভেদ্য যে, বছরের-পর-বছর অবরোধ করে রেখেও সেটি জয় করা সম্ভব হবে না। কিন্তু মহান আল্লাহর অপার সাহায্যে মুসলমানরা অতি অনায়াসে দুর্গটি জয় করে নিল।

কোনো জাতি বা গোষ্ঠী যদি কোনো দুর্গ বা নগরী পদানত করে, তখন পরাজিত ভূখণ্ডের নাগরিকদের গণহত্যা ও লুণ্ঠন করা একটি স্বীকৃত ইতিহাস। খ্রিস্টানরা এমনটিই জানে। তাই তাদের তারাবলিস দুর্গ মুসলমানদের দখলে চলে যাওয়ার পর তারা যারপরনাই ভীত ও উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়ে। নিজেদের ভয়াবহ পরিণতির কথা চিন্তা করে তারা বাক্‌শক্তি হারিয়ে ফেলে। কিন্তু যখন তারা ঘোষণা শুনল– 'আমরা কোনো নিরীহ খ্রিস্টানকে হত্যা করব না, কারও

ঘরে আগুন দেব না, কাউকে মুসলমান হতে বাধ্য করব না, কারও ধর্মীয় কর্মকাণ্ডে হস্তক্ষেপ এবং নারীদের অসম্মান করব না', তখন তারা বিস্ময়ে হকবাক্ হয়ে পড়ে। মুসলমানদের এই ঘোষণায় তারাবলিসের খ্রিস্টানদের মনের সব ভয়-ভীতি দূর হয়ে যায়। তাদের হৃদয়ে আনন্দের বান বইতে শুরু করে। তারা নিশ্চিন্তমনে কাজ-কর্মে লিপ্ত হয়ে পড়ে।

মুসলমানরা রাজপ্রাসাদ ও রাজকোষাগার দখল করে নেয় এবং যত মণি-মুক্তা, দিনার-দেরহাম, সোনা-রুপার পাত্র, রেশমি কাপড় ও অন্য সকল মূলবান জিনিসপত্র পাওয়া গেল, একস্থানে একত্রিত করে। প্রাপ্ত মূল্যবান সম্পদসমূহের মধ্যে একটি রুপার চেয়ার এবং কয়েকটি সোনার মুকুটও ছিল।

দুর্গের দখল বুঝে নিয়ে আব্দুল্লাহ ইবনে সা'দ সব কটি ফটক খুলে দিয়ে তাতে প্রহরা বসিয়ে দেন এবং দুর্গের ভিতরে কিছু সৈন্য মোতায়েন করেন।

পরদিন তিনি তারাবলিসের নেতৃস্থানীয় লোকদের ডেকে একত্রিত করে বললেন– 'আপনারা যারা স্বেচ্ছায় মুসলমান হতে ইচ্ছুক, তারা ইসলাম গ্রহণ করুন। যারা মুসলমান হতে সম্মত নন, তাদেরকে জনপ্রতি বার্ষিক চার দিনার জিযিয়া প্রদান করতে হবে। এই জিযিয়া আপনাদের 'নিরাপত্তা কর' বলে গণ্য হবে। আর যারা এই দুটির একটিতেও রাজি নন, তারা মালপত্র যা কিছু আছে সব নিয়ে দুই দিনের মধ্যে দুর্গ থেকে বেরিয়ে যাবেন।'

আব্দুল্লাহ ইবনে সা'দের নিকট থেকে বিদায় নিয়ে নেতারা বিষয়টি সাধারণ নাগরিকদের অবহিত করে। প্রায় দু-হাজার খ্রিস্টান পরিজনসহ ইসলাম গ্রহণ করে। আড়াই হাজার লোক দুর্গ থেকে বেরিয়ে যায়। অবশিষ্টরা জিযিয়া আদায় করে আপন ভিটেয় বহাল থাকে।

কয়েক লাখ টাকার জিযিয়া উসুল হয়। সেনাপতি আব্দুল্লাহ ইবনে সা'দ এই অর্থ এবং মালে গনীমতের পাঁচ ভাগের এক ভাগ দরবারে-খেলাফতে প্রেরণের জন্য আলাদা করে রাখেন। অবশিষ্ট চার ভাগ সকল মুজাহিদ এবং নওমুসলিমদের মাঝে বন্টন করে দেন। সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়, সাবতিলা জয় হওয়ার পর গনীমতের এক-পঞ্চমাংশ দরবারে-খেলাফতে প্রেরণ করা হবে। তার আগ পর্যন্ত এই সম্পদ রাজকোষে জমা থাকবে।

মুসলমানদের মাঝে খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে যে, সরোয়ার তারাবলিসের অধিপতি হারকুসকে অত্যন্ত বীরত্বের সঙ্গে হত্যা করেছে এবং তার নিহত হওয়ার পরই দুর্গ জয় হয়ে গেছে। তাই মানুষ সরোয়ারকেই তারাবলিসের বিজেতা ভাবতে শুরু করেছে।

আব্দুল্লাহ ইবনে সা'দ দুর্গের শৃঙ্খলাবিধানে ব্যস্ত। তিনি মাত্র দু-হাজার মুসলমানকে দুর্গে থাকার অনুমতি প্রদান করেছেন। অবশিষ্ট সকল সৈন্যকে দুর্গের বাইরে এবং চারপার্শ্বে অবরোধের বিন্যাসে মোতায়েন রাখেন।

আরব মহিলারা যথারীতি নারীক্যাম্পেই অবস্থান করছে এবং সরোয়ার তাদের নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছে।

একদিন আসর নামাযের পর। সরোয়ার নদীর কূলে হাঁটছে। হাঁটতে-হাঁটতে সে একস্থানে দাঁড়িয়ে যায়। নদীর দিকে তাকিয়ে দেখতে পায়, পানি দিগন্তের সঙ্গে মিশে গেছে। যেদিকে এবং যে-পর্যন্ত চোখ যায় শুধু নীলাভ পানির ঢেউ ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না। বাতাস না-থাকলেও নদীতে তরঙ্গ আছে, যার ক্ষুদ্রতম ঢেউটিও এমন যে, ছোট-খাট নৌযানকে ডুবিয়ে ফেলতে সক্ষম। সরোয়ার কিছুক্ষণ এই মনোরম দৃশ্য অবলোকন করে ফিরে নারীক্যাম্পের দিকে রওনা দেয়। কী একটি ভাবনায় ডুবে আছে সে। সে যে এতক্ষণে ক্যাম্পের নিকটে চলে এসেছে, সে-খবরই তার নেই। হঠাৎ চিত্তাকর্ষী এক কণ্ঠ ভেসে আসে– 'আজ বোধহয় পথ ভুলে এদিকে আসা হয়েছে?'

সরোয়ার চমকে উঠে চোখ তুলে তাকায়। দেখে, এক পার্শ্বে সালমা দাঁড়িয়ে। চৈতন্য ফিরিয়ে এনে বলল– 'পথ ভুলে নয় সালমা! আমি ভাবনার জগতে হারিয়ে গিয়েছিলাম।'

সালমা হেসে ওঠে। সেই হাসিতে বেরিয়ে-আসা দন্তরাজির ঔজ্জ্বল্যে তার মুখমন্ডল স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। বলল– 'সেই ভাবনার জগতটা থাকে কোথায়?'

সরোয়ার রূপরানী মেয়েটির প্রতি তাকিয়ে বলল– 'আমার হৃদয়ে।'

সালমা আবারও হেসে ওঠে। মনে হচ্ছে, এইমুহূর্তে সে তার মনের উপচানো আনন্দ ঠেকিয়ে রাখতে পারছে না। হাসতে-হাসতে তার দু-চোখে পানি ছলছল করে ওঠে। চেহারাটা গোলাপের মতো ফুটে ওঠে। হাসি থামিয়ে কিছুক্ষণ নীরব থেকে বলল– 'আপনি বোধহয় নিজেরই অন্তরে ডুব দিতে-দিতে এদিকে আসছিলেন?'

সরোয়ার দুষ্টু রূপসীটার প্রতি এমনভাবে তাকায়, যেন তার কোনো ভুল হয়ে গেছে।

সালমা হাসি নিয়ন্ত্রণ করে বলল– 'ভাবনার জগত আপনার অন্তরেই আছে, না?'

ঃ আমি তা বলছিলাম নাকি?

ঃ না, আমি আপনা থেকেই বলছি।

ঃ কথাটা মুখ ফসকে বেরিয়ে গেছে।

ঃ এখন বোধ হয় আপনার হুঁশ-জ্ঞান ঠিক থাকে না।

ঃ তোমার চপল হরিণী চোখ দুটো আমার হুঁশ-জ্ঞান ছিনিয়ে নিয়েছে।

সালমা লজ্জা পায়। কথার গতি পরিবর্তন করে বলল– 'উহ, আমার বড় ভুল হয়ে গেছে। আপনাকে ধন্যবাদটা তো দিলামই না। তারাবলিসের বিজেতা, আপনাকে মোবারকবাদ!'

রূপসী মেয়েটির প্রতিটি গতি-প্রকৃতি অবলোকন করছে সরোয়ার। সে যে-ধারায় তাকে বিজয়ের মোবারকবাদ জ্ঞাপন করল, তা ছিল ঈমান-বিধ্বংসী ধারা। সরোয়ার বলল– 'তুমি আমাকে জয়ের মোবারকবাদ দিয়েছ; আমি বিনিময় পেয়ে গেছি।'

ঃ আমি তো এই ভেবে বিস্মিত যে, তুমি তারাবলিসের অধিপতিকে হত্যা করলে কীভাবে?

ঃ তুমি বড় চঞ্চল মেয়ে সালমা!

ঃ আর তুমি খুব শান্ত, না?

ঃ আসল কথা কি জান, তোমার সামনে এলে আমি সব ভুলে যাই।

ঃ আমার তো ভয় লাগছে, আবার নিজেকেই হারিয়ে ফেল কি-না!

ঃ হায়, আমি যদি হারিয়ে যেতাম সালমা...!

সালমা জাদুচোখে সরোয়ারের প্রতি তাকায়– 'বলুন।'

ঃ কী বলব? তোমার প্রেম-ভালবাসা আমাকে কিছুই বলতে দেয় না। তোমার অভিযোগ ঠোঁটে এসেই আটকে যায়।

ঃ বেশ, আমার ব্যাপারে আপনার কী অভিযোগ?

ঃ বললে রাগ করবে না তো?

ঃ তা হলে বলো না।

ঃ না-শুনলে বলব না।

ঃ আচ্ছা, আপনি ওদিকে কোথায় গিয়েছিলেন?

ঃ নদী দেখতে।

ঃ আমিও নদী দেখেছি। পানির এক জগত। বড় ভয়ানক দৃশ্য। কিন্তু চোখ ফেরানো যায় না। আচ্ছা, আপনারা এখানে আর কতদিন থাকবেন?

ঃ কেন? এখানকার বিনোদনে মন ভরে গেছে না-কি?

ঃ তা নয়। ভাবছিলাম, এ-অঞ্চল তো জয় হয়ে গেছে; এখন আমাদের আরেক অঞ্চল জয় করতে হবে।

সরোয়ার সালমার প্রতি তাকিয়ে মিটিমিটি হেসে গম্ভীরকণ্ঠে বলল– 'কিন্তু সরকারের পক্ষ থেকে এই জয়ের কী বিনিময় পেলাম? শুধুই মোবারকবাদ।'

সালমা দুষ্টুচোখে সরোয়ারের প্রতি দৃষ্টিপাত করে বিজ্ঞের মতো বলল– 'আর কী চান আপনি?'

সরোয়ার সালমার ঝলমলে মুখখানার প্রতি তাকিয়ে মায়া-মায়া কণ্ঠে বলল– 'অনুমতি হলে বলি। রাগ করলে কিন্তু বলব না।'

ঃ যে-কথায় অপরের মনে কষ্ট আসতে পারে, তা না-বলাই উচিত।

সারোয়ার পা-পা করে সালমার প্রতি এগিয়ে যায়। সালমাও সমান পদক্ষেপে পিছনে সরে যায়। সরোয়ার বলল– 'সালমা, আজ তুমি... ।'

সালমা সরোয়ারকে থামিয়ে দিয়ে বলল– 'তা আপনি সামনে এগোচ্ছেন কেন?'

ঃ আর তুমি পেছনে সরে যাচ্ছ কেন?

ঃ দেখুন, সূর্য ডুবে গেছে; এখনই মাগরিবের আযান হবে।

সরোয়ার চোখ তুলে আকাশের দিকে তাকায়। না, এখনও সূর্য ডোবেনি। দিবসের কিছু অংশ এখনও অবশিষ্ট আছে। বলল– 'দুষ্টু কোথাকার!'

সরোয়ার আকাশ থেকে চোখ সরিয়ে আনে। সালমা যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল, সেখানে তাকায়। কিন্তু সালমা উধাও! এদিক-ওদিক দৃষ্টিপাত করে দেখল, সালমা তার দিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে নারীক্যাম্পের দিকে চলে যাচ্ছে। সূর্যের সোনালি আভায় মেয়েটির উজ্জ্বল মুখমণ্ডলটা চকমক করছে। চোখে চঞ্চলতার ঝিলিক, ঠোঁটে মুচকি হাসি। সরোয়ার সালমার প্রতি তাকিয়ে থাকে। কিছু না-বলে ফাঁকি দিয়ে তাকে ফেলে চুপচাপ চলে যাচ্ছে মেয়েটি। সরোয়ার অবাক্‌বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে। যতক্ষণ সালমাকে দেখা যায়, ততক্ষণ অপলক চোখে দাঁড়িয়েই থাকে সরোয়ার।

সরোয়ার ফিরে এসেছে। সেদিনই আব্দুল্লাহ ইবনে সা'দ ঘোষণা দেন, আগামী কাল বাহিনী সাবতিলার উদ্দেশ্যে রওনা হবে; সকলে প্রস্তুতি গ্রহণ করো। সরোয়ার এই সিদ্ধান্তের কথা নারীক্যাম্পে জানিয়ে দেয়। ঈশার নামায আদায় করে সকলে প্রস্তুতি শুরু করে দেয়। ফজর নামায় আদায় করেই বাহিনী সাবতিলার উদ্দেশ্যে রওনা হয়। তারাবলিস দুর্গে রয়ে যায় মাত্র এক হাজার সৈনিক।

একুশ.

জর্জির ঘোষণা করেছিলেন, রবিবার উপাসনার পর বাহিনী রওনা হবে। যেহেতু সময় এখনও এক সপ্তাহ বাকি, তাই প্রতিদিন প্রতিটি গীর্জায় যুদ্ধে

সফলতার প্রার্থনা হবে। প্রতিটি গির্জার পাদরিগণ জয়ের জন্য প্রত্যহ প্রার্থনা করছেন। ওদিকে বাহিনীতে প্রস্তুতি চলছে। জর্জির যে-বাহিনীটিকে রণাঙ্গনে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত করেছেন, তার সংখ্যা এক লাখ বিশ হাজারে পৌঁছে গেছে। এই বিশাল বাহিনীটি দেখে সাধারণ খ্রিস্টানরা ভাবতে শুরু করেছে, তাদের রাজা মুসলমানদেরকে পরাজিত করে মিসর ও সিরিয়া দখল না-করে ছাড়ছেন না। স্বয়ং জর্জিরও একই স্বপ্ন দেখছেন। যেহেতু এই যুদ্ধের সূচনা জর্জিরের পক্ষ থেকে হয়েছিল এবং মিসর আক্রমণ করা তার লক্ষ্য, তাই তিনি সম্ভাব্য সব ধরনের প্রস্তুতি গ্রহণ করেছেন।

প্রধান পাদরি থেভডোস ঘন-ঘন বাহিনীতে আগমন করছেন এবং সৈন্যদের মনে উত্তেজনা সৃষ্টির লক্ষ্যে জ্বালাময়ী বক্তৃতা করছেন। তার উদ্দেশ্য, খ্রিস্টান জানবাজদের মধ্যে জীবনদানের স্পৃহা সৃষ্টি হোক, যেন রণাঙ্গনে পৌঁছেই তারা মুসলমানদের পিষে ফেলতে সক্ষম হয় এবং তাদের পরাজিত করে প্রথমে মিসর এবং তার পর সিরিয়া দখল করে নেয়। থেভডোস, জর্জির ও সকল খ্রিস্টান এ-ব্যাপারে নিশ্চিত যে, তারাবলিসের দুর্গ এতই মজবুত ও দুর্ভেদ্য যে, এক-দু-সপ্তাহে মুসলমানরা তার কিছুই করতে পারবে না। একদিন থেভডোস জর্জিরের উপস্থিতিতেই এক ভাষণ প্রদান করেন। তিনি বললেন– 'খ্রিস্টান জানবাজগণ, আমি রাতে খোদার প্রিয় পুত্রকে স্বপ্নে দেখেছি। তিনি অত্যন্ত হাসিখুশিতে আছেন। বলছেন– 'থেভডোস, উঠো, খ্রিস্টানদের মাঝে ঘোষণা করে দাও, তারা যেন খোদার পুত্রের পয়গাম শ্রবণ করে এবং তদনুযায়ী আমল করে।'

সকল খ্রিস্টান অত্যন্ত মনোযোগসহকারে পাদরির বক্তব্য শুনছে। যিশুখ্রিস্টের পয়গাম শোনবার জন্য তারা নড়েচড়ে কান খাড়া করে বসে। মজলিস এমন নীরবতায় ছেয়ে যায় যে, নিঃশ্বাস ফেলার শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দ শোনা যাচ্ছে না।

থেভডোস বললেন– 'তিনি বলেছেন, "আমি জেরুজালেম থেকে আসছি। বিধর্মীরা এই পবিত্র নগরীটিকে যারপরনাই অপবিত্র করে রেখেছে। এই পুণ্যভূমিকে তাদের হাত থেকে উদ্ধার করা খ্রিস্টানদের একান্ত কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। খ্রিস্টানদেরকে ভোগ-বিলাসিতায় লিপ্ত দেখে খোদা তাদের প্রতি নারাজ হয়ে পড়েছিলেন। তাই তাদের শাস্তিদানের লক্ষ্যে তাদের পবিত্র ভূমিকে তাদের থেকে ছিনিয়ে নিয়ে অ-খ্রিস্টানদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন। কিন্তু, এখন তিনি খ্রিস্টানদের প্রতি সন্তুষ্ট। তাই এখন জেরুজালেমকে খ্রিস্টানদের হাতে ফিরিয়ে দিতে চাচ্ছেন। এই যুদ্ধটা হবে ধর্মযুদ্ধ। যারা এই

যুদ্ধে প্রাণদান করবে, তারা শহীদ হবে। আর যারা জীবিত থাকবে, খোদাওন্দ তাদেরও প্রতিদান দেবেন, তাদেরকে মর্যাদা, খ্যাতি ও সম্পদ দান করবেন। মুসলমানদের রূপসী নারীরা তাদের দাসী আর শিশু -কিশোররা তাদের গোলামে পরিণত হবে।" যিশু আমাকে সংবাদ প্রদান করেছেন যে, "সম্রাট জর্জির ও তাঁর বাহিনী জেরুজালেম পুনর্দখল করবেন। এই বাহিনীতে যারা অংশগ্রহণ করবে, তারা যিশু ও খোদার প্রিয়পাত্র বলে পরিগণিত হবে।" খ্রিস্টান বীরগণ, তোমরা ও তোমাদের রাজা সৌভাগ্যবান। সম্পদ ও মর্যাদা তোমাদের হাতছানি দিয়ে ডাকছে। তোমরা যেদিকেই যাবে, জয়ের-পর-জয় লাভ করে ফিরবে। ইহজগতেই তোমাদের খ্যাতি ও মর্যাদার পতাকা উড্ডীন হবে। আমি নিজেও এই বাহিনীতে থাকব। সবচেয়ে বড় বিষয় হচ্ছে, রূপরাণী রাজকুমারী হেলেনও সঙ্গে থাকবে। রাজাও থাকবেন। আমি তোমাদেরকে খোদাওন্দের বার্তা পৌঁছিয়ে দিয়েছি। এখন কর্তব্য পালন করা তোমাদের কাজ।'

প্রধান পাদরি থেভডোসের এই বক্তব্যে সকল খ্রিস্টান আনন্দে আত্মহারা হয়ে যায়। প্রত্যেকেই বুঝে নেয়, খোদা ও তার পুত্র মুসলমানদের প্রতি নাখোশ হয়ে পড়েছেন। আর সে-কারণে মুসলমানদের পরাজয় ও খ্রিস্টানদের জয় সুনিশ্চিত। পাদরির ভাষণ শুনেই তারা মুসলমানদের সম্পদ লুণ্ঠন, তাদের নারীদের দাসী ও শিশুদের দাস বানানোর স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে। এই খ্রিস্টান বাহিনীর অধিকাংশই এমন যে, তারা কখনও রাজকুমারী হেলেনের চেহারা দেখেনি। তবে, সকলের মনে তাকে একনজর দেখার আকাঙ্খা বিরাজমান। তারা ভাবল, রূপরানী যখন বাহিনীর সঙ্গে থাকছে, তা হলে দেখার সুযোগ অবশ্যই মিলবে। তারা জানে, রাজকুমারী হেলেন যতটা রূপসী, ততটা বীরাঙ্গনা যোদ্ধাও। তাই তার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করাটাই স্বাভাবিক। খ্রিস্টানসেনারা সেই দিনটির অপেক্ষায় প্রহর গুণছে, যেদিন বাহিনী মিসরের উদ্দেশ্যে রওনা হবে এবং হুর-সুন্দরী রাজকুমারী তাদের সঙ্গ নেবে।

থেভডোস এই ভাষণ প্রদান করেন বৃহস্পতিবার। শুক্রবার দুপুরের পর এক ব্যক্তি তারাবলিসের দিক থেকে ঘোড়া হাঁকিয়ে ছুটে এসে সোজা সাবতিলার দুর্গে চলে যায়। লোকটি সঙ্গীহীন– একা। তাই সৈন্যরা কেউ তাকে দেখল, কেউ দেখল না। যারা দেখল, তারা ভাবল, লোকটি বোধহয় সুসংবাদ নিয়ে এসেছে যে, খ্রিস্টানরা মুসলমানদের পরাজিত করে তাড়িয়ে দিয়েছে। তাদের মনে শঙ্কা জাগে, সংবাদ যদি তা-ই হয়, তা হলে তো সম্রাট মিসর অভিযান মুলতবি করে দিবেন। মুসলমানদের সম্পদ লুণ্ঠন এবং তাদের নারী ও শিশুদের

মালিক হওয়ার লোভ খ্রিস্টানদের পেয়ে বসেছে। তা ছাড়া যুদ্ধ মুলতবি হয়ে গেলে রাজকুমারী হেলেনের দর্শন থেকেও তারা বঞ্চিত হয়ে যাবে। তাই তাদের ঐকান্তিক কামনা, সম্রাট মুসলমানদের উপর আক্রমণ অভিযান বহাল রাখুন।

তারাবলিস থেকে আগত অশ্বারোহী সাবলিতায় প্রবেশ করে সোজা রাজপ্রাসাদ অভিমুখে ছুটে যায় এবং প্রাসাদের ফটকের সম্মুখে গিয়ে দাঁড়িয়েই প্রহরীদের বলে– 'আফ্রিকার সম্রাটকে খবর দাও, তারাবলিস থেকে দূত এসেছে এবং অনেক জরুরি সংবাদ আছে।'

এই সেই দূত, যে দিনকয়েক আগে সাহায্যের আবেদন নিয়ে এসে ফিরে গিয়েছিল। প্রহরীরা সঙ্গে-সঙ্গে সম্রাটকে সংবাদটা জানায়। সম্রাট তাকে নিজকক্ষে ডেকে পাঠান।

দূত প্রাসাদে প্রবেশ করে। অতিশয় আলিশান মহল। এর আগে এমন সুন্দর প্রাসাদ আর এমন বিলাসবহুল উপকরণ সে কখনও দেখেনি। লোকটি বিস্মিত হয়ে পড়ে। কক্ষের সন্নিকটে পৌঁছুলে সে অসংখ্য রূপসী নারী ও তরুণীদের দেখতে পায়, যারা অত্যন্ত মূল্যবান রেশমি পোশাক ও সোনার অলংকার পরিহিত। তাদের চাঁদের মতো সুন্দর মুখগুলো ঝিকমিক করছে। দূত তাদের নিকটে গিয়ে পৌঁছুলে তাকে থামিয়ে দিয়ে বলা হল– 'রাজকুমারী হেলেন মহারাজের সঙ্গে কথা বলছেন; তুমি একটু দাঁড়াও।'

এই দূতও রাজকুমারী হেলেনের রূপের প্রশংসা শুনেছে। এর হৃদয়ও তাকে একনজর দেখার আকাঙ্খা পূর্ব থেকেই বিরাজ করছিল। মনে-মনে ভাবে, রাজকুমারী যখন কক্ষ থেকে বের হবে, তখন তাকে দেখে জীবনের স্বাদ মেটাব। দূত আশপাশের রূপসী মেয়েগুলোর প্রতি তাকাচ্ছে, আবার রাজার কক্ষের দরজার উপরও কড়া নজর রাখছে। খানিক পর রাজকুমারী কক্ষ থেকে বেরিয়ে যায়। কিন্তু তার চোখ ছিল অন্যদিকে। দূত তাকে এক ঝিলিক দেখতে-না-দেখতেই মেয়েটি নারীমহলের দিকে চলে যায়। রূপসী রাজকন্যাকে দেখার স্বাদ তার অপূর্ণই থেকে যায়।

এক সেবিকা তাকে কক্ষে প্রবেশ করতে ইঙ্গিত করে। সে কক্ষে প্রবেশ করেই সম্রাটকে কুর্নিশ করার জন্য নুয়ে পড়ে। মাথা তুলে দাঁড়ালে জর্জির তার প্রতি দৃষ্টিপাত করে তাকে চিনে ফেলে। বললেন– 'ও, তুমি আবার এসেছ!'

ঃ জি মহারাজ, আমি আবার এসেছি।

ঃ এবার নিশ্চয়ই জয়ের সংবাদ শোনাতে এসেছ।

দূত আক্ষেপভরা কণ্ঠে বলল, হায়, আমি যদি বিজয়ের সংবাদই শোনাতে আসতাম!'

জর্জির তার প্রতি তাকিয়ে হতাশকণ্ঠে বললেন– 'তা হলে কি আবারও সাহায্যের আবেদন নিয়ে এসেছ?'

ঃ না মহারাজ, এখন সাহায্যেরও আবশ্যক নেই।

ঃ বিস্ময়কর কথা বলছ তো তুমি! হয়েছে কী বল!

ঃ মহারাজ, মুসলমানরা তারাবলিস জয় করে নিয়েছে।

শুনে জর্জির বিস্মিত ও বিচলিত হয়ে ওঠেন। তার বিশ্বাসই হচ্ছিল না, তিনি যা শুনছেন, দূত তা-ই বলেছে। মনে সংশয় জাগে, ভুল শুনেছেন কি-না। তাই পুনরায় জিজ্ঞেস করেন– 'কী বললে? মুসলমানরা তারাবলিস জয় করে নিয়েছে?'

ঃ জি মহারাজ!

ঃ হারকুস কোথায়?

ঃ যুদ্ধে মারা গেছে।

জর্জিরের মাথায় যেন বাজ পড়ে। তার মনে বড় আক্ষেপ জাগে। বললেন– 'মুসলমানরা দুর্গে ঢুকল কী করে?'

ঃ কেউ জানে না মুসলমানরা কীভাবে দুর্গে ঢুকেছে।

ঃ প্রাচীর ভেঙে ঢুকেছে মনে হয়?

ঃ না। তারা রাতে হঠাৎ ঢুকে পড়েছে।

ঃ প্রাচীর না-ভেঙেই?

ঃ হ্যাঁ।

ঃ তুমি কি তারাবলিস পৌঁছেছিলে?

ঃ আমি পৌঁছানোর আগেই হতভাগা মুসলমানরা দুর্গ জয় করে ফেলেছে।

ঃ তা তুমি ঘটনা কথা জানলে কী করে?

ঃ মুসলমানরা কিছু লোককে দুর্গ থেকে বের করে দিয়েছিল। পথে তাদের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল।

ঃ তারা কী বলল?

ঃ তারা বলল, আমরা রাতে নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছিলাম। শেষ রাতের দিকে হঠাৎ 'মুসলমান এসে পড়েছে, মুসলমান এসে পড়েছে' বলে হইচই শুরু হয়ে যায়। আমরা জাগ্রত হয়ে ঘর থেকে বের হয়ে দেখি যুদ্ধ চলছে। ভোরনাগাদ হারকুস মৃত্যুবরণ করেন এবং তারাবলিস মুসলমানদের হাতে চলে যায়।

ঃ কোনো ভয় নেই। আমি ওই অপদার্থ মুসলমানদের থেকে হারকুস ও তারাবলিসবাসীদের প্রতিশোধ নেব। আমার এক লাখ বিশ হাজার বীর ও সাহসী সৈন্য আছে। আজ শুক্রবার। পরশু রোববার উপাসনার পর রওনা হব।

মৃত্যুই মুসলমানদেরকে আমার কাছে টেনে এনেছে। আমার জানবাজ সৈনিকরা তাদের ছিঁড়ে ফেলবে। তুমি বিশ্রাম নাও। পরশু তুমিও বাহিনীর সঙ্গে যাবে।

তারাবলিস পতনের সংবাদ জর্জিরের বাহিনীতেও ছড়িয়ে পড়েছে। সবাই জেনে ফেলেছে, মুসলমানরা তারাবলিস দুর্গ জয় করে নিয়েছে এবং তারাবলিস অধিপতি হারকুস মারা গেছেন।

এ-সংবাদে খ্রিস্টানদের মনে ক্ষোভও জাগে এবং মুসলমানদের বীরত্বে ঈর্ষাও জাগে। তারা প্রত্যয় ব্যক্ত করে, যে-মুসলমানরা হারকুসকে হত্যা করে তারাবলিস জয় করে নিয়েছে, আমরা তাদের প্রত্যেককে হত্যা করে ফেলব। এখন খ্রিস্টানরা বড় অধৈর্যের সঙ্গে রবিবারের অপেক্ষায় প্রহর গুণছে। মুসলমানদের পরাজিত করে তারাবলিসের প্রতিশোধ না-নিয়ে তারা ক্ষান্ত হবে না।

বাইশ.

সাবতিলা একটি জাঁকজমকপূর্ণ নগরী। উঁচু-উঁচু দালান ও ঘনবসতি। অধিবাসীরা সবাই বিত্তশালী। রাজপ্রাসাদের সন্নিকটে পাশাপাশি কয়েকটি ভবন। এসব ভবনে রাজা-রানী ও রাজকুমারী হেলেনের সেবায় নিয়োজিত দাসীরা বাস করে। তার সামান্য সম্মুখে উজিরে আজমের বিলাসবহুল প্রাসাদ। সেখান থেকে একটু এগিয়ে গেলে প্রধান সেনাপতির দফতর। তার পর থেকে শুরু হয়েছে রাজকর্মকর্তাদের বাসভবনের সারি।

সম্রাট জর্জিরের সেনাপতির নাম মারকুস। সালওয়ানুস নামে তার এক পুত্র আছে। এই সালওয়ানুস রাজকুমারী হেলেনের প্রতি এত আসক্ত যে, তার জন্য সে জীবন দিতেও প্রস্তুত। সালওয়ানুস রূপসীকন্যা রাজকুমারীকে জীবনে মোট চারবার দেখেছে। যখনই দেখেছে, তার শিরায় প্রেমের আগুন ঝলসে উঠেছে এবং প্রতিবারই তার ভালবাসার আগুন তীব্রতা লাভ করেছে।

রাজকুমারী হেলেনের দর্শন লাভ করা সহজ বিষয় নয়। রাজকন্যাবলে রাজপ্রাসাদে বাস করে। বেষ্টিত থাকে বহুসংখ্যক দাসীর মাঝে। তার ঘনিষ্ট এক বান্ধবী লুসিয়া। দুজনের গলায়-গলায় ভাব। হেলেনের সব গোপন কথা লুসিয়ার জানা। তাদের এই অন্তরঙ্গ সম্পর্কের কথা সকলেই জানে। জানে সালওয়ানুসও। নানা সময়ে নানা উপহার-উপঢৌকন দিয়ে তাকে নিজের প্রতি দুর্বল করে রেখেছে সালওয়ানুস। রাজকুমারীর প্রতি নিজের আসক্তির কথাও ব্যক্ত করেছে লুসিয়ার কাছে। সালওয়ানুসের প্রতি সমবেদনা দেখিয়ে চলছে লুসিয়া।

একদিন সালওয়ানুস লুসিয়ার নিকট তার মহলে গিয়ে হাজির হয়। লুসিয়া তাকে সাদরে স্বাগত জানায় এবং নিজকক্ষে নিয়ে বসায়। দুজনে পাশাপাশি দুটি চেয়ারে বসে কথা বলে।

লুসিয়াও অতিশয় সুন্দরী মেয়ে। চলে রাজকীয় হালে। চেয়ারে বসে মুচকি একটা হাসি দিয়ে বলল– 'এসেছ বলে তোমাকে ধন্যবাদ জানাই। তা হঠাৎ কী মনে করে?'

সালওয়ানুস বলল– 'কয়েকদিন যাবতই তোমাকে একনজর দেখার ইচ্ছা পোষণ করছিলাম। আজ চলে এলাম।'

লুসিয়া হেসে বলল– 'আমি তো রাজকুমারী নই সালওয়ানুস!'

সালওয়ানুস লুসিয়ার শ্রীমান মুখমন্ডলের প্রতি দৃষ্টি বুলিয়ে বললো– 'লুসিয়া, আমি জানি তুমি রাজকুমারী নও; কিন্তু তুমি রাজকুমারীর বান্ধবী। যেহেতু আমি রাজকুমারীর প্রতিটি প্রিয় বস্তু ও প্রিয় ব্যক্তিকে ভালবাসি, তাই তোমাকেও ভালবাসা আমার একান্ত কর্তব্য।'

ঃ কিন্তু সালওয়ানুস, তুমি কি ভেবে দেখেছ, তোমার এই প্রেমের পরিণতি শেষ পর্যন্ত কী হবে?

ঃ তুমি সে চিন্তা করো না।

ঃ কেন?

ঃ প্রধান পাদরি ওয়াদা দিয়েছেন, এ-কাজে তিনি আমাকে পূর্ণ সহযোগিতা দেবেন।

ঃ হ্যাঁ, তা হলে তুমি আশা রাখতে পার।

ঃ আশার এই আলোটুকুই আমার জীবনটাকে ঠিক রেখেছে।

ঃ কিন্তু তুমি তো জান, কাসিসিন তার ভাতিজার জন্য জর্জিরের নিকট প্রস্তাব পাঠিয়েছেন।

ঃ আমি জানি। কিন্তু আমি এ-ও জানি, তিনি সফল হবেন না।

ঃ কীভাবে বুঝলে?

ঃ চলমান যুদ্ধের সমাপ্তি না-ঘটা পর্যন্ত রাজকুমারীর বিয়ে অসম্ভব। সম্রাট জর্জির তার সৈন্যদের অন্তরে জোশ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে রাজকুমারীকে রণাঙ্গনে নিয়ে যেতে চাচ্ছেন।

ঃ তা হলে তো রাজকুমারীর সঙ্গে আমাদেরও সকলকে যেতে হবে।

ঃ অবশ্যই। আমার সৌভাগ্যই বলতে হবে যে, রাজকুমারীর সঙ্গে তুমিও থাকবে।

ঃ তুমিও যুদ্ধে যাবে?

ঃ নিশ্চয়ই যাব। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমার ভাগ্যের তারকা যুদ্ধের মাঝেই চমকাবে।

লুসিয়া মুচকি হেসে বলল– 'খোদা করুন, যেন এমনই হয়।'

ঃ আচ্ছা, তুমি কি কখনও রাজকুমারীর নিকট আমার আলোচনা করেছ?

ঃ হ্যাঁ, একবার করেছিলাম।

ঃ কখন?

ঃ যখন রণাঙ্গনে গমনকারী যোদ্ধাদের তালিকা উপস্থাপন করা হয়েছিল।

ঃ সেই ব্যস্ত সময়ে কি আর বিষয়টির প্রতি সে মনোযোগ দিয়েছে?

ঃ তিনি তালিকাটা খুব মন দিয়ে পড়েছেন।

ঃ খোদা জানেন, স্মরণ আছে কি-না!

ঃ আমার পরামর্শ শোনো। তুমি রাজকুমারীর ভাবনা পরিত্যাগ করো।

ঃ এটা অসম্ভব। রাজকুমারীকে পাওয়া-না-পাওয়ার বিষয়টি এখন আমার অস্তিত্বের সঙ্গে জড়িত।

ঃ কিন্তু রাজকুমারীকে পাওয়া...।

সালওয়ানুস কথা কেটে বলল– 'তুমি তার চিন্তা করো না।'

ঃ তা হলে তোমার আগমনের উদ্দেশ্য?

ঃ আমি একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে এসেছি।

ঃ বলো।

ঃ আমি অনেক দিন যাবত রাজকুমারীর দেখা পাচ্ছি না। তুমি অনুগ্রহ করলে আমার দর্শনাকাঙ্খা পূর্ণ হতে পারে।

ঃ এটা অসম্ভব।

ঃ দেখো, আমার হৃদয়ে আঘাত দিও না।

ঃ তুমিই বলো, আমি তোমাকে কীভাবে এবং কী সাহায্য করতে পারি?

ঃ তুমি রাজকুমারীর ঘনিষ্ট বান্ধবী। তার মনের সব কথা এবং গোপন বিষয় তোমার জানা থাকে। সে কখন কোথায় যায়, তুমি সব জানো। কাছে থেকে না-হোক, দূর থেকে হলেও দেখানোর একটা ব্যবস্থা করো।

ঃ এমন দুঃসাহস আমি দেখাতে পারব না।

সালওয়ানুসের মুখে হতাশার ছায়া নেমে আসে। কিন্তু পরক্ষণেই তার মুখমন্ডল উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। পকেটে হাত ঢুকিয়ে চকচকে রুপার একটি ডিবা বের করে। খুলে ডিবার মধ্য থেকে অতিশয় সুন্দর ও মহামূল্যবান একখানা হার বের করে। লুসিয়া লোভাতুর দৃষ্টিতে হারটার প্রতি তাকিয়ে থাকে। সালওয়ানুস জিজ্ঞেস করে– 'বলো তো, জিনিসটা কেমন?'

ঃ খুব সুন্দর।

ঃ তোমার পছন্দ হয়?

ঃ অনেক পছন্দ হয়।

সালওয়ানুস হারটা লুসিয়ার প্রতি এগিয়ে ধরে বলল– 'নাও, এটি তোমাকে উপহার দিলাম।'

লুসিয়া আপন ডান হাতটা এগিয়ে হারটা হাতে নিয়ে প্রথমে হাতের তালুতে রাখা হারটার প্রতি এবং পরক্ষণে সালওয়ানুসের মুখপানে কৃতজ্ঞতাপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল– 'তোমাকে ধন্যবাদ।'

ঃ আমার প্রতি দয়া করো লুসিয়া! রূপরানীকে একনজর দেখাও। আমার হৃদয়ের তৃষ্ণা নিবারণ করো।

ঃ ঠিক আছে। আমি তোমাকে এক জায়গায় লুকিয়ে রাখব; তুমি সেখানেই চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকবে। ভালবাসার তাড়নায় এমন কোনো আচরণ কোরো না, যা তোমার অপমান এবং আমার অবিশ্বাসের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে।

ঃ তুমি নিশ্চিন্ত থাকো। আমি যথাসম্ভব ধৈর্যের পরিচয় দেব।

ঃ তা হলে শোনো। রাজকুমারী এখনই এখানে আসবে এবং এইমুহূর্তে তুমি ও আমি যে-কক্ষে বসা আছি, এসে এই কক্ষে উপবেশন করবে।

সালওয়ানুসের চেহারাটা জ্বলজ্বল করে ওঠে। বলল– 'আমি জীবনভর তোমার কৃতজ্ঞ থাকব লুসিয়া!'

লুসিয়া আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। বলল– 'আচ্ছা, তাড়াতাড়ি করো, আমার সঙ্গে আসো।'

সালওয়ানুস উঠে দাঁড়ায়। লুসিয়া হাঁটতে শুরু করে। সালওয়ানুস তার পিছনে-পিছনে এগোতে থাকে। উভয়ে কক্ষ থেকে বেরিয়ে একটি সরু গলি অতিক্রম করে এক-এক করে কয়েকটি কক্ষ পেরিয়ে অপর ছোট্ট একটি কক্ষে প্রবেশ করে। তারা এতক্ষণ যে-কক্ষে বসে কথা বলছিল, এটির অবস্থান ঠিক তার পিছনে।

লুসিয়া বলল– 'তুমি এই জানালাটার কাছে বসে থাকো। আমি কক্ষের সবগুলো দরজা-জানালার পর্দা ছেড়ে দিচ্ছি। ফলে কক্ষে এমন অন্ধকার নেমে আসবে যে, রাজকুমারী বা অন্য কেউ এদিককার কোনো দৃশ্য দেখতে পাবে না। তুমি এখান থেকে তাকে মনভরে দেখতে থাকবে।

ঃ বড় উপকার হবে লুসিয়া!

সালওয়ানুস একটি চেয়ারে বসে পড়ে। নিজকক্ষের জানালা দিয়ে অপর

কক্ষে একনাগাড়ে তাকিয়ে থাকে। লুসিয়া সব কটি দরজা-জানালার পর্দা ছেড়ে দিয়ে বেরিয়ে দ্রুত অপর কক্ষে ঢুকে পড়ে। ঠিক তখনই জানতে পারে, রাজকুমারী এসে পড়েছে এবং তার মহলে প্রবেশ করছে। লুসিয়া ছুটে গিয়ে মহলের দরজায় রাজকুমারীকে স্বাগত জানায়। রাজকুমারী মহলে প্রবেশ করে। সঙ্গে বেশ কজন বান্ধবী। তারাও অতিশয় রূপসী। তাদের মাঝে রাজকুমারীকে তারার মেলায় চাঁদ বলে মনে হল।

হেলেন অবর্ণনীয়া ও অতুলনীয়া রূপসী। গোলাকার মুখমন্ডল। কাজল-কালো ডাগর চোখ। সুঠাম, সুডৌল দেহাবয়ব। গন্ডদেশ যেন আগুনের ফুলকি ছড়াচ্ছে। দাঁতগুলো সরু, সমতল ও মুক্তার মতো ধবধবে সাদা। ঠোঁটে সব সময় জেগে থাকে মুচকি হাসির আভা। চেহারার আকর্ষণ এমন যে, একবার দেখতে দেরি, আসক্ত বানাতে বিলম্ব নেই।

লুসিয়া, রাজকুমারী হেলেন ও তার বান্ধবীরা দাসীদের সঙ্গে মহলের বারান্দা ও গলিপথ অতিক্রম করে সেইকক্ষে এসে প্রবেশ করে, যেখানে লুসিয়া ও সালওয়ানুস একটু আগে বসে কথা বলেছিল। হেলেন একটি চেয়ারে বসে পড়ে। সম্মুখের টেবিলে রাখা পাখির পালকের তৈরী সুন্দর একটি হাতপাখা। রাজকুমারী পাখাটা হাতে নিয়ে নিজেই বাতাস করতে শুরু করে। পরিবেশ সহনীয় শীতল হলেও রূপের উত্তাপে রাজকুমারীর শরীরটা ঘামছে।

সালওয়ানুস পার্শ্বের কক্ষের জানালা দিয়ে দেখছে। রূপপ্রদীপের হৃদয়-ঝলসানো আগুন দেখে তার মাথাটা গুলিয়ে গেছে। আত্মহারার মতো মুখ হা করে পলকহীন চোখে প্রেয়সীর মুখপানে তাকিয়ে আছে সালওয়ানুস।

তেইশ.

বেশ ঠাট করে রাজকীয় ভঙ্গিতে চেয়ারে হেলান দিয়ে অর্ধশয়িত অবস্থায় অবস্থান করছে রাজকুমারী। পরিধানের পোশাকটা এতো টাইট ও আকর্ষণীয় যে, তার সুডৌল বাহু, পরিপুষ্ট বক্ষ ও উন্নত স্তনযুগল দর্শকদের চুম্বকের মতো আকর্ষণ করছে। ঘাড় ও বুকের কিয়দাংশ উন্মুক্ত, যা দেখতে যেন আগুনের ফুলকি।

লুসিয়া মুচকি হেসে বলল– 'রাজকুমারীজি, আজ তো এত গরম নেই যে, শরীর ঘামবে এবং পাখার বাতাসে ঘাম শুকোতে হবে।'

রাজকুমারী লুসিয়ার দিকে তাকিয়ে বলল– 'গরম নেই বলছ? আমার তো খুব গরম লাগছে!'

ঃ জানেন, এ তাপ কিসের?

ঃ আমি তো জানি, আজ সূর্যের তাপ বেড়ে গেছে। এ-ছাড়া আর কোনো হেতু আছে না-কি?

ঃ ব্যাপার তা নয়। এটা আপনার রূপের তাপ।

হেলেন মুখ টিপে হাসতে শুরু করে। তার উজ্জ্বল চেহারায় আলোর ঢেউ খেলতে থাকে। এখন তাকে মূর্তিমান আলো বলে মনে হচ্ছে।

সালওয়ানুস জানালার ফাঁক দিয়ে অপলকনেত্রে একনাগাড়ে তাকিয়ে আছে। একটি মুহূর্তও সে নষ্ট করছে না। রূপসীকন্যা রাজকুমারীকে যতই দেখছে, ততই তার আসক্তি বৃদ্ধি পাচ্ছে। হৃদয়ের পিপাসা নিবারণের জন্য রূপরানীকে একনাগাড়ে দেখেই চলেছে সালওয়ানুস।

রাজকুমারী ঘুনপরিমাণও জানে না, নিকট থেকে একজন পুরুষ তাকে দেখছে। জানতে পারলে বিপদ ছিল। দুঃসাহসী দর্শককেও কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হত এবং এই দর্শন-ষড়যন্ত্রে সহায়তাকারিনীর উপরও বিপদ নেমে আসত।

লুসিয়া বলল– 'আপনার ফুলসুন্দর মুখাবয়বে যে-নির্মলতা ও সজীবতা বিদ্যমান, ফুলের মাঝেও তা অনুপস্থিত। আমি যিশুর শপথ করে বলছি, এই চাঁদসুন্দর মুখখানা দেখে কোনো মানুষ বিমোহিত না-হয়ে পারে না।'

অপর এক বান্ধবী বলল– 'তুমি রাজকুমারীকে চাঁদের সঙ্গে তুলনা করছ। চাঁদে ঔজ্জ্বল্য আছে; কিন্তু তার আলোতে আকর্ষণ নেই। সতেজ-সজীব গোলাপ ফুল দেখতে খুব সুন্দর; কিন্তু তাতে বিশেষ কোনো আকর্ষণ থাকে না। আমি তো সব সময়ই ভাবি, আমাদের রাজকুমারীকে কিসের সঙ্গে তুলনা করি। কিন্তু আজও তেমন কোনো বস্তু খুঁজে পাইনি।'

আরেক বান্ধবী মুচকি হেসে বলল– 'ঠিক আছে; আমরা রাজকুমারীকে সৌন্দর্যের চাঁদ বলব।'

প্রথম বান্ধবী বলল– 'না, বরং মূর্তিমান আলো বলি।'

প্রথম বান্ধবী হেসে রাজকুমারীর প্রতি তাকিয়ে বলল– 'দেখুন আপা, বেয়াদব ঘামগুলো বেয়ে-বেয়ে আপনার স্তনযুগলের নিকট এসে পড়েছে। রুমাল দ্বারা ওগুলো মুছে ফেলুন।'

হেলেন পাখাটা টেবিলে রেখে দিয়ে বলল– 'কী আর বাতাস করব? তোমরা বিষয় একটা পেয়েছ। প্রশংসার পুল তৈরি করছ।'

লুসিয়া বলল– 'আপা, বাস্তবতা হল, আপনার রূপের প্রশংসা করে শেষ করা যাবে না। খোদা যা রূপসী আপনাকে বানিয়েছেন না... ।'

হেলেন তার কথা কেটে দিয়ে বলল– '...এমন নারী জগতে আর একজনও জন্মায়নি।'

লুসিয়া বলল– 'আমারও তা-ই ধারণা।'

প্রথম বান্ধবী বলল– 'এখনও তুমি ধারণা করছ! তুমি কি জান না, এ-যাবত যত রাজকুমার আমাদের রাজকুমারীকে একনজর দেখেছে, তারা সবাই তার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েছে?'

দ্বিতীয় বান্ধবী বলল– 'এটা বাস্তব কথা। শুধু আসক্ত নয়, যে আমাদের রাজকুমারীকে একবার দেখে, পরবর্তী সময়ে সে তার দর্শন-কামনায় জীবন বিলিয়ে দিতে প্রস্তুত হয়ে যায়।'

লুসিয়া : আর বেচারা সালওয়ানুস...।

প্রথম বান্ধবী : তার অবস্থা তো শোচনীয়।

লুসিয়া : বেচারার অবস্থা খুবই খারাপ। রাজকুমারী যদি সান্ত্বনা না দেন, তা হলে হতভাগা তার সাধের জীবনটা খুইয়েই বসবে।

রাজকুমারী : এবার বুঝেছি।

লুসিয়া : কী বুঝেছেন আপা?

রাজকুমারী : তোমরা সবাই সালওয়ানুসের সঙ্গে দরবার করেছ। তাই তার করুণ অবস্থা বর্ণনা করছ।

প্রথম বান্ধবী : যিশুর শপথ! সালওয়ানুসের সঙ্গে আমার কোনো সাক্ষাৎ হয়নি। আমাকে সে তার অবস্থারও বর্ণনা দেয়নি। আমি শুনেছি, আপনার প্রেমে পাগল হয়ে তার অবস্থা শোচনীয় রূপ ধারণ করেছে।

লুসিয়া : আমি তাকে দেখেছি বটে; কিন্তু সে জানে, আপনার সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা রয়েছে। তাই আমাকে কিছু বলার সাহস তার হয়নি। তবে, আমি দেখে বুঝেছি, তার অবস্থা খুবই খারাপ।

রাজকুমারী : ওসব এখন রাখো। বাহিনী রণাঙ্গন অভিমুখে রওনা হচ্ছে। আমাকেও সঙ্গে যেতে বলা হচ্ছে।

লুসিয়া : শুনেছি, মুসলমানরা নাকি তারাবলিস জয় করে নিয়েছে?

ঃ তুমি ঠিকই শুনেছ। এখন তারা আফ্রিকার বিখ্যাত নগরী সাবতিলা অভিমুখে অগ্রসর হচ্ছে।

ঃ কিন্তু রাজকুমারীজি, আপনি কি জানেন, মুসলমান কত হিংস্র, অসভ্য ও অত্যাচারী জাতি?

ঃ খুব ভালোভাবেই জানি। কিন্তু প্রধান পাদরি চাচ্ছেন আমি যেন অবশ্যই রণাঙ্গনে উপস্থিত থাকি।

ঃ আপনি 'না' বলে দিলেই তো হয়।

ঃ তা সম্ভব নয়। সম্রাট পাদরির মতে একমত।

ঃ তা হলে তো না-গিয়ে উপায় নেই।

ঃ অবশ্যই যেতে হবে। খ্রিস্টানদের অব্যাহত পরাজয়ের কারণে প্রধান পাদরি ও মহান সম্রাট এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।

লুসিয়া মুচকি হেসে বলল– 'প্রধান পাদরি ও সম্রাট দুজনে মিলে বোধহয় চিন্তা করেছেন, আপনি রণাঙ্গনে উপস্থিত থাকলে খ্রিস্টানদের মনোবল চাঙ্গা থাকবে এবং মুসলমানরা যতই বীরত্ব প্রদর্শন করুক, তারা জীবন বাজি রেখে যুদ্ধ করবে– পলায়নের কল্পনাও করবে না।'

ঃ হয়ত তা-ই।

প্রথম বান্ধবী বলল : 'ব্যাপারটি এ-রকমই। কারণ, সৈন্যরা যখন জানতে পারবে, আফ্রিকার হুর, সাবতিলা নগরীর রূপের দেবী ও সৌন্দর্যের আধার রাজকুমারী বাহিনীর সঙ্গে আছেন, তখন জানবাজ সৈনিকরা শক্তির চেয়েও বেশি লড়বে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, রাজকুমারী রণাঙ্গনে উপস্থিত থাকলে আমাদের বাহিনী মুসলমানদের পরাজিত করে মিসর ও সিরিয়া জয় করেই ফেলবে।

লুসিয়া বলল– 'কিন্তু রাজকুমারী ও আমরা সকলে হিংস্র মুসলমানদের আকৃতি দেখে ঠিক থাকতে পারবও কি-না কে বলবে?

দ্বিতীয় বান্ধবী : আমি তো তাদের ভয়ংকর আকৃতি দেখে মরেই যাব।

রাজকুমারী : ব্যাপার তেমন নয়। মুসলমানরাও মানুষ। তবে হ্যাঁ, তারা হিংস্র। আর সে-কারণে তাদের আকৃতি অবশ্যই ভয়ংকর হবে। আমার তো তাদের সামনে যেতেই ইচ্ছে হয় না।

লুসিয়া : তা হলে মহান সম্রাটকে বিষয়টি বলেন না কেন?

ঃ বললে আমার অপমান হবে। সবাই বলাবলি করবে, আমি মুসলমানদের ভয় পাই। অথচ, সকলের কাছে আমি বীরাঙ্গনা হিসেবে পরিচিতা।

ঃ কিন্তু খোদা না করুন, যদি যুদ্ধে আমরা পরাজিত হই, তখন কী হবে?

ঃ মহান সম্রাট ও প্রধান পাদরির বিশ্বাস, আমি বাহিনীর সঙ্গে থাকলে খ্রিস্টানরা কক্ষনো পরাজিত হবে না।

ঃ প্রধান পাদরিও কি যাবেন?

ঃ হ্যাঁ, তিনিও অন্য অনেক পাদরিকে সঙ্গে নিয়ে যাবেন।

ঃ ব্যস তা হলে যান; কোনো সমস্যা হবে না।

দ্বিতীয় বান্ধবী : তার কারণ, প্রধান পাদরি উপস্থিত থাকলে খোদা কল্যাণ

অবতরণ করবেন। আমাদের খোদা ও তাঁর পুত্র মুসলমানদের উপর গজব আপতিত করবেন।

লুসিয়া : তুমি ঠিকই বলেছ। প্রধান পাদরি যদি অভিশম্পাত করেন, তা হলে মুসলমানরা নিশ্চিত ধ্বংস হয়ে যাবে।

রাজকুমারী : এই ভাবনা থেকেই আমি মনে শক্তি পাচ্ছি আর এ-কারণেই আমি বাহিনীর সঙ্গে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

দ্বিতীয় বান্ধবী : আসলে প্রধান পাদরি চাচ্ছেন, বিশ্বময় রাজকুমারীর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ুক এবং সমগ্র খ্রিস্টানজগতে প্রচার হয়ে যাক, রাজকুমারী হেলেনের কল্যাণে আফ্রিকানদের জয় হয়েছে।

লুসিয়া : এ-ও একটা ব্যাপার বটে। তুমি চমৎকার তাৎপর্য বের করেছ। প্রধান পাদরি রাজকুমারীকে অত্যন্ত স্নেহ করেন।

রাজকুমারী : আমি তা স্বীকার করি। তিনি কখনও কারও নিকট যান না। কিন্তু দুই-তিন দিন পরপর আমার নিকট আসেন। তিনি একজন পবিত্রহৃদয় মানুষ। আচ্ছা লুসিয়া, এখন তোমরা প্রস্তুতি গ্রহণ করো। অন্যান্য বান্ধবীদেরও প্রস্তুত করো। আর খোদার নিকট বিজয়ের জন্য প্রার্থনা করো।

ঃ আপনার আদেশ শিরোধার্য। কিন্তু আপা, আজ আপনার মনটা একটু খারাপ মনে হচ্ছে। কারণ কী?

ঃ আমার হৃদয় মুসলমানদের মোকাবেলায় যেতে ভয় পাচ্ছে। জানি না তার কারণ কী?

ঃ ওদের হিংস্রতার কাহিনী শুনেছেন তো, তাই।

ঃ তা ছাড়া খ্রিস্টানদের পরাজয়েরও আশঙ্কা আছে।

প্রথম বান্ধবী : এই আশঙ্কা একদম মনে স্থান দেবেন না। প্রধান পাদরির মতে বর্তমানে খ্রিস্টানদের পরাজয় অসম্ভব।

রাজকুমারী : খোদার নিকট এটাই আমাদের কামনা। আচ্ছা, আমি এখন যাচ্ছি। আসলাম তো অনেকক্ষণ হয়ে গেল।

রাজকুমারী উঠে রওনা দেয়। তার বান্ধবী ও দাসীদের বহর তার পিছনে-পিছনে হাঁটতে শুরু করে। রাজকুমারী লুসিয়ার মহল থেকে বিদায় নিয়ে নিজ প্রাসাদে চলে যায়।

রাজকুমারী বিদায় নিয়ে চলে গেলে লুসিয়া সালওয়ানুসের নিকট গিয়ে দেখে, লোকটি এখনও জানালার কাছে বসে একনাগাড়ে তাকিয়েই আছে। লুসিয়া বিস্মিত হয় যে, লোকটা এখনও কী দেখছে! সে উচ্চৈঃস্বরে বলল– 'সালওয়ানুস, এখনও তুমি কী দেখছ?'

সালওয়ানুস লুসিয়ার কণ্ঠ শুনে চমকে ওঠে। তড়াক করে মোড় ঘুরিয়ে অভিভূতের মতো তাকিয়ে লুসিয়াকে চুপ থাকতে ইঙ্গিত করেই আবার মুখ ফিরিয়ে জানালার ফাঁক দিয়ে তাকাতে শুরু করে।

লুসিয়া ভাবে, বোধহয় তার খাস কামরায় অপর কোনো রূপসী মেয়ে এসেছে। সালওয়ানুস অভিভূত হয়ে তাকিয়েই আছে। লুসিয়া এগিয়ে তার নিকটে গিয়ে দাঁড়ায় এবং উঁকি মেরে গ্লাসের মধ্য দিয়ে অপর কক্ষে তাকায়। কিন্তু ওখানে কেউ নেই, কক্ষ শূন্য। চোখ ফিরিয়ে এনে সালওয়ানুসের প্রতি তাকায়। সালওয়ানুস অপলকচোখে একনাগাড়ে তাকিয়েই আছে। লুসিয়ার বিস্ময়ের সীমা রইল না। নিজের কোমল ডান হাতটা আলতোভাবে সালওয়ানুসের কাঁধের উপর রেখে দেয়। সালওয়ানুস আবারও চমকে ওঠে। মাথা ঘুরিয়ে লুসিয়ার প্রতি তাকায়। লুসিয়া মিটিমিটি হাসছে। বলে– 'এখনও কাকে দেখছ সালওয়ানুস!'

সালওয়ানুস অস্ফুটস্বরে স্বাভাবিক কণ্ঠে জবাব দেয়– 'রাজকুমারীকে।'

লুসিয়া বলল– 'চুপ থাকো, কথা বলো না। অন্যথায় রাজকুমারী টের পেয়ে যাবে।'

খানিক অপেক্ষা করে সালওয়ানুসের চৈতন্য ফিরিয়ে আনতে লুসিয়া ক্ষীণকণ্ঠে জিজ্ঞেস করে– 'রাজকুমারী কোথায় সালওয়ানুস?'

'কেন, তোমার কক্ষে উপবিষ্ট!' বলেই সালওয়ানুস পুনরায় উঁকি দেয়। কিন্তু এবার সঙ্গে-সঙ্গে চোখ সরিয়ে এনে লুসিয়ার প্রতি তাকিয়ে বলল– 'চলে গেছে!'

লুসিয়া খিলখিল করে হেসে ওঠে– 'এখন গেছে! গেছে তো অনেক আগে।'

ঃ মিথ্যা বললে কেন? আমি এইমুহূর্ত পর্যন্ত তাকে দেখছিলাম!

ঃ আর আমি তাকে বিদায় দিয়ে মহল থেকে বের করে তোমার কক্ষে এসেছি।

ঃ তা হলে ওখানে এতক্ষণ কে উপবিষ্ট ছিল?

ঃ তোমার কল্পনা তোমার রূপবতী প্রেয়সীর প্রতিচ্ছবিটাকে ওখানে বসিয়ে রেখেছিল।

ঃ তা-ই হবে। আমি তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ লুসিয়া, অনেক-অনেক কৃতজ্ঞ। এর আগে কোনোদিন আমি রাজকুমারীকে এত কাছে থেকে এমন মনভরে দেখিনি। উহ! কী রূপসী! কী সুন্দরী! চেহারাটা কত আকর্ষণীয়। গায়ের লাল-সাদা রংটা কত চিত্তাকর্ষী! চোখ দুটো কেমন মায়াবী! মাথার কোকড়ানো রেশম-কোমল চুলগুলো সোনার তারের ন্যায় কেমন ঝিকমিক করছে। আর...।

লুসিয়া সালওয়ানুসকে থামিয়ে দিয়ে বলল– 'থাক, আর বলতে হবে না। আমাদের রাজকুমারীর রূপের প্রশংসা করে তুমি শেষ করতে পারবে না।'

ঃ তুমি ঠিকই বলেছ। রাজকুমারী হেলেনের রূপের বর্ণনা দেয়া আসলেই সাধ্যের অতীত। আমি যিশুর কসম খেয়ে বলতে পারি, এমন মায়াবী, চিত্তহারী ও মনকাড়া চোখ আমি জীবনে এ-ই প্রথম দেখলাম। তার আঁখিযুগল থেকে বিকীর্যমান কিরণ প্রভাত-কিরণের চেয়েও বেশি মনোমুগ্ধকর। আর যখন দু-ঠোঁটের ফাঁক গলিয়ে হাসে, তখন শ্বেতশুভ্র দন্তরাজির ঔজ্জ্বল্যে যেন তড়িৎ চমকায়।

লুসিয়া আবারও সালওয়ানুসকে থামিয়ে দেয়– 'আমাকে ক্ষমা করো; তুমি তো চৈতন্যই হারিয়ে ফেলেছিলে।'

ঃ চৈতন্য... হ্যাঁ, রাজকুমারীর রূপ দেখতে-দেখতে আমার হুঁশ-জ্ঞান হারিয়ে যেতে বসেছিল। ভাবি, যার কপালে জুটবে, সে কতই-না ভাগ্যবান হবে।

ঃ ও তো যুদ্ধে যাচ্ছে।

ঃ জানি, আমিও যাচ্ছি। সম্ভবত তুমিও যাবে।

ঃ রাজকুমারী গেলে আমাকেও যেতে হবে! আমি তার লেজুড়। ও যেখানে যাবে, আমিও সেখানে যেতে বাধ্য।

ঃ ভালো হবে। তুমি উপস্থিত থাকলে আমি ওখানে তাকে বারবার দেখতে পাব।

ঃ বড় কঠিন ব্যাপার। আজ অনেক ঝুঁকি মাথায় নিয়ে দেখালাম। রাজকুমারী এখানে যতক্ষণ ছিল, আমি পুরো সময়টাই ভয়ে-ভয়ে কাটিয়েছি। যদি তার মনে তোমার উপস্থিতির বিন্দুপরিমাণ সন্দেহ জাগত, তা হলে আমার খবর ছিল।

ঃ কেন সন্দেহ হবে?

ঃ যাক, হয়নি এটাই সত্য। এখন আমি রাজকুমারীর নিকট যাচ্ছি।

সালওয়ানুস উঠে দাঁড়ায়। পুনরায় লুসিয়াকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে চলে যায়। খানিক পর লুসিয়া রাজপ্রাসাদ অভিমুখে রওনা হয়।

রবিবারের অপেক্ষায় অধীর আগ্রহে প্রহর গুণছিল সাবলিতার অধিবাসীরা। অবশেষে এসে পড়েছে কাঙ্ক্ষিত সেই দিনটি। রাত পোহাবামাত্র শাহী গির্জায় জনতার ঢল এসে ভিড় জমায়। সাজিয়ে-গুছিয়ে গির্জাটাকে পরিপাটি করে রেখেছেন প্রধান পাদরি থেভঢোস। এখন গির্জাটা কাঁচা সোনার মতো ঝলমল করছে। পাদরির এই রুচিবোধ দেখে জনতা যারপরনাই অভিভূত ও আনন্দিত হয়ে পড়ে।

এ-গির্জায় যে-কারও প্রবেশাধিকার নেই। তাই সীমিত কিছু লোক ভিতরে প্রবেশ করার সুযোগ পায় মাত্র। থেভঢোস জনতাকে উত্তেজিত করার লক্ষ্যে দীর্ঘ এক ভাষণ প্রদান করেন। যার সারমর্ম নিম্নরূপ–

'মুসলমানরা আমাদের যিশুর পবিত্র ও বরকতময় জন্মভূমিকে দখল করে নিয়েছে। জেরুজালেমের ন্যায় পবিত্রভূমি হিংস্র আরবদের অধীন হয়ে গেছে। এতে খোদার পুত্র অনেক কষ্ট পাচ্ছেন। আমাদেরকে মুসলমানদের অপবিত্র পদচারণা থেকে এই পবিত্র ভূমিকে উদ্ধার করতেই হবে। মুসলমানদের সঙ্গে আমাদের যুদ্ধ করতে হবে। এই যুদ্ধে যারা প্রাণ হারাবে, তারা শহীদ হবে এবং স্বর্গে প্রবেশ করবে।'

খ্রিস্টানদের মাঝে প্রবল উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। থেভঢোস কালো কাঠের বড় একটা ক্রুশ বের করেন। তার উপরিভাগে রক্ত দ্বারা যোগচিহ্ন অঙ্কিত। চারধার মুক্তাখচিত। থেভঢোস ক্রুশটা হাতে নিয়ে বললেন– 'এই ক্রুশে সেই পবিত্র কাঠটির পাত বসানো আছে, যার উপর খোদার পুত্রকে শূলিবিদ্ধ করা হয়েছিল। এই লাল চিহ্নটা যিশুর পবিত্র রক্তের দাগ। খ্রিস্টানগণ, তোমরা কাঁদো, মন ভরে কাঁদো।'

সকল খ্রিস্টান হাউমাউ করে কাঁদতে শুরু করে। থেভঢোস নিজেও কাঁদছেন। সবাই অনেকক্ষণ পর্যন্ত কাঁদে। ক্রন্দনরোল কমে এলে প্রধান পাদরি প্রার্থনার মাধ্যমে ভাষণ সমাপ্ত করেন।

বিশ হাজার খ্রিস্টান সৈন্য এবং সমগ্র বাহিনীর রসদ-সামান ভোরেই রওনা হয়ে গেছে।

উপাসনাশেষে সম্রাট জর্জির রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করেন। তিনি রাজকীয় পোশাক পরিধান করে বেরিয়ে আসেন। সঙ্গে আপন রূপসীকন্যা রাজকুমারী হেলেন। রাজকুমারী আজ সেজেছে অপরূপ সাজে। গায়ের পুরোটা পোশাক মুক্তাজড়ানো এবং সোনালি লেসসাঁটানো। আলোয় ঝলমল করছে পোশাকটি। রাজকুমারীর মাথায় অর্ধবৃত্তের মতো অতিশয় সুদর্শন রাজমুকুট। পোশাক, অলংকার ও মুকুট তার রূপ-সৌন্দর্যকে বাড়িয়ে তুলেছে বহুগুণ। মেয়েটি আপাদমস্তক এমনভাবে ঝিকমিক করছে যে, তার প্রতি তাকানোই কঠিন হয়ে পড়েছে। রাজকুমারীর মুখমন্ডল আজ অনাবৃত। রূপের ছটা চারপাশকে আলোকিত করে তুলেছে। হাজার-হাজার চোখ তার নির্দোষ রূপ ও শ্রীমান মুখন্ডলের উপর নিবদ্ধ।

খানিক পর একদল পাদরি এসে হাজির হন। সকলের হাতে রুপার আংটি। মহামূল্যবান পাথরখচিত আংটিগুলো জ্বলজ্বল করছে। মেখে-আসা দামি সুগন্ধিতে মাতোয়ারা হয়ে উঠেছে গোটা পরিবেশ। পাদরিগণ অনুচ্চস্বরে কী যেন পাঠ করছেন। তারা প্রথমে সম্রাটকে এবং পরে রাজকুমারীকে কুর্নিশ

জানান। তারপরই সম্মুখপানে হাঁটতে শুরু করেন। তাদের পিছনে-পিছনে সম্রাট এবং রাজকুমারীও হাঁটতে শুরু করেন। গির্জার সীমানার বাইরে সৈনিকগণ অস্ত্রসজ্জিত হয়ে প্রস্তুত দাঁড়িয়ে আছে। পথের দুধারে উৎসুক জনতার প্রচণ্ড ভিড়।

সম্রাট জর্জির গির্জার প্রধান দরজায় এসে উপস্থিত হলে প্রধান পাদরি তার এবং রাজকুমারীর গলায় সোনার হার পরিয়ে দেন। তার পর একটি লাল ক্রুশ সম্রাটের এবং একটি রাজকুমারীর বুকে সেঁটে দেন, যেন গির্জার পক্ষ থেকে এই দুজনকে ধর্মযোদ্ধার স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে। এবার প্রধান পাদরি থেভঢোসও তাদের সঙ্গী হয়ে যান। যখন তারা উৎসুক জনতা ও বাহিনীর নিকটে পৌছয়, তখন তাদের সম্মানার্থে সকলে মাথা নত করে ফেলে।

সর্বপ্রথম সম্রাট জর্জির ঘোড়ায় আরোহণ করেন। বাহিনীতে চাঞ্চল্য শুরু হয়ে যায়। একে-একে সকলে আপনাপন বাহনে চড়ে বসে। রাজবাহন এগোতে শুরু করে। প্রায় পঁচিশ হাজার সৈন্য এগিয়ে যাওয়ার পর এবার রাজকুমারীর রথ আসে। এই সেই রথ, যাতে রাজকুমারী সচরাচর চলাচল করে থাকে। রথের সঙ্গে পঞ্চাশটি ঘোড়া জুড়ে দেওয়া হয়েছে। সেগুলোতে রাজকুমারীর দাসীরা আরোহণ করছে।

রাজকুমারী হেলেন রথে চড়ে বসলে রথ চলতে শুরু করে। পিছনে রওনা হয় রাজকুমারীর বান্ধবীদের রথ। তার পর দাসীদের বাহন। তার পর আবার সেনাবহর। পঞ্চাশ হাজার সৈন্য রওনা হওয়ার পর পাদরিগণ খচ্চরে আরোহণ করেন। শোভাযাত্রার পুরোভাগে মূল্যবান যিনসজ্জিত একটি খচ্চর। প্রধান পাদরি থেভঢোস তাতে আরোহণ করেন। তার পিছনে-পিছনে সাদা পোশাক পরিহিত সাধারণ পাদরিরা চলতে শুরু করে। পাদরিদের কাফেলার পর অবশিষ্ট সেনাদল রওনা হয়।

এই বাহিনী নগরীর বড়-বড় হাট-বাজারের মধ্য দিয়ে পথ অতিক্রম করতে শুরু করে। প্রতিটি রাস্তা ও বাজারে বিপুল জনতার প্রচন্ড ভিড়। প্রতিটি সড়ক মানুষে ঠাসা। নারী ও শিশুরা প্রতিটি বাসগৃহ ও দোকানের ছাদে উঠে দেখছে। উৎসুক জনতার সকলের হাতে ফুল। তারা তাদের রাজা ও রাজকন্যার গায়ে ফুলবৃষ্টি বর্ষণ করছে। বিশেষভাবে রাজকুমারীর রথ ফুলে-ফুলে ভরে গেছে। হৃদয়কাড়া সামরিক বাজনা বাজছে। সাবতিলার অধিবাসীরা জয়ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস মুখরিত করে তোলে– 'সম্রাট জর্জিরের জয় হোক– মুসলমান নিপাত যাক'।

জনতা যখন সম্রাট জর্জিরের বুকে ক্রুশ দেখল, তখন তাদের উত্তেজনা বেড়ে যায়। তার পর রাজকুমারীকে দেখার পর তারা যেন পাগলের মতো চিৎকার জুড়ে দেয়। রাজকুমারী তাকিয়ায় বসে ঠেস দিয়ে এমনভাবে বসে আছে যে, তার সুপুষ্ট বক্ষ স্পষ্ট চোখে পড়ছে। তার বুকে সাঁটা লাল ক্রুশটিও পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। রাজকুমারীর বুকে ক্রুশ দেখামাত্র নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের উত্তেজনা আরও বেড়ে যায়। কিন্তু টগবগে পাতিলের ফেনার মতো সেই উত্তেজনা সহসাই স্তিমিত হয়ে যায়। কারণ, যুদ্ধে অংশগ্রহণের সাহস তাদের নেই। এই উত্তেজনা-জোশ সাময়িক ও লৌকিক।

আফ্রিকার সৈন্যসংখ্যা এক লাখ। তাই তারা দুপুর পর্যন্ত সাবতিলার নানা সড়ক ও হাট-বাজার অতিক্রম করতে থাকে। বহর যেন শেষই হচ্ছে না। বাহিনীর সর্বশেষ সৈনিকটি অতিক্রান্ত হওয়ার পর খ্রিস্টানরা বলল– 'আমাদের এই বিশাল বাহিনী মুসলমানদের নিশ্চিহ্ন করে ফেলবে।'

আফ্রিকার সম্রাট জর্জির এক লাখ বিশ হাজার বীর সৈনিক নিয়ে মুসলমানদের নিঃশেষ করার লক্ষ্যে সাবতিলার দুর্গ থেকে রওনা হন।

চব্বিশ.

তারাবলিস ত্যাগ করে সাবতিলার উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছে ইসলামী বাহিনী। তারা যাবিলা থেকে যে-বিন্যাসে তারাবলিস এসেছিল, এখন একই বিন্যাসে সাবতিলা অভিমুখে অগ্রসর হচ্ছে।

সকলের সামনে আব্দুল্লাহ ইবনে ওমরের পাঁচ হাজার মুজাহিদের কাফেলা। তার পর ইবনে আব্বাস, ইবনে জাফর, হাসান ও হুসাইন (রা.)-এর তিন হাজারের বাহিনী পথ চলছে। এদের পিছনে অগ্রসর হচ্ছে নারী ও শিশুদেরসহ সরোয়ারের এক হাজার সৈনিকের বহর। সকলের পিছনে সেনাপতি আব্দুল্লাহ ইবনে সা'দ অবশিষ্ট সৈন্যদের নিয়ে এগিয়ে চলছেন। তাঁর সঙ্গে আছে অনুগত খ্রিস্টান দুর্গপতি আরসানুস।

এক কমান্ডার তিন-চার মাইল পথ এগিয়ে যাওয়ার পর রওনা হয়েছেন আরেক কমান্ডার। তাই প্রতিটি ইউনিট তিন-চার মাইলের ব্যবধানে অগ্রসর হচ্ছে। ইসলামী বাহিনী বিপুল উদ্দীপনা ও প্রতাপের সঙ্গে এগিয়ে যাচ্ছে। নিজভূমি থেকে বহুদূরে শত্রুর দেশে বিপুলসংখ্যক শত্রুসেনার মুখোমুখি হতে যাচ্ছে, এমন ভাবনা বাহিনীর একজনেরও নেই।

সকলেরই হৃদয়ে জিহাদের স্পৃহা, শাহাদাতের তামান্না। তাই জীবনের মায়া

ত্যাগ করে আফ্রিকার মতো বিপজ্জনক দেশে বিপুলসংখ্যক শক্তধর শত্রুসেনার মোকাবেলায় নির্ভয়ে এগিয়ে যাচ্ছে তারা। তারা জানে, আল্লাহ পাক সৃষ্টিকালেই প্রত্যেক মানুষের মৃত্যুর সময়, ধরন ও স্থান নির্ধারণ করে রেখেছেন। আর তিনি যা লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন, তাতে পরিবর্তন সাধন সম্ভব নয়। পৃথিবীতে এমন কোনো শক্তি নেই, যে মহান আল্লাহর কোনো সিদ্ধান্তে ব্যত্যয় ঘটাতে পারে। তাই মুসলিম সৈনিকদের হৃদয়ে কোনো ভাবনাই নেই।

মুসলমানের কাছে সবচে বড় বিষয় হচ্ছে, তারা বিশ্বাস করে, তাদের জীবন-মৃত্যু দু-ই আল্লাহর জন্য। তারা জানে, দুনিয়ার জীবন দিনকয়েকের ব্যাপার মাত্র। জগত মুমিনের কারাগার। তাই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে স্থায়ী ঠিকানা জান্নাতে পৌঁছে যাওয়াই উত্তম। মুসলমান জানে, দুনিয়া কষ্টের জায়গা– নিশ্চিন্তে ও শান্তিতে বসবাস করার স্থান নয়। মানুষ যতদিন দুনিয়াতে বেঁচে থাকে, প্রতিটি মুহূর্ত কোনো-না-কোনো ভাবনা, দুশ্চিন্তা ও অশান্তির মধ্যেই অতিবাহিত হয়। কোনো মানুষই পরিপূর্ণ শান্তিতে থাকতে পারে না। কিন্তু তার পরও দুনিয়াপাগল লোকেরা কোনো অবস্থাতেই দুনিয়া ত্যাগ করতে সম্মত হয় না। যারা দুনিয়াকে স্থায়ী আবাস মনে করে, দুনিয়া যাদের লক্ষ্য; বাস্তব সত্য হচ্ছে তারা কাপুরুষ হয়ে থাকে, তারা মৃত্যুকে ভয় করে। কিন্তু, তারা জানে না, মৃত্যুকে এক মুহূর্তের জন্যও পিছিয়ে নেওয়ার শক্তি কারও নেই। কিন্তু মুসলমান না মৃত্যুকে ভয় করে, না দুনিয়া ত্যাগ করতে অসম্মতি প্রকাশ করে। মুসলমান মাত্রই জানে, যারা জিহাদে শহীদ হয়, আল্লাহ তাদেরকে জান্নাতুল ফেরদাউস নসীব করেন। সে-কারণে তারা বেঁচে থাকার চেয়ে শাহাদাতের মৃত্যুকে প্রাধান্য দেয়।

পঁচিশ.

মোটকথা, মুসলিম বাহিনী অতিশয় নির্ভাবনায় আফ্রিকার অভ্যন্তরে ঢুকতে থাকে। এখন তারা এমন একটি অঞ্চল অতিক্রম করছে, যেটি নানা বিস্ময়কর বস্তুতে পরিপূর্ণ।

একদিন মুসলিম বাহিনী বিস্তৃত এক মাঠে ছাউনি ফেলে। সরোয়ার যে জায়গায় অবস্থান গ্রহণ করেছে, সেখানে কয়েকটি গাছ আছে। গাছগুলোর পাতা প্রায় চার ইঞ্চি পরিমাণ গোলাকার এবং অত্যন্ত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। গাছগুলো বেশ উঁচু ও ঝোপালো।

সরোয়ারের তাঁবুটা স্থাপিত হয়েছে একটি গাছের নিচে। তার গোলাম আগুন জ্বালিয়ে খাবার রান্না শুরু করে। আগুনের শিখা উঁচু হলে আগুনের তাপ যখন গাছটির ডাল-পাতা পর্যন্ত পৌঁছে যায়, তখন সেগুলো থেকে ফোঁটা-ফোঁটা পানি পড়তে শুরু করে, যেন বৃষ্টি হচ্ছে। কয়েক ব্যক্তি গাছের নিচ থেকে সরে আকাশের দিকে তাকায়। আকাশ পরিষ্কার। কোনো মেঘ নেই, বৃষ্টি নেই। মুসলমানরা বুঝে ফেলে, এই বৃক্ষটিরই বৈশিষ্ট্য যে, আগুনের উত্তাপ পেলে এর ডাল-পাতা থেকে পানি নির্গত হয়। এমন একটি গাছের সাক্ষাৎ পেয়ে মুসলমানরা যারপরনাই বিস্মিত ও আমোদিত হয়।

সরোয়ারের গোলাম গাছটির নিচ থেকে সরে অন্যত্র চুলা বসিয়ে রান্না সারে। পরে জানা যায়, আফ্রিকায় এই গাছটি 'ক্রন্দনবৃক্ষ' নামে পরিচিত এবং এর সৃষ্টিগত প্রকৃতিই হচ্ছে, তার নিচে আগুন জ্বালালে সে কাঁদতে শুরু করে ও তার ডাল-পাতা থেকে বৃষ্টির ফোঁটার মতো অশ্রু ঝরতে থাকে।

এদিন সরোয়ার আগেভাগে রাতের খাবার সেরে ঈশার আগেই নারীক্যাম্পের দিকে রওনা দেয়।

জোৎস্না রাত। চাঁদের আলোয় চারদিক ফকফক করছে। সরোয়ার দেখে এক তাঁবুর সম্মুখে এক আরবকন্যা দাঁড়িয়ে আছে। অন্য কোনো মেয়ে হবে মনে করেছে সে। কিন্তু গভীরভাবে লক্ষ্য করে দেখে, মেয়েটি তারই হবু স্ত্রী সালমা। সরোয়ার পা টিপে-টিপে ধীরে-ধীরে প্রেয়সীর দিকে এগিয়ে যায়। নিকটে পৌঁছে আলতোপরশে তার কোমল কাঁধের উপর হাত রাখে।

কিসের যেন ধ্যানে মগ্ন ছিল সালমা। হঠাৎ ভয় পেয়ে তড়াক করে লাফিয়ে উঠে খঞ্জরটা কোমরবন্ধ থেকে বের করে হাতে নেয় এবং আক্রমণের লক্ষ্যে মোড় ঘুরিয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু মোড় ঘুরিয়ে যেইমাত্র তাকায়, দেখে, সরোয়ার দাঁড়িয়ে। সালমা দম নিয়ে মুচকি হেসে বলে ওঠে- 'বেঁচে গেলেন!'

সালমার মুখমন্ডল চাঁদের আলোর মতো ঝলমল করছে। এ যেন আরেক চাঁদ। সরোয়ার তার মুখপানে তাকিয়ে বলল- 'ভয়ে তো লাফিয়ে ওঠলে!'

ঃ ভয় পেয়েছি সত্য। কেউ এসে এভাবে হঠাৎ কাঁধে হাত রাখলে কে-না ভয় পায়। কিন্তু তোমার ভাগ্য প্রসন্ন না-হলে মজাটাও বুঝতে ভালো। আমার খঞ্জর...।

সরোয়ার সালমার কথা কেটে দিয়ে মুচকি হেসে বলল- 'এই কোমল হাতের খঞ্জর দ্বারা আমাকে ভয় দেখাতে চেয়েছিলে!'

ঃ শুধু ভয় দেখানো নয়- রীতিমতো আক্রমণ করারই মনস্থ করেছিলাম। কিন্তু ভাগ্য ভালো যে, আমি আপনাকে দেখে ফেলেছি আর আপনি বেঁচে গেলেন।

সরোয়ারের দৃষ্টি রূপসীকন্যা সালমার মুখমন্ডলে নিবদ্ধ– 'অন্যথায় তুমি আমাকে খুন করে ফেলতে!'

সালমা থমকে যায়– 'আল্লাহ না করুন। কিন্তু, আপনি এমন ভুলটা কেন করলেন?'

ঃ আমি মনে করতাম, তুমি শুধু রূপসীই নও– সাহসিনীও।

সালমা মুচকি হেসে বলল– 'কেন মনে করতেন? আপনি তো নিজেকে ছাড়া আর কাউকে বীর মনে করেন না?'

ঃ আমি বীর নই।

ঃ আমি ভালো করেই জানি, আপনি অনেক বড় বীর।

ঃ তবে আমি বড়ই ভাগ্যবান।

ঃ আপনি বোধহয় তারাবলিস জয় করে অনেক বড় হয়ে গেছেন?

ঃ তুমি মনে হয় আমার প্রতি ক্ষেপে গেছ?

ঃ ক্ষেপেছি? ...আচ্ছা বলুন তো, এ-সময়ে আপনি এখানে এলেন কেন?

ঃ একটা কথা বলতে।

ঃ কী কথা?

ঃ আমার তাঁবুর নিকট একটি বিস্ময়কর গাছ আছে।

ঃ কেমন গাছ?

ঃ নিচে আগুন জ্বালালে গাছটির ডাল-পাতা থেকে পানি ঝরতে শুরু করে।

ঃ বিস্ময়কর তো!

ঃ তুমি দেখবে?

সালমা দুষ্টুচোখে সরোয়ারের প্রতি তাকিয়ে বলল– 'মাফ করুন; আমি বুঝে ফেলেছি।'

ঃ কী বুঝেছ?

ঃ আপনার মতলব। আপনি চাচ্ছেন, আমি আপনার সঙ্গে যাই।

ঃ কিন্তু তুমি...।

সালমা কথা কেটে মুচকি হেসে বলল– 'আমার সময় নেই।'

ঃ এখানে দাঁড়িয়ে তুমি কী দেখছিলে?

ঃ জোছনার স্বাদ উপভোগ করছিলাম।

ঃ ওই বৃক্ষটির দৃশ্য তোমাকে আরও বেশি মোহিত ও বিস্মিত করবে।

ঃ আমি আপনার সঙ্গে যাব আর কেউ দেখলে তখন বিনালাভে দুর্নাম রটে যাবে। এই চাচ্ছেন আপনি, তাই না?

ঃ তাতে দুর্নামের কী আছে? তুমি তো শেষ পর্যন্ত আমারই...।

সালমা সরোয়ারের প্রতি খানিক তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল– 'বেশ বলেছেন! আমি বোধহয় আপনার দাসী... ।'

ঃ দাসী নয়– তুমি আমার আত্মা। তুমি আমার শান্তি।

ঃ সত্য বলছেন?

ঃ সত্য বলছি সালমা, সম্পূর্ণ সত্য বলছি। মনের গহীন থেকে, অন্তরের অন্তস্তল থেকে বলছি। তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচব না। তুমি আমার প্রতি রুষ্ট হয়েছ। মন থেকে এই অসন্তোষ ঝেড়ে ফেলো প্রিয়া।

সরোয়ার কথাগুলো এমন বিনয়-বিগলিত এবং মনমাতানো কণ্ঠে বলল যে, দুষ্টু ও চঞ্চল সালমা হঠাৎ মোমের মতো গলে যায়– 'আপনার প্রতি আমার কোনো ক্ষোভ, কোনো অসন্তোষ নেই!'

সরোয়ার প্রশান্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বলল– 'আল্লাহর শোকর।'

সালমা হেসে ফেলে। তার মুক্তাসদৃশ ধবধবে সাদা সমতল দন্তরাজি বিদ্যুতের মতো ঝলসে ওঠে– 'আমার একা আপনার সঙ্গে যাওয়া ঠিক হবে না।'

ঃ তুমি অহেতুক ভয় করছ সালমা!

ঃ আপনি যদি আমার জায়গায় হতেন, তা হলে ঠিকই বুঝতেন।

এমন সময় তাঁবুর ভিতর থেকে ডাক আসে– 'সালমা!'

সালমার পিতা হাবীবের কণ্ঠ। সালমা ভয় পেয়ে যায়– 'আব্বাজান ডাকছেন; এখানেই এসে পড়েন কি-না কে জানে!' বলেই সে হাঁটতে শুরু করে।

দুপা অগ্রসর হওয়ামাত্র হাবীব তাঁবু থেকে বেরিয়ে আসেন। পিতাকে দেখেই সালমার চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে যায়। সরোয়ারও ভয় পায়। কোনো দিকে সরে যাবে, এখন সেই সুযোগও নেই। হাবীব প্রথমে সালমাকে এবং পরে সরোয়ারকে দেখেন। তিনি ঝাঁঝালো কণ্ঠে বললেন– 'সালমা, তাঁবুর ভেতের যাও। আর সরোয়ার, তুমি এখানে এসেছ কেন?'

সালমা মাথা নত করে লাজুকপায়ে চলে যায়। সরোয়ার সম্মুখে অগ্রসর হয়ে সালমার পিতাকে সালাম দিয়ে আমতা-আমতা করে বলল– 'আমি আপনাকে বলতে এসেছি, আমার তাঁবুর নিকট একটি গাছ আছে। তার বৈশিষ্ট হল, যখন তার নিচে আগুন জ্বালানো হয়, তখন তার ডাল-পাতা থেকে বৃষ্টি ঝরতে শুরু করে। সালমাকেও আমি এ-কাহিনীই বলছিলাম।'

ঃ এ-দেশটা বড় বিস্ময়কর। অনেক বিস্ময়কর-বিস্ময়কর বস্তু আছে এ-দেশে। কিন্তু সরোয়ার, সালমার সঙ্গে এখনই কথা বলা তোমার ঠিক হচ্ছে না।

ঃ ঠিক আছে, আগামীতে সতর্ক থাকব।

ঃ আমি আনন্দিত যে, তুমি তারাবলিসের বিজেতা বলে খ্যাতি অর্জন করেছ। কিন্তু, আফ্রিকার যুদ্ধ সমাপ্ত না-হওয়া পর্যন্ত এবং শরীয়ত অনুযায়ী সালমার হাত তোমার হাতে তুলে না-দেয়া অবধি তুমি তার সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করো না।

ঃ ইনশাআল্লাহ এমনই হবে।

ঃ আমি দু'আ করি, আল্লাহ্ যেন তোমাকে অধিক থেকে অধিকতর সম্মান, খ্যাতি ও ঐশ্বর্য দান করেন।

হাবীব চলে যান। সরোয়ারের বড্ড আক্ষেপ হয়, সে সালমার সঙ্গে কথা বলে হবু শ্বশুরকে নাখোশ করেছে। এই মুহূর্তে নিজের কাছে তুচ্ছ হয়ে গেছে সরোয়ার।

সরোয়ার কয়েকমুহূর্ত সেখানে দাঁড়িয়েই ভাবতে থাকে, চাচাজান সালমাকেও বকবেন। আহ, আমার কারণে নির্দোষ মেয়েটিকে পিতার বকা শুনতে হবে! সরোয়ার একবার মনস্থ করে, তাঁবুতে গিয়ে হাবীবকে বলে আসবে, এই ঘটনায় সালমার কোনো দোষ নেই; সবটুকু অপরাধ তার এটার। কিন্তু তার সালমাদের তাঁবুতে প্রবেশ করার সাহস হল না। সরোয়ার আক্ষেপ করতে-করতে স্থান ত্যাগ করে।

ছাব্বিশ.

ইসলামী বাহিনী নিয়ম করে নিয়েছে, তারা ফজর নামায আদায় করে পথচলা শুরু করবে এবং দুপুরে উপযুক্ত একটি জায়গা বেছে নিয়ে ছাউনি ফেলবে। তারা যেসব পর্বতপ্রান্ত ও বালুকাময় প্রান্তর অতিক্রম করে, তাতে এমন অনেক বিস্ময়কর বিষয় ও বস্তু দেখতে পায়, যা তারা ইতিপূর্বে কখনও দেখেনি। ঘন বনের মাঝে তারা এমনসব মানুষ দেখে, যারা সম্পূর্ণ বিবসনা। আফ্রিকানরা তাদের 'বনমানুষ' বলে অভিহিত করে থাকে। এরা গাছে বাসা তৈরি করে বসবাস করে। এরা এমন নির্ভীক ও সাহসী যে, মানুষ ধরে মেরে-মেরে আহার করে। মুসলমানদের দেখে এই বনমানুষরা তাদের পিছু নেয়। কিন্তু একজন মুসলমানকেও কাবু করতে সক্ষম হয়নি। মুসলমানরাও তাদের ঘাটায়নি।

মুসলমানরা অরণ্যে একটি গাছের ডাল কাটে। সঙ্গে-সঙ্গে সেটি হতে রক্ত প্রবাহিত হতে শুরু করে। তারা বিস্মিত হয়। আরসানুস জানায়, এই বৃক্ষটির নাম লুহিরা। ডাল কর্তন করলে দেহ থেকে রক্ত বের হওয়া এর বৈশিষ্ট্য।

একটি সাদা গাছ। তার লম্বা-লম্বা ডাল ছড়িয়ে রয়েছে। গাছটি এত নরম যে, তাকে দড়ির মতো ব্যবহার করা যায়। জানা যায়, আফ্রিকার মানুষ বিশেষ গুরুত্বসহকারে এই গাছের চাষ করে এবং এর নরম ডাল দ্বারা পালঙ্ক তৈরি করে। এই পালঙ্ক বহু বছর যাবৎ টেকসই হয়।

আরও একটি সাদা গাছের সাক্ষাৎ মেলে, যার ডাল-পালা অত্যন্ত সুন্দর। গাছটি মুসলমানদের নিকট অনেক ভালো লাগে। কয়েকজন মুজাহিদ তার ডাল কাটতে চেষ্টা করে। কিন্তু তার গায়ে বড়-বড় ধারালো কুঠারের আচড় পর্যন্ত বসানো যায়নি। কুঠারের কোপ মারলে কুঠার ছিটকে ফিরে আসে। আরসানুস কিছুক্ষণ এই দৃশ্য অবলোকন করে পরে বলল– 'এই গাছটির নাম ক্যাক্রো। লোহার চেয়েও বেশি শক্ত। কুঠার তো ভালো, করাতেও কাজ হয় না। আমরা আফ্রিকানরা লোহার ভিমের পরিবর্তে এই গাছ ছাদে ব্যবহার করি।'

একদিন মুসলিম বাহিনী একটি নদীর কূলে অবস্থান গ্রহণ করে। তারা দেখতে পায়, নদীর পানিতে ছোট-ছোট কী যেন গাছ জন্মে আছে এবং গাছগুলোতে ছোট মাছের মতো কী যেন বস্তু রাখা আছে। দেখার জন্য কয়েকজন মুসলমান পানিতে নেমে পড়ে। তারা গাছগুলোর নিকটে পৌঁছুলে অতিশয় চমকপ্রদ কতগুলো তিতর তাদের উপর দিয়ে উড়ে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে দেখতে পায়, ওগুলো কোনো পাখি নয়– এক প্রকার সাদা মাছ। এই মাছগুলোই গাছে বাসা বেঁধে বসে ছিল। ওরা মানুষ দেখে উড়ে গিয়ে পানিতে ঝাঁপ দিয়েছে। মাছগুলো অত্যন্ত সুন্দর এবং ধবধবে সাদা। গায়ে পালক আছে। এই পালকের সাহায্যে তারা খানিক উড়তে এবং পানির উপর সাঁতার কাটতে পারে। মুসলমানরা মাছের বাসাগুলো দেখে। তাতে ডিম এবং কোনো কোনোটিতে বাচ্চাও আছে। মুসলমানরা এসবের কোনো ক্ষতি না-করে শুধু দেখে সামনের দিকে অগ্রসর হতে থাকে।

ইতিমধ্যে আরসানুস ঘটনাস্থলে এসে উপস্থিত হয়। সে বলল– 'খোদা আফ্রিকাকে পৃথিবীর চিড়িয়াখানারূপে সৃষ্টি করেছেন। এদেশে যতসব বিস্ময়কর বস্তু আছে, অন্য কোনো দেশে তা নেই। সে একটি গাছে হাত রেখে বলল, সবচে বেশি বিস্ময়কর হল এই গাছ। এর গুণাগুণ আমি তোমাদের পরে বলব। এখন তোমরা এর কয়েকটি ডাল কেটে নাও। ডালগুলো একটু মোটা দেখে নিও।' মুসলমানরা গাছ থেকে মোটা-মোটা কতগুলো ডাল কেটে নেয়। আরসানুস বলল– 'এবার এগুলো কেটে ছোট-ছোট টুকরো করে ফেলো।' মুসলমানরা ডালগুলো দুই আঙুল পরিমাণ করে টুকরো করে নেয়। আরসানুস

বলল– 'এবার এগুলো রান্না করো।' মুসলমানগণ চুলোয় হাঁড়ি বসিয়ে তাকে প্রথমে পানি ঢালে। তার পর তাতে ডালের টুকরোগুলো ছেড়ে দেয়। তার পর আগুন জ্বালিয়ে রান্না শুরু করে। মুসলমানরা দেখে বিস্মিত হয় যে, কাঠগুলো যত রান্না হচ্ছে, ততই নরম হয়ে যাচ্ছে। কিছুক্ষণ সিদ্ধ হওয়ার পর আরসানুস বলল– 'এবার নামিয়ে ফেলো।' দেখা গেল, গাছের রান্নাকরা ডালগুলো মাছের মতো মোলায়েম হয়ে গেছে। আরসানুস বলল– 'এবার মজা করে খাও, আমাকেও কিছু দাও।'

মুসলমানরা আরসানুসকে কয়েকটি টুকরো দিয়ে নিজেরা বসে খেতে শুরু করে। আব্দুল্লাহ ইবনে জাফর, আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর এবং সরোয়ারও উপস্থিত আছেন। তারাও খেতে শুরু করেন। গাছের ডালগুলো মুখে দিয়ে মুসলমানরা বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে যায় যে, সেগুলোর স্বাদ ঠিক টাটকা মাছের মতো, যেন তারা মাছ খাচ্ছেন। সরোয়ার আরসানুসকে উদ্দেশ করে বলল– 'অত্যন্ত বিস্ময়কর গাছ তো এটা!'

আরসানুস বলল– 'এটির বৈশিষ্ট্য আরও বেশি বিস্ময়কর। শোনো তা হলে, লাগাতার দশ থেকে পনেরো দিন এই গাছের ডাল রান্না করে খেলে বৃদ্ধ যুবক এবং যুবক নবযুবক হয়ে যায়। বার্ধক্যের কারণে যদি কারও সবগুলো দাঁত পড়ে গিয়ে থাকে, তা হলে পুনরায় দাঁত গজায়। চুল উঠে মাথাটা টাক হয়ে গিয়ে থাকলে নতুন করে কালো চুল গজায়। মুমূর্ষু ব্যক্তিকে এই গাছের ডালের ঝোল খাওয়ালে সে পূর্ণ সুস্থ্যতা লাভ করে।' শুনে মুসলমানগণ বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে পড়ে।

পরদিন মুসলিম বাহিনী ফজর নামায আদায় করেই রওনা হয়। দুপুরনাগাদ এক বালুকাময় প্রান্তরে পৌছে যাত্রাবিরতি দেয়। এখানে দূর-দূরান্ত পর্যন্ত কোনো গাছপালার চিহ্নও নেই। থাকলেও এক-দুটি গাছ এখানে-ওখানে দাঁড়িয়ে আছে। মুসলমানগণ এই বিজন মরু অঞ্চলে ছাউনি স্থাপন করে। রাত হলে তারা দেখতে পায়, সম্মুখে একটি আলোর মিনার দাঁড়িয়ে আছে, যাতে হাজার-হাজার ছিদ্র আছে এবং প্রতিটি ছিদ্র বিস্ময়কর এক শুভ্র আলোতে চকচক করছে। মুসলমানগণ যারপরনাই বিস্মিত হয় যে, এই আলো কোথা থেকে এল? তা ছাড়া আলোটা বিজলির মতো ফকফক্কাও! তারা আলোর মিনারের নিকটে গিয়ে দেখে, সেটি একটি গাছ, যার ডাল-পাতা সব আলোর মতো জ্বলজ্বল করছে। কুদরতের এই কারিশমা দেখে মুসলমানরা অত্যন্ত বিস্মিত হয়। তারা আল্লাহর শক্তির প্রশংসা করতে শুরু করে।

আলোকবৃক্ষের কাহিনী আরব নারীদের মাঝেও ছড়িয়ে পড়ে। তারাও গাছটি একনজর দেখার অদম্য আকাঙ্খা ব্যক্ত করে। সেনাপতি আব্দুল্লাহ ইবনে সা'দ সরোয়াকে আদেশ করেন– 'তুমি সকল মহিলাকে নিয়ে বিস্ময়কর সেই গাছটি দেখিয়ে আনো।'

মহিলারা সকলে প্রস্তুত হয়ে নারীক্যাম্প থেকে বের হয়ে আসে। হাবীবও তার কন্যা সালমাকে নিয়ে বেরিয়ে আসেন। তিনি সরোয়ারের নিকট এসে বললেন– 'চলো সরোয়ার, আমরা তিনজন একসঙ্গে যাই।'

সরোয়ার এতক্ষণ যাবত লজ্জায় আধখানা হয়ে ছিল। তার ধারণা ছিল, হাবীব তার প্রতি নারাজ হয়ে থাকবেন। সে-কারণেই সালমাদের তাঁবুর নিকট যাওয়ার এবং সালমার সঙ্গে কথা বলার সাহস তার আর হয়নি। কিন্তু আজ যখন সালমার পিতা নিজে তাকে সঙ্গে করে নিয়ে এলেন এবং আলোকবৃক্ষ দেখার জন্য একসঙ্গে যাওয়ার প্রস্তাব করলেন, তখন তার মনটা পরিষ্কার হয়ে গেল। বলল– 'চলুন।' আরব নারীদের দল আগে-আগে রওনা হয়ে গেছে। সরোয়ার অস্ত্রসজ্জিত হয়ে তাদের পিছনে-পিছনে রওনা হয়। হাবীব ও সালমা তার সঙ্গে হাঁটতে শুরু করেন।

আরব নারীরা আলোকবৃক্ষ দেখে বিস্ময়ে অবাক হয়ে যায়। তাদের নিকট মনে হল, যেন সমগ্র বৃক্ষ এবং তার সমস্ত ডাল-পাতা নূরের সৃষ্টি। প্রতিটি অঙ্গ থেকে ফকফকে সাদা ও উজ্জ্বল আলো বিকিরিত হচ্ছে এবং দূর-দূরান্ত পর্যন্ত সমস্ত গাছটিকে আলোকিত করে রেখেছে। মহিলারা গাছের নিকট গিয়ে দাঁড়ানোর সঙ্গে-সঙ্গে গাছের আলোতে তাদের মুখমন্ডল চকমক করতে শুরু করে। বিশেষ করে রূপসীকন্যা সালমার চেহারাটা যেন মূর্তিমান আলোর রূপ ধারণ করেছে। হঠাৎ তার প্রতি সরোয়ারের চোখ পড়লে মনে হল, যেন বৃক্ষটিই বরং সালমার রূপ থেকে আলো লাভ করেছে। সরোয়ার সালমাকে দেখছে। তার প্রেমপাগল চোখ দুটো যেন সালমার চোহারায় আটকে আছে। সালমা তার এহেন দৃষ্টিপাতে লজ্জায় মুখ নত করে ফেলে।

হাবীব বিস্ময়ের সঙ্গে গাছটি দেখছেন। একপর্যায়ে গাছ থেকে চোখ নামিয়ে বললেন– 'সরোয়ার, সত্যিই এটি মহান আল্লাহর কুদরতের এক নমুনা। দেখেছ, তিনি বৃক্ষটিকে কীরূপ আলো দান করেছেন আর আলোটা কেমন মিষ্টি ও মায়াময়!'

সরোয়ার রূপের গভীরে হাবুডুবু খাচ্ছিল। হাবীরের কণ্ঠস্বরে হঠাৎ চকিত হয়ে স্থির হয়ে যায়– 'হ্যাঁ, মহান আল্লাহর বিস্ময়কর সৃষ্টিসমূহের মধ্যে এটিও একটি বিস্ময়।'

কিছুক্ষণ এই গাছ ও তার অভিনব আলোকমালা দেখে সবাই ফিরে যায়। মহিলারা আগে-আগে হাঁটছে। সরোয়ার, হাবীব ও সালমা সকলের পিছনে। হাবীব বললেন– 'কুদরতের কত যে বিস্ময় আছে এ-দেশে!'

সরোয়ার বলল– 'এখন পর্যন্ত আর কী দেখেছি? আমরা তো আফ্রিকা এখনও দেখিইনি। কুদরতের কত বিস্ময় আছে এ-দেশে, তার কোনো হিসেব নেই।'

হাবীব বললেন– 'তুমি ঠিকই বলেছ।'

সালমা বলল– 'গাছটির আলো কেমন আদুরে লেগেছে।'

সরোয়ার বলল– 'তার আলো যার উপর পতিত হয়, সেটি চকমক করে ওঠে।'

হাবীব বললেন– 'তুমি বিলকুল ঠিক বলেছ। আমি তোমাকে দেখেছি। তোমার চেহারাও চকমক করতে শুরু করেছিল।'

সালমা তির্যক দুষ্টুচোখে সরোয়ারের প্রতি তাকিয়ে মিটিমিটি হাসতে শুরু করে। সরোয়ার বলল– 'শিশু এবং মেয়েদের চেহারা বেশি চিত্তহারী হয়ে ওঠেছিল।'

হাবীব বললেন– 'হ্যা, আমি সালমাকেও দেখেছিলাম। ওর চেহারাও ঝিকমিক করে ওঠেছিল।'

এবার সরোয়ারের হাসবার পালা। সে সালমার প্রতি তাকিয়ে মুখ টিপে হাসতে শুরু করে। সালমা ফিক করে একটা হাসি দিয়ে মাথাটা নত করে ফেলে।

সকলে নারীক্যাম্পে প্রবেশ করে। হাবীব এবং সালমাও চলে যান। সরোয়ার নিজতাঁবুতে ফিরে আসে।

পরদিন ফজর নামায আদায় করেই বাহিনী সম্মুখপানে রওনা হয়।

সাতাশ.

একবেলা পথ চলে অবশিষ্ট সময় অবস্থান করে-করে ইসলামী বাহিনী একদিন সবুজে ঢাকা সুবিস্তৃত এক মাঠে গিয়ে উপনীত হয়। চারদিকে দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত বিস্তৃত মাঠটি। নানা প্রজাতির হাজার-হাজার গাছ দাঁড়িয়ে আছে। স্থানে-স্থানে বিপুলসংখ্যক বৃক্ষঝাড়ও দেখা যাচ্ছে। মাঠটি সমতল নয়। কোথাও টিলা, কোথাও খানা-খন্দ-এবড়োখেবড়ো। তবে, এ-চিত্র মাঠের চারধারের। মধ্যখানে দেড়-দুই বর্গমাইল জায়গা সম্পূর্ণ সমতল। একটি নদীর কতগুলো শাখা আছে। সেই নদীটিই সিঞ্চিত করছে এ-বিশাল মাঠটি। এই মাঠেরই একধারে বহু দূর পর্যন্ত ছাউনি স্থাপন করে মুসলিম বাহিনী। এখান থেকে সাবতিলার দূরত্ব মাত্র দুই মনযিল পথ।

প্রিয় পাঠক, আপনারা জানেন, এই মুসলিম বাহিনীর সঙ্গে যাবিলার পরাজিত শাসনকর্তা আরসানুসও রয়েছে। তার সঙ্গে আছে তার আড়াইশ খ্রিস্টান যোদ্ধা। আরসানুস তাদের কয়েকজন সৈন্যকে গোয়েন্দাগিরিতে নিযুক্ত করেছে। তারা প্রত্যহ জর্জির ও তার বাহিনীর খবরাখবর সংগ্রহ করে আনছে। তারা সর্বশেষ যে-সংবাদটি সংগ্রহ করে আনে, তা হচ্ছে, জর্জির এক লাখ বিশ হাজার সৈন্য নিয়ে রওনা হয়েছেন এবং আগামী কাল সকাল কি সন্ধ্যা নাগাদ এ-মাঠে এসে পৌঁছুবেন।

মুসলিম সৈন্য সর্বসাকুল্যে উনত্রিশ হাজার– শত্রু বাহিনীর চার ভাগের এক ভাগ। এই বিশাল খ্রিস্টান বাহিনী অত্যন্ত বীরত্ব ও উদ্দীপনার সঙ্গে ক্ষুদ্র এই মুসলিম বাহিনীটিকে পিষে মারার লক্ষ্যে ধেয়ে আসছে। কিন্তু সর্বশেষ এই সংবাদটি মুসলমানদের মনে একবিন্দুও রেখাপাত করল না। তারা এখনও ভাবনাহীন মনেই অবস্থান করছে এবং খ্রিস্টানদের এসে পৌঁছার অপেক্ষা করছে।

অবশেষে মঙ্গলবার দুপুরবেলা খ্রিস্টান বাহিনী আত্মপ্রকাশ করে। তারা নিরতিশয় অহমিকা ও দম্ভের সঙ্গে এগিয়ে আসছে। বাহিনীর সর্বশেষ সারি দিগন্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে রয়েছে, যেন এই বাহিনীর আগমন কোনোদিন শেষ হবে না।

খ্রিস্টান বাহিনী অত্যন্ত জাঁকজমকের সঙ্গে এসে মাঠে ছড়িয়ে পড়ছে এবং তাঁবু স্থাপন করে অবস্থান গ্রহণ করছে। সংখ্যা তাদের বিপুল। তারা মাঠের এক-তৃতীয়াংশে ছড়িয়ে পড়ে। একটি জাঁকজকমপূর্ণ নগরী গড়ে উঠেছে মাঠে।

পরদিন ফজর নামায আদায় করে মুসলিম বাহিনীর সেনাপতি মুসলিমসেনাদের উদ্দেশে ভাষণ প্রদান করেন–

'সিংহহৃদয় মুজাহিদগণ, শত্রুবাহিনী তাদের পূর্ণশক্তি, সাজ-সরঞ্জাম ও জাঁকজমক নিয়ে তোমাদের পিষে মারতে এসেছে। আমরা গুপ্তচর মারফত জানতে পেরেছি, তারা এক লাখ বিশ হাজার। মানে, একজন মুসলমানদের মোকাবেলায় মাত্র চারজন। এই সংখ্যা তেমন বেশি নয়। আমরা তো তারা, যারা ইয়ারমুকের ময়দানে একেক জন একেক হাজার শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছি। মহান আল্লাহর সাহায্য ও অনুগ্রহ যদি আমাদের সঙ্গী হয়, তা হলে ইনশাআল্লাহ এই খ্রিষ্টান বাহিনীকে পরাজিত করে বিজয় অর্জন করা কঠিন হবে না। তবে যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে ইসলামের রীতি অনুযায়ী আমি আফ্রিকার সম্রাট জর্জিরের নিকট সন্ধির প্রস্তাব প্রেরণ করব। এ-সময়ে তোমরা প্রস্তুতি সম্পন্ন করে ফেলো এবং সদাসতর্ক থাকো।'

সেনাপতি আব্দুল্লাহ ইবনে সা'দ ভাষণ সমাপ্ত করে তখনই সরোয়ার, ইবনে আব্বাস ও ইবনে জাফরকে বললেন– 'তোমরা তিনজন সম্রাট জর্জিরের নিকট যাও এবং তাকে ও তার মন্ত্রীবর্গকে ইসলামের দাওয়াত দাও। যদি তিনি ইসলাম গ্রহণের আহ্বান প্রত্যাখ্যান করেন, তা হলে জিযিয়া প্রদানের প্রস্তাব দাও। আলোচনায় কঠোরতা পরিহার করবে এবং ইসলামের রীতি ও মুসলমানদের চরিত্র-সভ্যতা অনুযায়ী যত বেশি সম্ভব কোমলতা প্রদর্শন করবে। তোমরা এখনই রওনা হয়ে যাও। আমি তোমাদের ফিরে আসার অপেক্ষায় আছি।'

তিনজনই যুবক। বংশে কুরাইশি এবং তিন মহান সাহাবীর পুত্র। অত্যন্ত দুঃসাহসী ও নির্ভীক। তারা আপন-আপন তাঁবুতে গিয়ে অস্ত্রসজ্জিত হয়ে ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে আসে। এখন তারা পুরোপুরি আরবি পোশাক পরিহিত। তাদের অস্ত্রও আরবি। পিঠে ঢাল এবং ঢালের সঙ্গে তূনীর ঝুলছে। তিনজন রওনা হন। পথে আরসানুসের সঙ্গে তাদের দেখা মেলে। আরসানুস জিজ্ঞেস করে– 'আপনারা জর্জিরের নিকট যাচ্ছেন নাকি?'

ইবনে আব্বাস উত্তর দেন– 'হ্যাঁ, আমরা তিনজন আফ্রিকার সম্রাটের নিকট যাচ্ছি।'

ঃ সম্ভবত সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে।

ঃ না, প্রচলিত অর্থে সন্ধির প্রস্তাব নয়। আমাদের নিয়ম আছে, যুদ্ধ শুরু করার আগে আমরা প্রতিপক্ষকে ইসলাম গ্রহণ কিংবা জিযিয়া প্রদানের প্রতিশ্রুতি নিয়ে যুদ্ধ এড়ানোর সুযোগ দিয়ে থাকি।

ঃ আপনারা জর্জিরকে চেনেন না। আপনাদের কোনো আহ্বানে সাড়া দেয়ার মতো লোক তিনি নন।

ঃ তার পরও আমাদেরকে আমাদের নিয়ম পালন করতে হবে।

ঃ জর্জির অত্যন্ত দাম্ভিক শাসক। এইমুহূর্তে তার পতাকার নিচে এক লাখ বিশ হাজার পরীক্ষিত বীর সৈনিক রয়েছে। সেনাসংখ্যার আধিক্যে তিনি সীমাহীন গর্বিত। আপনাদের সংখ্যাস্বল্পতায় তিনি নিশ্চিত হয়ে গেছেন তার বিজয় অবধারিত। তাই আপনাদের কোনো প্রস্তাবে তিনি কর্ণপাত করবেন না এটাই স্বাভাবিক।

ঃ আমরাও এসব জানি।

ঃ তা হলে যাচ্ছেন কেন?

আসলে আরসানুস চাচ্ছে না সন্ধি হোক। তার একান্ত কামনা, যুদ্ধ হোক এবং যে-কোনোভাবে রূপরানী হেলেন তার হাতে আসুক। মুসলিম দূতরা জর্জিরের নিকট যাক এটা তার ভালো লাগছে না।

ইবনে আব্বাস বললেন– 'যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে সন্ধির প্রস্তাব দেয়া আমাদের ধর্মের বিধান এবং খলীফার নির্দেশ। প্রতিপক্ষ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেই কেবল তখন আমরা যুদ্ধ করি। এই নিয়ম আমাদের পালন করতেই হবে।'

ঃ ঠিক আছে যান, চেষ্টা করে দেখুন। আশা করব, আপনারা এমন কোনো কথা বলবেন না, যার ফলে ইসলাম ও মুসলমানদের মানহানি হয়।

ঃ আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আমরা ইসলাম ও মুসলানদের মর্যাদা উচ্চে রেখেই কথা বলব।

ঃ জানতে পেরেছি, রূপরানী রাজকুমারী হেলেনও নাকি বাহিনীর সঙ্গে এসেছে।

ঃ আমরা শুনেছি।

ঃ আমাকে আমার গুপ্তচররা জানিয়েছে, সাবতিলার প্রধান পাদরিও একদল পাদরিকে নিয়ে বাহিনীর সঙ্গে এসেছেন। রাজকুমারী এবং প্রধান পাদরির উপস্থিতি খ্রিস্টানদের মনোবল ও সাহস বাড়িয়ে তুলেছে। তারা নিশ্চিত, জয় তাদেরই হবে। প্রধান পাদরির কোনো যুদ্ধাভিযানে অংশগ্রহণের ঘটনা এটিই প্রথম।

ঃ আমরা বিশ্বাস করি জয়-পরাজয় আল্লাহর হাতে।

ঃ আমার মনে হচ্ছে, আপনাদেরকে রূপের জালে আটকানোর জন্য রাজকুমারীকে সুসজ্জিতা করে দরবারে উপস্থিত রাখা হবে এবং একপর্যায়ে আপনাদের আটক করা হবে।

ঃ তা হলে খ্রিস্টানরা এখনও মুসলানদের চিনতেই পারেনি। কোনো মুসলমান নারীর রূপের কাছে পরাজিত হয়ে সত্যের প্রচার থেকে বিমুখ হয় না। কোনো নারীর রূপ কোনো মুসলমানকে একবিন্দু প্রভাবিত করতে পারে না।

ঃ আমি জানি। কিন্তু, আমি আপনাদেরকে বিষয়গুলো অবহিত করা আবশ্যক মনে করেছি।

ঃ তার জন্য আমরা আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

ঃ প্রধান পাদরি আপনাদের সম্মুখে ধর্মীয় আলোচনার অবতারণা করতে পারেন।

ঃ আমরা তা-ই কামনা করি। আর তা-ই যদি ঘটে, তা হলে খ্রিস্টান পাদরি অতি অল্প সময়েই কুপোকাত হয়ে যাবে।

তিন মুসলিম দূত খ্রিস্টান-বাহিনীর ছাউনি অভিমুখে এগিয়ে চলে। বাহিনীর নিকটে পৌছুলে নিরাপত্তারক্ষীরা তাদের থামিয়ে দেয়। কমান্ডার জিজ্ঞেস করে– 'আপনারা কারা? কেন এসেছেন?'

ইবনে জাফর বললেন– 'আমরা মুসলমান দূত। তোমাদের সম্রাটের সঙ্গে সন্ধির আলোচনা করতে এসেছি।'

কমান্ডার অবজ্ঞার সুরে বলল– 'ব্যস, বাহিনী দেখেই ভয় পেয়ে গেলেন? এমনই যদি হবে, তো আফ্রিকা এসেছেন কোন দুঃখে?'

ইবনে জাফর ক্রোধে ফেটে পড়েন। ঝাঁঝালো কণ্ঠে বললেন– 'সাবধান! এমন কথা আরেকবার উচ্চারণ করলে তোমার মাথাটা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মাটিতে পড়ে যাবে। আমরা যুদ্ধ শুরু করার আগে সন্ধির প্রস্তাবের মাধ্যমে শত্রুপক্ষকে যুদ্ধ এড়ানোর সুযোগ দিয়ে থাকি মাত্র। প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হলে আমাদের তরবারি তাদের সোজা করে দেয়।'

ইবনে জাফরের রুদ্রমূর্তি দেখে খ্রিস্টান কমান্ডার ভড়কে যায়। বলল– 'আপনি রাগ করবেন না। আমি এক্ষুনি সম্রাটকে সংবাদ জানাচ্ছি।'

কমান্ডার সম্রাটকে সংবাদ প্রদানের জন্য কয়েকজন অশ্বারোহীকে প্রেরণ করে মুসলিম দূতদের বলল– 'আপনারা ঘোড়া থেকে নেমে বিশ্রাম করুন। সম্রাটের তাঁবু এখান থেকে দু-মাইল দূরে। এতটুকু পথ অতিক্রম করে সম্রাটের অনুমতি নিয়ে ফিরে আসতে কিছু সময় লাগবে।'

ইবনে জাফর বললেন– 'ঠিক আছে, আমরা অপেক্ষা করছি।'

তিন মুসলিম দূত ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে একটি গাছের ছায়ায় মাটিতে বসে পড়েন এবং চারদিক সতর্ক চোখ রাখেন, যেন কেউ আক্রমণ না-করে বসে। তারা আফ্রিকার সম্রাট জর্জিরের অনুমতির অপেক্ষা করতে থাকেন।

আটাশ.

খানিক পর অশ্বারোহীরা ফিরে এসে মুসলিম দূতদের নিয়ে রওনা হয়। কিছুদূর অগ্রসর হয়েই তাঁরা খ্রিস্টান বাহিনীর অভ্যন্তরে ঢুকে পড়েন। তাঁরা চোখ তুলে এদিক-ওদিক তাকান। দেখেন, যতদূর পর্যন্ত দৃষ্টি যাচ্ছে, সর্বত্র সৈন্য আর সৈন্য, যেন সৈন্যের বান বইছে। খ্রিস্টানসেনারা অত্যন্ত সুশৃঙ্খলভাবে অবস্থান নিয়ে আছে। মাইলের-পর-মাইল দীর্ঘ সারি। তাঁবুগুলো অত্যন্ত সুশৃঙ্খলভাবে স্থাপন করা হয়েছে। প্রতিটি তাঁবুর সামনে পর্দা ঝুলছে। ঘোড়াগুলো তাঁবুর পিছনে বাঁধা আছে। বোঝা গেল, সমস্ত বাহিনীতে মুসলিম দূতদের আগমনের সংবাদ ছড়িয়ে পড়েছে। তাই সেনারা প্রভাব বিস্তারের লক্ষ্যে বর্ম পরিধান করে এবং অস্ত্রসজ্জিত হয়ে চারদিকে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

মুসলিম দূতগণ দেখে-দেখে অগ্রসর হচ্ছেন। পনেরো-বিশটি সারি অতিক্রম করার পর তারা একটি খোলা মাঠে গিয়ে উপনীত হয়। সম্রাট জর্জিরের প্রধান সেনাপতি মারকুস তিন হাজার সৈন্য নিয়ে সশস্ত্র দাঁড়িয়ে আছেন।

মারকুস ইসলামী দূতদের স্বাগত জানান। লোকটি রেশমি পোশাক এবং সোনা ও মণি-মুক্তার অলংকারে সজ্জিত। তিনি মুসলিম দূতদের নিয়ে সম্মুখে রওনা হন। এবার তারা যেসব সারির মধ্য দিয়ে অতিক্রম করছেন, তার সেনারা অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণ উর্দি এবং উন্নতমানের ঘোড়ায় আরোহণ করে আছে। এখানকার তাঁবুগুলোও অতিশয় শানদার ও সুন্দর। তাঁবুর সম্মুখে ঝুলন্ত পর্দাগুলোও অত্যন্ত দামি। তাঁবুর অভ্যন্তরের সাজ-সরঞ্জাম যতটুকু দেখা যাচ্ছে, তা-ও বেশ মূল্যবান বলে মনে হচ্ছে।

কিছুদূর অগ্রসর হয়ে সেনাপতি একটি তাঁবুর সম্মুখে গিয়ে দাঁড়ান। এই তাঁবুটিও অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণ ও সুন্দর। ভিতরটা এত প্রশস্ত যে, হাজারেরও অধিক চেয়ার বসানোর জায়গা আছে। এই তাঁবুটির চতুর্দিকে বিপুলসংখ্যক অশ্বারোহী উন্নতমানের উর্দি ও অস্ত্রসজ্জিত হয়ে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে আছে।

তাঁবুতে পৌঁছে মারকুস ঘোড়া থেকে অবতরণ করেন। তাঁর পরে মুসলিম দূতগণ নেমে আসেন। মারকুস দূতদের উদ্দেশ করে বললেন– 'খ্রিস্টানদের সামরিক রীতি হচ্ছে কেউ সম্রাটের নিকট যেতে হলে অস্ত্র রেখে যেতে হয়। তাই অনুগ্রহপূর্বক আপনারা অস্ত্রগুলো রেখে দিন।'

সরোয়ার বলল– 'আপনাদের আইন আপনাদের জন্য– অন্য জাতির জন্য নয়। আমরা নিরস্ত্র হতে পারব না।'

ঃ কিন্তু তাতে আপনাদের ভয় কিসের?

ঃ কোনো ভয় নেই। কিন্তু আমরা আপনাদের আইন মান্য করব কেন? তা ছাড়া আপনারা যদি আমাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে ফেলেন, তা হলে নিরস্ত্র অবস্থায় আমরা মোকাবেলা করব কীভাবে?

ঃ অস্ত্র থাকলেও আপনার তিনজন কী করতে পারবেন?

ঃ বেশি কিছু পারব না ঠিক; কিন্তু অন্ততপক্ষে আমরা একজন আপনাদের এক হাজারজনকে হত্যা করে তো শহীদ হব।

মারকুস অট্টহাসিতে ফেটে পড়েন– 'মুসলমান কত ফালতু কথা বলে।'

সরোয়ার অত্যন্ত গাম্ভীর্যের সঙ্গে বলল– 'যদি সন্ধি না হয়, তা হলে নিজচোখেই দেখবেন মুসলমান কখনও ফালতু কথা বলে না।'

ঃ তার মানে আপনারা নিরস্ত্র হবেন না?

ঃ হ্যাঁ, তা-ই।

ঃ আচ্ছা, আপনারা একটু দাঁড়ান। আমি সম্রাটের সঙ্গে কথা বলে আসি।

সেনাপতি মারকুস তাঁবুতে প্রবেশ করে কিছুক্ষণ পর বেরিয়ে এসে

বললেন– 'চলুন, মহারাজ আপনাদের সশস্ত্র অবস্থায়ই তাঁর দরবারে উপস্থিত হওয়ার অনুমতি প্রদান করেছেন।'

মুসলিম দূতগণ সেনাপতি মারকুসের পথনির্দেশনায় তাঁবুতে প্রবেশ করেন। তারা দেখতে পান, তাঁবুর অভ্যন্তর অত্যন্ত মূল্যবান কাপড়ের তৈরী। মাথার উপর অতিশয় সুন্দর শামিয়ানা ঝুলছে। অত্যন্ত সুসজ্জিত ও সাজানো-গোছানো তাঁবু। মেঝেতে রোমান কার্পেট বিছানো। কার্পেটের উপর অনেকগুলো চেয়ার সাজানো। সম্রাট জর্জিরের পারিষদবর্গ যার-যার পদমর্যাদা অনুপাতে মূল্যবান পোশাক ও অলংকার পরিধান করে চেয়ারে বসে আছেন।

তাঁবুর ঠিক মধ্যখানে একটি সিংহাসন বসানো। তার উপর সম্রাট জর্জির অত্যন্ত ভাবগম্ভীর মুখে উপবিষ্ট। পাশে বসা তার অনুপমা রূপসীকন্যা হেলেন। সম্রাট জর্জির রাজকীয় পোশাক এবং মণি-মাণিক্যের অলংকার পরিহিত। মাথায় দেদীপ্যমান সোনার রাজমুকুট। কয়েকটি স্বল্পবয়সী রূপসী মেয়ে তার পিছনে হাতজোড় দাঁড়িয়ে আছে।

এ-মুহূর্তে রাজকুমারী হেলেন যে-পোশাকটি পরিধান করেছে, সেটি অত্যন্ত চিত্তাকর্ষী ও মনোহারী। তার সর্বাঙ্গে জড়ানো সোনা ও মুক্তার অলংকার। পোশাক-অলংকার তার চাঁদের চেয়েও উজ্জ্বল চেহারাটাকে এমন ঝকমকে করে তুলেছে যে, উপস্থিত সকলের চোখ যেন তাতেই আটকে আছে। রাজকুমারী হেলেনও অত্যন্ত ভাবগম্ভীর মুখে বসে আছে। তার পিছনে দাঁড়িয়ে তার সেবিকারা মশা-মাছি তাড়াচ্ছে।

মুসলিম দূতগণ তাঁবুতে প্রবেশ করামাত্র উপস্থিত সকলের দৃষ্টি তাদের উপর নিবদ্ধ হয়। খ্রিস্টানদের ধারণা ছিল, ইসলামী দূতগণও তাদেরই মতো জমকালো পোশাক পরিহিত হবে। কিন্তু তাদের পরিধানে অতি সাধারণ আবা। আবার উপর ঢিলেঢালা চাদর। মাথায় নীল বর্ণের পাগড়ি এবং পাগড়ির উপর সাধারণ মূল্যের রুমাল ছড়ানো দেখে তারা যারপরনাই বিস্মিত হয়।

মারকুস দূতদের নিয়ে সম্মুখে এগিয়ে যান এবং সম্রাট জর্জিরের সিংহাসনের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে বললেন– 'মুসলিমগণ, আপনারা মহান রাজাধিরাজের দরবারে এসে উপস্থিত হয়েছেন। কাজেই আপনারা ভূতলে লুটিয়ে সম্রাটকে সালাম করুন।'

ইবনে আব্বাস বললেন– 'ভূতলে লুটালে সেজদার সাদৃশ ঘটে। আর মুসলমানরা সেজদা আল্লাহ ছাড়া কাউকে করে না। কেউ আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো বস্তুকে সেজদা করলে আমরা তাদের কাফের বলি।'

খ্রিস্টান সভাসদগণ ইবনে আব্বাসের এই নির্ভীক বক্তব্যে বিস্মিত হয়ে পড়ে। জর্জির বললেন– 'বাদ দাও, এরা যদি সালাম না-করে, তা হলে তোমরা বাধ্য করো না। এরা ভদ্রতা-সভ্যতা সম্পর্কে অনবহিত।'

ইবনে আব্বাস বললেন– 'শোনো আফ্রিকার সম্রাট, আমরা তোমাদের সভ্যতা-ভদ্রতা দেখেছি। রাজা হওয়ার সুবাদে তুমি নিজেকে সাধারণ মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ও বড় মনে করছ। তাই সকলের মাঝে উঁচু সিংহাসনে বসেছ এবং কামনা করছ, মানুষ তোমাকে সেজদা করুক। এমন সভ্যতাকে আমরা অভিসম্পাৎ করি। আমাদের আমীরুল মুমিনীন– যিনি সমগ্র পৃথিবীর মুসলমানদের নেতা, যার নাম শুনে তাবৎ পৃথিবীর অমুসলিম শাসকগণ কেঁপে ওঠে– কখনও সাধারণ মানুষদের চেয়ে উঁচুতে বসেন না। শাসক প্রজাদের রক্ষণাবেক্ষণকারী হয়ে থাকেন। আর রক্ষণাবেক্ষণকারীকে পরিভাষায় সেবক বলা হয়। এই হিসেবে শাসক প্রজাদের খোদা নন– সেবক।'

ইবনে আব্বাসের এই বজ্রকঠিন এবং নির্ভীক বক্তব্য খ্রিস্টানদের উপর অনেক প্রভাব সৃষ্টি করে। জর্জির খানিকটা দমে যান। পরক্ষণেই আত্মসংবরণ করে বললেন– 'ব্যস, এটাই ঠিক যে, ওটা তোমাদের সভ্যতা আর এটা আমাদের সভ্যতা। এবার বলো তোমরা কেন এসেছ?'

ইবনে জাফর বললেন– 'আমরা সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে এসেছিলাম মহারাজ! কিন্তু আপনার রাজকীয় হাল দেখে আমরা নিরাশ হয়েছি। যে ব্যক্তি নিজেকে অন্যদের চেয়ে বড় মনে করে, সে দাম্ভিক হয়ে থাকে। আমরা আমাদের সেনাপতির পক্ষ থেকে যে-বার্তা নিয়ে এসেছি, আপনি তা মনোযোগসহকারে শুনবেন বলে আমরা আশা করি না। তবু আমাদেরকে কর্তব্য পালন করতে হচ্ছে। তাই আপনার সম্মুখে মুসলিম বাহিনীর সেনাপতির বার্তাটি উপস্থাপন করব।'

বক্তব্যটা সম্রাট জর্জিরের ভালো লাগল না। তিনি ক্ষোভে অগ্নিশর্মা হয়ে ওঠেন। খানিক নড়েচড়ে রাগটা হজম করে নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন– 'ফালতু কথা বাদ দিয়ে কী বার্তা নিয়ে এসেছ তা-ই বলো।'

সরোয়ার বলল– 'বার্তাটি আমার নিকট শুনুন। আমাদের আমীরুল মুমিনীন আদেশ করেছেন, যুদ্ধ শুরু করার আগে যেন আমরা আপনাকে সন্ধির প্রস্তাব দিই। এটা আমাদের ধর্মের বিধান। সেই বিধান এবং খলীফার আদেশ পালনার্থে আমরা আপনার নিকট এসেছি।'

জর্জির বললেন– 'সন্ধির শর্ত বলো।'

সরোয়ার বলল– 'শর্ত দুটির যে-কোনো একটি। হয়ত আপনারা সকলে

ইসলাম গ্রহণ করুন এবং তাবৎ বিশ্বের সকল মুসলমানের ভাই হয়ে যান। এতে আপনাদের রাষ্ট্র ও সম্পদ আপনাদেরই থাকবে, কেউ আপনাদের প্রতি চোখ তুলে তাকাবে না।'

একথা শুনে জর্জির ক্ষেপে ওঠেন। দরবারের সকল সভাসদও ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। সকলে রোষকষায়িত চোখে মুসলিম দূতদের প্রতি তাকাতে থাকে। জর্জির কঠিন গলায় বললেন– 'তোমরা একজন খ্রিস্টান সম্রাটের নিকট এমন আশা করতে পার?'

ইবনে জাফর বললেন– 'আমি আগেই বলেছি যে, আপনার জাঁকজমক ও দম্ভ-অহমিকা দেখে আমি বুঝে ফেলেছি আপনি সন্ধির পথ অবলম্বন করবেন না।'

ঃ জান, তোমরা আমার শানে কীরূপ শক্ত কথা বলেছ? দূত না-হলে আমি তোমাদেরকে এমন শাস্তি দিতাম যে, শুনে জগত কেঁপে ওঠত।

ঃ আমরা যেসব প্রতাপশালী খ্রিস্টানদের থেকে তাদের সাম্রাজ্য কেড়ে নিয়েছি, তাদের চিন্তা-চেতনাও এমনই ছিল। দয়া করে অহমিকার ভাষা পরিহার করুন।

সরোয়ার বলল– 'আমরা আপনাকেও শক্ত ভাষা পরিহার করার পরামর্শ দিচ্ছি। আপনি জানেন না, আমরা সেই সিংহদের সন্তান, যারা মহাপ্রতাপশালী সম্রাট কায়সার ও কেসরার সুমহান রাজদরবারে অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় কথা বলেছেন। আমরা ভয় পাওয়ার মতো লোক নই। গম্বুজের প্রতিধ্বনির ন্যায় যা বলবেন, তা-ই শুনবেন।'

ঃ আমি সাবধানতা অবলম্বন করব।

ঃ একজন রাজার মেজাজ-মন সহনশীল হওয়া আবশ্যক। যা হোক, আপনি যদি মুসলমান হতে সম্মত না হন, তা হলে জিযিয়া প্রদান করুন। এটা কোনো অপমানজনক ট্যাক্স নয়– জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা কর মাত্র।

জর্জিরের মাথায় আবারও ক্রোধ জেগে ওঠে। কিন্তু অনেক কষ্টে রাগটা হজম করে আত্মসংবরণ করে বললেন– 'আমি তোমাদের এই প্রস্তাবও প্রত্যাখ্যান করলাম।'

ঃ তার মানে আপনি যুদ্ধ করবেন। আপনি চাচ্ছেন খোদার বান্দাদের রক্ত ঝরুক।

ঃ তোমরা যা মনে কর। তা তোমাদের শর্ত তো এই দুটিই?

ঃ হ্যাঁ।

ঃ আমি এর একটিতেও সম্মত নই।

ঃ তা হলে তরবারি আমাদের ও আপনাদের মাঝে ফয়সালা করবে।

ঃ আমি তোমাদের প্রতি এটুকু অনুগ্রহ করতে পারি, যদি তোমরা ফিরে যাও, তা হলে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, আমি মিসর আক্রমণ করব না।

ঃ আমরা আপনার অনুগ্রহের কাঙাল নই। দয়া-অনুগ্রহের জন্য আমাদের আল্লাহই যথেষ্ট। আমরা কেবল তাঁরই অনুগ্রহ কামনা করি। আপনি মিসর তো তখন আক্রমণ করতে পারবেন, যদি আমাদের হাত থেকে রক্ষা পান।

জর্জিরের মাথাটা আবারও গরম হয়ে যায়। বললেন– 'আচ্ছা, তোমরা আলোচনা বন্ধ করে দাও; আমার খুব রাগ আসছে।'

ইবনে আব্বাস বললেন– 'কিন্তু এমন একটি সময় আসবে, যখন আপনি আমাদের এই আলোচনার কথা স্মরণ করে আক্ষেপ করবেন।'

ঃ কেউ বলতে পারে না, আক্ষেপ আমি করব না-কি তোমরা।

ঃ আমরা আপনাকে আমাদের খলীফার আদেশ মোতাবেক সেনাপতির বার্তা পৌঁছিয়ে দিয়েছি। আপনি তা প্রত্যাখ্যান করেছেন। এখন আল্লাহ্ তাদের সাহায্য করবেন, যারা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত।

ঃ আমি খুব শীঘ্র যুদ্ধের মাঠে তোমাদেরকে এর উত্তর দেব।

ঃ বেশ ভালো কথা; আমরা অপেক্ষায় রইলাম।

আলোচনার পুরো সময়টা মুসলিম দূতগণ একবারের জন্যও চোখ তুলে রাজকুমারী হেলেনের প্রতি তাকাননি। তাঁবুতে প্রবেশ করার পর প্রথম একদৃষ্টিতে যতটুকু দেখেছেন, ওই ততটুকুই। অথচ, আফ্রিকা প্রবেশ করার পর থেকেই তারা মেয়েটির রূপের প্রশংসা শুনে আসছেন।

বৈঠক সমাপ্ত হল। তিন মুসলিম দূত তাঁবু থেকে বের হয়ে ঘোড়ায় চড়ে নিজ বাহিনীর ক্যাম্প অভিমুখে রওনা হন।

ঊনত্রিশ.

আরসানুসের মনে চিন্তা ধরে গেছে, পাছে ইসলামী দূতগণ সম্রাট জর্জিরের সঙ্গে সন্ধি করেই ফেলেন কি-না? দুঃশ্চিন্তায় মনটা তার অস্থির হয়ে ওঠেছে। দূতদের সঙ্গে সাক্ষাতের পর আর সে তাঁবুতে যায়নি। এদিক-ওদিক ঘোরাফেরা করে দূতদের ফিরে আসার অপেক্ষা করতে থাকে। অবশেষে দূতরা ফিরে আসলে সঙ্গে-সঙ্গে তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে জিজ্ঞেস করে– 'সন্ধি হয়েছে কি?'

ইবনে আব্বাস বললেন– 'না, তোমার ধারণাই সঠিক প্রমাণিত হয়েছে। লোকটা অত্যন্ত দাম্ভিক। সেনাসংখ্যার আধিক্যে তার বেজায় গর্ব। আমাদের সন্ধিপ্রস্তাব দম্ভের সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করেছে।'

আরসানুসের চেহারায় আনন্দের দ্যোতি খেলে ওঠে। বলল– 'আমি পূর্ব থেকেই জানতাম, দাম্ভিক ও অহংকারী জর্জির কক্ষনো সন্ধি করবেন না।'

আরসানুসের মনটা হালকা হয়ে যায়। হৃদয়ের সব উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা দূর হয়ে যায়। এবার নিশ্চিন্তমনে নিজতাঁবুতে ফিরে যায়। দূতগণ সেনাপতি আব্দুল্লাহ ইবনে সা'দের নিকট গিয়ে তাঁকে জর্জিরের সঙ্গে আলোচনা সম্পর্কে অবহিত করেন। আব্দুল্লাহ ইবনে সা'দ বললেন– 'আমি জানতাম, জর্জির কখনও আমাদের প্রস্তাবে সম্মত হবে না। তবু এটা আমাদের কর্তব্য ছিল। আমরা আমাদের কর্তব্য পালন করেছি। এখন আমাদের সর্বদা প্রস্তুত ও সতর্ক থাকতে হবে। তারা যে-কোনো সময় যে-কোনো দিন আমাদের উপর আক্রমণ করে বসতে পারে।'

আব্দুল্লাহ ইবনে সা'দ তৎক্ষণাৎ সকল অফিসার ও কমান্ডারদের প্রতি আদেশ জারি করেন, যেন প্রতিটি ইউনিট এবং প্রতিজন সৈন্য প্রতিমুহূর্তে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকে এবং রাতে নিরাপত্তা ও প্রহরার কড়া ব্যবস্থা করে।

সরোয়ার নিজতাঁবুতে এসে জানতে পারে, সালমার পিতা হাবীব তাকে যেতে বলেছেন। সরোয়ারের মনে চিন্তা জাগে, ব্যাপার কী, চাচাজান আমাকে কেন ডেকে পাঠালেন? সংবাদ শুনে তখনই সে নারীক্যাম্পের দিকে রওনা দেয়। সালমাদের তাঁবুর সম্মুখে দাঁড়িয়ে ভাবতে থাকে, আওয়াজ দেবে কি-না। এমন সময় তাঁবুর পর্দা ফাঁক হয়ে একটি শ্রীমান মুখমন্ডল আত্মপ্রকাশ করে। লোকটি সালমা। সালমা পর্দা ফাঁক করে রূপবান চেহারাখানা বের করে তাকিয়ে আছে। মুখে মিটিমিটি দুষ্টু হাসি। সরোয়ার বলল– 'চাচাজান আমাকে আসতে বলেছেন।'

'একটু দাঁড়ান' বলেই সালমা ভিতরে ঢুকে যায়। তৎক্ষণাৎ হাবীবের কণ্ঠ ভেসে আসে– 'ভেতরে আসো সরোয়ার!' সরোয়ার তাঁবুর ভেতরে প্রবেশ করে। হাবীব তাঁবুর একটি খুঁটির সঙ্গে হেলান দিয়ে মেঝেতে বিছানো কালো কম্বলের উপর বসে আছেন। তার সামান্য দূরে অপর প্রান্তে সালমা দাঁড়িয়ে আছে।

সরোয়ার আদবের সঙ্গে হাবীবকে সালাম করে। হাবীব সালামের উত্তর দিয়ে বললেন– 'এস, বসো সরোয়ার!' সারোয়ার এগিয়ে গিয়ে হাবীব থেকে খানিক দূরে কম্বলের উপর বসে পড়ে। হাবীব জিজ্ঞেস করেন– 'জর্জিরের নিকট গিয়েছিলে?'

ঃ হ্যাঁ, আমি, ইবনে জাফর ও ইবনে আব্বাস গিয়েছিলাম।

ঃ সে-কারণেই তোমার তাঁবুতে সংবাদ পাঠিয়েছিলাম, যেন ফিরে এসে আমার সঙ্গে দেখা কর। আমি ওখানকার কারগুজারি শুনতে উদগ্রীব হয়ে আছি।

ঃ আমিও বিষয়টি বুঝেছি। তাই সংবাদটা পাওয়ামাত্র চলে এলাম।

ঃ আচ্ছা, খ্রিস্টানদের সৈন্যসংখ্যা কত হবে আন্দাজ করতে পেরেছ?

ঃ সেটা তো গুপ্তচরদের মাধ্যমেই জেনেছি– এক লাখ বিশ হাজার। তা ছাড়া তাদের ক্যাম্পে প্রবেশ করে যতদূত চোখ গেছে, শুধু সৈন্যের বানই দেখতে পেয়েছি।

ঃ জর্জিরকে দেখেছ?

ঃ হ্যাঁ, তার সঙ্গেই কথা হয়েছে।

ঃ বয়স কত হবে?

ঃ চল্লিশ-পয়তাল্লিশ। সুঠাম-সুস্বাস্থ্যবান লোক।

ঃ কী কথা হল?

সরোয়ার জর্জিরের সঙ্গে যা-যা কথাবার্তা হয়েছে, তার বৃত্তান্ত শোনায়। শুনে হাবীব বললেন– 'আমি জানতাম, জর্জির আমাদের কোনো প্রস্তাবই গ্রহণ করবে না। তার আছে সোয়া লাখ সৈন্য। শুনেছি, তার কন্যাও তার সঙ্গে এসেছে?'

কন্যার উল্লেখে সালমা চোখ তুলে সরোয়ারের প্রতি তাকায়। সরোয়ার উত্তর দেয়– 'জি, জর্জিরের মেয়েও তার সঙ্গে এসেছে।'

ঃ শুনেছি, মেয়েটি না-কি খুব বীরাঙ্গনা?

ঃ শুনেছি তো আমিও। কিন্তু একনজর যা দেখেছি, তার চেহারায় তো বীরত্বের কোনো ছাপ দেখিনি।

ঃ ক্ষীণা না-কি?

ঃ না, স্বাস্থ্যবতী।

ঃ মনে হয় খুব রূপসী।

ঃ তা বটে। অত্যন্ত রূপসী মেয়ে।

সালমার চেহারায় ঈর্ষার ছাপ ফুটে ওঠে।

হাবীব জিজ্ঞেস করেন– 'সে-ও কি দরবারে উপস্থিত ছিল?'

ঃ ছিল। পিতার এক পার্শ্বে বসা ছিল। একে তো রূপসী, তদুপরি মিহিন ও টাইট রেশমি পোশাক পরিহিতা ছিল। পুরো পোশাক মুক্তাখচিত ছিল, যা ঝলমল করছিল। গায়ের অলংকারগুলোও মুক্তার ছিল, যার কিরণে তার সমস্ত শরীর ঝকমক করছিল।

ঃ খ্রিস্টানদের সমাজে পর্দা নেই। আরসানুসও আমাকে বলেছিল, হাজার-হাজার বীর খ্রিস্টানযোদ্ধা শুধু রাজকুমারীর কারণে যুদ্ধে এসেছে।

ঃ আমিও এমনটি শুনেছি।

ঃ জর্জির সম্ভবত কাল রণাঙ্গনে আসবেন।

ঃ আমারও তা-ই ধারণা।

আরও কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলে সরোয়ার চলে যায়। খ্রিস্টান সৈন্যরা রাতে হঠাৎ আক্রমণ করতে পারে আশঙ্কায় মুসলিম ফৌজের প্রতিটি ইউনিটের কিছু-কিছু সৈন্য প্রহরায় নিয়োজিত রয়েছে। নারীক্যাম্পটি বাহিনীর মধ্যস্থলে অবস্থিত হলেও সেনাপতির নির্দেশে সরোয়ার টহল শুরু করে দেয়। মাত্র দুজন অশ্বারোহীকে নিয়ে সে নারীক্যাম্পের চারদিকে ঘোরাফেরা করতে থাকে। তিনজন ক্যাম্পের খানিক দূরে-দূরে আলাদা-আলাদাভাবে টহল দিতে থাকে।

সরোয়ার হাঁটতে-হাঁটতে একবার সালমাদের তাঁবুর নিকট পৌছে যায়। সেখানে কাউকে হাঁটাচলা করতে দেখে। এখনও সন্ধ্যা রাত। আকাশে চাঁদ উঠেছে। জোৎস্নার আলো ফুটতে শুরু করেছে। তবে, রাত বেশি না-হলেও ক্যাম্পের নারী ও শিশুরা শুয়ে পড়েছে। চারদিকে নীরবতা নেমে এসেছে। সরোয়ার যে-ছায়াটি দেখেছিল, সে তার দিকে এগিয়ে যায়। তাকে এগোতে দেখে ছায়াটি পিছনে সরে যেতে শুরু করে। সরোয়ার একপা অগ্রসর হচ্ছে, তো ছায়াটিও একপা সরে যাচ্ছে। কিছুদূর গিয়ে ছায়াটি দাঁড়িয়ে যায়। সরোয়ার তার নিকট গিয়ে দেখে, সালমা দাঁড়িয়ে আছে। সরোয়ার বিস্ময় প্রকাশ করে– 'তুমি? সালমা?'

চাঁদের আলোতে সালমার মুখমণ্ডল চাঁদের চেয়েও বেশি উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। সে ঠোঁটের উপর আঙুল চেপে ফিসফিস কণ্ঠে বলল– 'আস্তে বলো।'

সরোয়ার রূপসী মেয়েটির নিকটে গিয়ে দাঁড়ায়– 'এ-সময়ে এখানে তুমি কী করছ?'

ঃ চাঁদনি রাতে ভ্রমণের মজা উপভোগ করছি।

ঃ তোমার কাছে চাঁদনি রাত খুব ভালো লাগে, তাই না?

ঃ হ্যাঁ। বলুন তো রাজকুমারীকে সত্যিই দেখেছেন?

ঃ সত্যিই দেখেছি।

ঃ খুব সুন্দরী, না?

ঃ খুবই সুন্দরী।

ঃ তাকে দেখার জন্যই ওখানে গিয়েছিলেন?

ঃ না, তাকে দেখার আমার বিলকুল আগ্রহ ছিল না।

ঃ কিন্তু দেখার পরে...।

সরোয়ার কথা কেটে বলল– 'পুনরায় দেখার আকাঙ্খা জাগেনি।'

ঃ কিন্তু সে তো অত্যন্ত সুন্দরী?

ঃ তা অস্বীকার করি না। কিন্তু আমার চোখে তুমি তার চেয়ে বেশি সুন্দরী। সে যদি আফ্রিকার চাঁদ হয়ে থাকে, তো তুমি আরবের সূর্য।

সালমা মুচকি হেসে সরোয়ারের প্রতি তাকায়।

সরোয়ার বলল– 'আমার কথাটা কি তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না?'

ঃ আপনি বললে বিশ্বাস না-করার কী আছে।

ঃ আমার কথায় বিশ্বাস করো না।

ঃ ব্যস, এই তো আপনি রেগে গেলেন!

ঃ তোমার উপর রাগ করার আমার অধিকার আছে নাকি?

ঃ ঠিক আছে, আমার ভুল হয়ে গেছে; মাফ করে দিন।

সরোয়ার খুশি হয়ে উজ্জ্বলমুখে বলল– 'সালমা, আমি কোনো অবস্থাতেই তোমার প্রতি নাখোশ হতে পারি না। কিন্তু এ-সময়ে তুমি এখানে কী করছিলে?

ঃ বললাম তো জোছনার মজা উপভোগ করছিলাম।

ঃ না, এটা নয়।

ঃ আর কী হতে পারে?

ঃ তুমি জানতে চাচ্ছিলে, রাজকুমারীর রূপ আমার মনের উপর কোনো প্রভাব বিস্তার করেছে কি-না।

ঃ আপনার ধারণা ভুল নয়। আমি শুনেছি, রাজকুমারী হেলেন অতিশয় রূপসী।

ঃ সত্য বলতে কি, আমি না তাকে ভালোভাবে দেখেছি, না দেখার ইচ্ছা আছে।

ঃ তো আপনি কার উপর অনুগ্রহ করলেন?

ঃ সে সিদ্ধান্ত তুমি নিজেই নিতে পার।

সালমা হেসে বলল– 'আমি তো আপনাকে খুব সরল মানুষ মনে করতাম। এখন দেখছি খুব চালাক আপনি।'

ঃ মাফ করো, তুমিই আমাকে চালাক বানিয়েছ।

ঃ আরও অনুশীলন করুন; পুরোপুরি চালাক হয়ে যাবেন।

বলেই সালমা হাসতে-হাসতে চলে যেতে উদ্যত হয়। সরোয়ার বলল– 'একটু দাঁড়াও সালমা!'

সালমা দাঁড়িয়ে বলল– 'বলুন।'

ঃ সেদিন চাচাজান তোমাকে কিছু বলেছিলেন?

ঃ কিচ্ছু বলেননি।

ঃ আল্লাহর শোকর...। অবশ্য তিনি তোমাকে কিছু বলতে পারেনও না।

ঃ কেন?

ঃ তুমি তার আদরের দুলালী যে!

সালমা দুষ্টু হাসি হেসে বলল– 'আপনি খুব বেড়ে গেছেন।' তারপর 'আসসালামু আলাইকুম' বলেই সালমা দ্রুতপায়ে চলে যায়। সরোয়ার নির্বাক্‌চোখে তার পানে তাকিয়ে থাকে।

ত্রিশ.

মুসলিম দূতগণ যেদিন জর্জিরকে ইসলামী বাহিনীর বার্তা পৌছিয়ে দিয়ে আসে, তার পরদিনই সকালবেলা খ্রিস্টান বাহিনীতে তৎপরতা ও নড়চড় শুরু হয়ে যায়। রণডংকার ভয়ংকর বাজনা মুসলমানদের জানিয়ে দেয়, খ্রিস্টানরা রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হচ্ছে। আব্দুল্লাহ ইবনে সা'দ তৎক্ষণাৎ সকল কমান্ডারের নিকট আদেশ প্রেরণ করেন– 'নিজ-নিজ বাহিনী নিয়ে রণাঙ্গনে পৌছে যাও।' আদেশ পাওয়ামাত্র কমান্ডারগণ আপন-আপন বাহিনীকে অস্ত্রসজ্জিত হওয়ার আদেশ দেয় এবং নিজেরাও প্রস্তুত হয়ে যায়।

পুব আকাশে সূর্য উদিত হলে খ্রিস্টান বাহিনী মাঠে এসে-এসে এদিক-ওদিক ছড়িয়ে যেতে শুরু করে। ইসলামের সৈনিকরাও ময়দানে এসে-এসে খ্রিস্টানদের মুখোমুখি সারিবদ্ধ হতে শুরু করে। অল্পক্ষণের মধ্যেই সমগ্র বাহিনী রণাঙ্গনে পৌছে যায়। সেনাপতি আব্দুল্লাহ ইবনে সা'দ নিজে বাহিনীকে বিন্যস্ত করেন। ডানে ইবনে ওমর, বাঁয়ে ইবনে আব্বাস, পশ্চাতে হাসান, ডান বাহুতে ইবনে জাফর এবং বাম বাহুতে হযরত হুসাইনকে মোতায়েন করেন। মধ্যস্থলে সেনাপতি নিজে অবস্থান গ্রহণ করেন। সরোয়ারকে নারীক্যাম্পের নিরাপত্তার পাশাপাশি যেদিকে মুসলমানদের উপর তীব্র আক্রমণ প্রত্যক্ষ করবে, সেদিককার সাহায্যে এগিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব প্রদান করা হয়।

জর্জিরের এক লাখ বিশ হাজার সৈন্য। মুসলমান মাত্র ত্রিশ হাজার। তাই জর্জির তার গোটা বাহিনীকে একসঙ্গে নামানোর প্রয়োজন অনুভব করলেন না। তিনি তার অর্ধেক সৈন্য– অর্থাৎ– মাত্র ষাট হাজার সৈন্যকে মাঠে এনে দাঁড় করান এবং তাদেরকে সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ প্রদান করেন। এই বাহিনীতে আছে তার বাছা-বাছা সামরিক নেতা, সেনাপতি মারকুস এবং তিনি নিজে।

সম্রাটের ইঙ্গিত পাওয়ামাত্র খ্রিস্টানবাহিনী বানের মতো অগ্রসর হতে শুরু করে। তারা হাজার-হাজার পতাকা উঁচিয়ে এগিয়ে যায়। আব্দুল্লাহ ইবনে সা'দ দ্রুতগতিতে ঘোড়া হাঁকিয়ে সারির সম্মুখ দিয়ে টহল প্রদান করেন এবং ইসলামের মুজাহিদদের উদ্দেশে ভাষণ দান করেন–

'ইসলামের বীর শার্দূলগণ, বিপুলসংখ্যক শত্রুসেনা বিক্ষুব্ধ তরঙ্গের মতো ধেয়ে আসছে। তোমরা মুসলমান। এরূপ তরঙ্গের মোকাবেলা করা মুসলমানদের পক্ষে কোনো ব্যাপার নয়। সংখ্যার আধিক্য নয়– আমাদের শক্তি হচ্ছে ঈমান। তোমরা খ্রিস্টানদের আধিক্যের কোনো তোয়াক্কা করো না। তারা ভোগ-বিলাসিতায় নিমজ্জিত কাপুরুষ। তারা মহান আল্লাহর বিরাগভাজন জাতি। কারণ, তারা নবী হযরত ঈসাকে আল্লাহর পুত্র সাব্যস্ত করেছে। তারা ধর্মকে হাসি-খেলনার পাত্রে পরিণত করেছে।

'বীর মুজাহিদগণ, তোমরা মহান আল্লাহর অনুগত বান্দা। তোমরা বিলাস-বিবর্জিত কষ্টসহিষ্ণু জাতি। তোমাদের জীবন-মরণ দু-ই আল্লাহর জন্য। তোমরা আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। আল্লাহও তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট। আল্লাহ তোমাদের সাহায্যকারী। তিনি অতীতেও সকল ক্ষেত্রে তোমাদের সাহায্য করেছেন এবং এখনও করবেন।

'ইসলামের বীর সৈনিকগণ, জান্নাত তোমাদের হাতছানি দিয়ে ডাকছে। জান্নাতের দূতগণ শহীদদের স্বাগত জানানোর জন্যে জান্নাতের দরজায় এসে দাঁড়িয়ে আছে। আল্লাহ তোমাদের দেখছেন। তোমরা তোমাদের সহজাত বীরত্বের মাধ্যমে জান্নাতুল ফেরদাউস অর্জন করে নাও।

'ওহে ইসলামের প্রিয় সন্তানগণ, তোমাদের বীরত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনের সময় এসে গেছে। তোমরা তোমাদের তরবারির সক্ষমতার প্রমাণ দাও। বাহুর শক্তি ব্যয় করো এবং বীর-বিক্রমে শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ো। প্রমাণ করো, মুসলমান মৃত্যুক ভয় করে না। শত্রুকে বুঝিয়ে দাও, মুসলমানের সঙ্গে যুদ্ধ করা আর আত্মহত্যা করা এক বিষয়।'

সেনাপতি আব্দুল্লাহ ইবনে সা'দের এই সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে মুসলিম সৈন্যদের হৃদয়ে উত্তেজনা-উদ্দীপনার ঝড় সৃষ্টি হয়। বীরত্বের জোশে প্রতিজন মুজাহিদদের চেহারা জ্বলজ্বল করে ওঠে।

এতক্ষণে খ্রিস্টান বাহিনী মুসলিম বাহিনীর সন্নিকটে এসে পৌঁছেছে। খ্রিস্টানরা তরবারি উঁচিয়ে ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে বীর-বিক্রমে এগিয়ে আসে। সংখ্যায় তারা বিপুল। সারিগুলো কয়েক মাইল পথ দীর্ঘ।

মুসলমানরাও তাদের সামনাসামনি দাঁড়িয়ে যায়। খ্রিস্টানরা একেবারে নিকটে চলে এলে সেনাপতি আব্দুল্লাহ ইবনে সা'দ সজোরে আল্লাহু আকবার তাকবীরধ্বনি তোলেন। মুসলমানগণ নিজ-নিজ স্থানে পূর্ণ প্রস্তুতিসহকারে দাঁড়িয়ে থাকে। তারা ক্রুদ্ধচোখে খ্রিস্টানসেনাদের দেখতে শুরু করে। খ্রিস্টানরা অতিশয় জোশ ও বীরত্বের সঙ্গে এমনভাবে এগিয়ে আসে, যেন এসেই তারা মুসলমানদের হত্যা করে ফেলবে। আব্দুল্লাহ ইবনে সা'দ পুনরায় গলা ফাটিয়ে আল্লাহু আকবার ধ্বনি দেন। সঙ্গে-সঙ্গে মুজাহিদগণ বাঁ হাতে ঢাল আর ডান হাতে তরবারি তুলে প্রস্তুত হয়ে যায়। খ্রিস্টানরা সোজা ধেয়ে আসছে। মুসলমানগণ কয়েক পা দূরে দাঁড়িয়ে যায়।

আব্দুল্লাহ ইবনে সা'দ তৃতীয়বার তাকবীরধ্বনি তোলেন। বাহিনীর সকল সৈন্য এই পবিত্র ধ্বনির প্রতিধ্বনি করে। তাদের আল্লাহু আকবার ধ্বনিতে সমস্ত রণাঙ্গন কেঁপে ওঠে। তাকবীরধ্বনি তুলেই মুসলমানরা সিংহের মতো লাফিয়ে খ্রিস্টানদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং এমন জোরদার আক্রমণ চালায় যে, অসীম বীরত্ব ও জোশের সঙ্গে ধেঁয়ে-আসা খ্রিস্টান সৈনিকরা ভয়ে থমকে যায়। তারা নিজেদের সামলে নিতে-না-নিতে মুসলমানগণ তড়িঘড়ি আক্রমণ করে তাদের প্রথম সারির কয়েক হাজার সৈন্যকে মৃত্যুর কোলে তুলে দেয়। তবে খ্রিস্টানরা সহজেই আত্মসংবরণ করে প্রবল উদ্দীপনার সঙ্গে পালটা আক্রমণ চালিয়ে বেশ কিছু মুসলমানকে শহীদ করে ফেলে।

ইসলামের বীর সৈনিকগণ যখন তাদের কতিপয় ভাইকে শহীদ হতে দেখে, তখন তারা আরও ক্ষুব্ধ ও উজ্জীবিত হয়ে ওঠে। তারা পুনর্বার এমন তীব্রতা ও বীরত্বের সঙ্গে হামলা চালায় যে, খ্রিস্টানরা ভয় পেয়ে যায়। এখন প্রতিজন মুসলমান ক্ষ্যাপা সিংহ। তারা খ্রিষ্টানদের এমনভাবে হত্যা করতে শুরু করে, যেন তারা প্রাণহীন মূর্তি। খ্রিস্টানসেনাদের প্রথম সারিটি সম্পূর্ণ হত্যা করে মাটিতে শুইয়ে দিয়ে দ্বিতীয়টিকেও প্রায় নিঃশেষ করে তৃতীয় সারিতে ঢুকে পড়ে। এভাবে যুদ্ধের আগুন উত্তেজিত হতে-হতে দূর-দূরান্ত পর্যন্ত পৌঁছে যায় এবং তার লেলিহান শিখা একের-পর-এক মানুষ ভস্ম করতে শুরু করে।

দুই পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। চকচকে সাদা ধারালো তরবারি চারদিকে উত্তোলিত হচ্ছে। সাদা তরবারিগুলো মানুষের রক্তে লাল হয়ে গেছে। খ্রিস্টানরা যখন দেখল, মুসলমানগণ পরম উদ্দীপনার সঙ্গে তাদের হত্যা করে ফিরছে এবং তাদের তরবারি থেকে রক্ষা পাওয়া কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে, তখন তারাও জীবন দেওয়া-নেওয়ার খেলায় মরিয়া হয়ে ওঠে। তারাও বীর-বিক্রমে

মুসলমানদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। উভয়পক্ষ পরস্পরের উপর অত্যন্ত জোরদার আক্রমণ শুরু করে। তরবারিগুলো আপন-আপন পরাকাষ্ঠা দেখাতে থাকে। উভয়পক্ষের বীর সৈনিকগণ জীবনবাজি আক্রমণ করতে থাকে এবং কালবৈশাখীর ঝড়ে বৃক্ষ থেকে আম ঝরার ন্যায় টুপটুপ করে দেহ থেকে মস্তক ঝরে পড়তে শুরু করে।

সূর্যটা এখন মাথার উপর উঠে এসেছে। সূর্যতাপের মতো যুদ্ধের তেজও তীব্র আকার ধারণ করেছে। এখন ঘোরতর যুদ্ধ চলছে। উভয় পক্ষের বহু সারি ভেঙে গেছে। খ্রিস্টানরা মুসলমানদের অভ্যন্তরে এবং মুসলমানরা খ্রিস্টানদের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়েছে। উভয়পক্ষের সৈনিকরাই যুদ্ধে এমনভাবে লিপ্ত হয়ে পড়েছে যে, কারুরই ভ্রূক্ষেপ নেই, পাশে তার কোনো সঙ্গী আছে কি নেই। প্রত্যেকে নিজেকে নিয়েই মহাব্যস্ত। সবাই যারপরনাই রোষ ও জোশের সঙ্গে যুদ্ধ করছে। আক্রমণটা শত্রুর উপর করছে, না-কি আপনদের উপর– সেই খবরও কারও নেই।

হযরত হাসান ও হযরত হুসাইন (রা.) উভয়ে একহাতে ঢাল, অপর হাতে তরবারি ধারণ করে বীর-বিক্রমে আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছেন। খ্রিস্টানরা সর্বশক্তি ব্যয় করে তাদের প্রতিহত করার চেষ্টা করছে; কিন্তু পেরে উঠছে না। তারা এক-দুজনের উপর আক্রমণ করছেন না– করছেন এক-একটি দলের উপর এবং সেই দলটিকে সম্পূর্ণ খতম না-করে নিঃশ্বাস ফেলছেন না। একটি দলকে নিঃশেষ করে আরেকটির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ছেন। বয়সে তরুণ বলে খ্রিস্টানরা তাদের আনাড়ি ভেবেছিল। কিন্তু আক্রমণের তীব্রতা ও দক্ষতা দেখে তারা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে এদিক-ওদিক পালাতে শুরু করে। কিন্তু হাশেমি যুবকদ্বয় কাউকে রেহাই দিচ্ছেন না। তারা লাফিয়ে-লাফিয়ে ছুটে-ছুটে পলায়নপর খ্রিস্টানসেনাদের উপর আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছেন। অগত্যা খ্রিস্টানরাও বেসামাল হয়ে তাদের উপর এলোপাতাড়ি হামলা চালাতে সচেষ্ট হয়। কিন্তু তারা তাদের গায়ে একটি আঁচড়ও বসাতে সক্ষম হয়নি। দুই মুসলিমসেনা খ্রিস্টানদের লাশের স্তূপ জমিয়ে ফেলে।

সূর্যটা এখন পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়েছে। দিনভর ঘোরতর যুদ্ধ লড়ে-লড়ে উভয়পক্ষ ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। জর্জির তার বাহিনীকে পিছনে সরে যাওয়ার ইঙ্গিত প্রদান করেন। মুসলমানরাও পিছনে সরে যায়। যুদ্ধ বন্ধ হয়ে যায়। উভয়পক্ষ জয়-পরাজয়ের কোনো সিদ্ধান্ত ছাড়াই নিজ-নিজ ক্যাম্পে ফিরে যায়। তার কিছুক্ষণ পর উভয়পক্ষ ময়দান থেকে নিজ-নিজ আহত-

নিহতদের তুলে নিতে শুরু করে। উভয়পক্ষই প্রথমে আহতদের এবং পরে নিহতদের লাশ তুলে নেয়। খ্রিস্টান আহত হয়েছে ছয় হাজার, নিহত হয়েছে বিশ হাজার। মুসলমান আহত হয়েছে দুশ আর শহীদ হয়েছে একশ ষাটজন। উভয়পক্ষ নিহতদের দাফন ও আহতদের ব্যান্ডেজ-চিকিৎসায় আত্মনিয়োগ করে।

একত্রিশ.

মুসলমানদের ধারণা ছিল, খ্রিস্টানরা পরদিনও রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হবে। কেননা, বিশ হাজারের মৃত্যুর পর এখনও তাদের এক লাখ সৈন্য জীবিত আছে। কিন্তু, এদিন তারা ময়দানে আসেনি। মুসলমানরাও নিজ থেকে এগিয়ে যাওয়া সমীচীন মনে করেনি। সেনাপতি আবদুল্লাহ ইবনে সা'দ ঘোষণা করিয়ে দেন– 'যে-পর্যন্ত খ্রিস্টানরা আপনা থেকে ময়দানে অবতীর্ণ না হবে, সে-যাবত আমরাও ক্যাম্প থেকে বের হব না। তবে আমাদেরকে প্রতিটি মুহূর্ত সজাগ ও প্রস্তুত থাকতে হবে, যাতে অসাবধানতার সুযোগে খ্রিস্টানরা আমাদের উপর হঠাৎ আক্রমণ করে বসতে না পারে।'

মুসলমানগণ সজাগ ও প্রস্তুত হয়ে যায়। তারা সব ধরনের সাবধানতা অবলম্বন করে সময় অতিবাহিত করতে থাকে। ওদিকে খ্রিস্টানদের অন্তরে মুসলমানদের প্রভাব ও ভীতি ঢুকে পড়েছে। তাদের অর্ধেক সৈন্য যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল। যারা অংশগ্রহণ করেনি, তারা যারা অংশ গ্রহণ করেছে, তাদের নিকট থেকে মুসলমানদের বীরত্ব ও রণকৌশলের কাহিনী শুনে আতঙ্কিত হয়ে ওঠে। স্বয়ং সম্রাট জর্জির এবং সেনাপতি মারকুসের হৃদয়েও মুসলমানদের শক্তি ও সাহসের ভয় ঢুকে পড়েছে। মাত্র একদিনের যুদ্ধে বিশ হাজার সৈন্যের প্রাণহানি এবং ছয় হাজারের বেশি আহত হওয়ার ঘটনা তাদের ভাবিয়ে তুলেছে। তারা শঙ্কিত হয়ে পড়েছে যে, এই ধারা যদি অব্যাহত থাকে, তা হলে মুসলমানদের হাতে খ্রিস্টানদের এই সুবিশাল সৈন্যবাহিনী সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যাবে।

জর্জির পরদিন রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হওয়ার সাহস করেননি। বরং নিজ বাহিনীতে ঘোষণা করিয়ে দেন, গত কালের যুদ্ধের কারণে সৈনিকরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছে; তাই দু-চার দিনের বিশ্রামের সুযোগ দেয়া হল।

বিকালে জর্জির পরামর্শে বসেন। সেনাপতি মারকুস, প্রধান পাদরি থেভড়োস এবং ছোট-বড় সকল অফিসার ও পাদরিদের বৈঠকে তলব করেন। সকলে এসে উপস্থিত হলে তিনি বললেন–

'খ্রিস্টান সৈনিকগণ, গত কালের যুদ্ধে আমাদের কী পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে, তা তোমাদের সকলেরই জানা আছে। আমার ধারণা ছিল, জয়ের জন্য আমাদের অর্ধেক সৈনিকই যথেষ্ট হবে। কিন্তু, আমাদের সৈনিকরা বীরত্বের প্রমাণ দিতে ব্যর্থ হয়েছে। আজ আমি ময়দানে অবতীর্ণ হওয়া সমীচীন মনে করিনি। কারণ, যদি সৈনিকরা আজও গত কালের ন্যায় কাপুরুষতা প্রদর্শন করে, তা হলে আমাদের বাহিনী সাহস হারিয়ে ফেলবে।'

বক্তব্য শেষ করে জর্জির ঢোক গেলেন। শ্রোতারা চুপচাপ তার বক্তব্য শুনছিল। এবার মারকুস বললেন– 'মহারাজের নিশ্চয়ই মনে আছে, আমি সমগ্র বাহিনী দ্বারা একযোগে আক্রমণ করাবার পরামর্শ দিয়েছিলাম।'

ঃ হ্যাঁ, আমার মনে আছে।

ঃ যদি সমগ্র বাহিনী একযোগে ঝাঁপিয়ে পড়ত, তা হলে কালই মুসলমানরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত।

ঃ আমি তোমার এই মূল্যায়ন মানতে প্রস্তুত নই। তুমি কি দেখোনি, মুসলমানরা যতদূর পর্যন্ত লড়াই করেছে, সর্বত্র কী পরিমাণ লাশ ফেলেছে? কীভাবে খ্রিস্টানসেনাদের মাথা ও ধড় কেটে-কেটে লুটিয়ে পড়েছে? আমি তো মনে করি, এক লাখে কেন, দুই লাখ সৈন্য দ্বারা আক্রমণ চালিয়েও তাদের কাবু করা সম্ভব হবে না।

ঃ আমাদের সৈন্যরা আশানুরূপ বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করেনি বলে মহারাজের মনে এই ধারণার জন্ম হয়েছে।

ঃ তা ঠিক।

ঃ আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে।

ঃ বলো।

ঃ মুসলমানদের বড় নেতা– যিনি এই বাহিনীর সেনাপতি এবং তারা যাকে আমীর উপাধিতে ভূষিত করে; তাকে যদি কোনো কৌশলে হত্যা করা যায়, তা হলে মুসলমানরা পালিয়ে যাবে। আর তখন পরিস্থিতি আমাদের অনুকূলে ফিরে আসবে।

প্রধান পাদরি বলে ওঠেন– 'আমিও এ-পরামর্শই দিতে চেয়েছিলাম। যাক আপনি বলে ফেললেন।'

জর্জির বললেন– 'তোমরা কি একে সহজ কাজ মনে কর?'

মারকুস বললেন– 'সহজ নয় বটে; কিন্তু করা দরকার। কাজটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বড় রকম একটা লোভনীয় পুরস্কার ঘোষণা করলে যে-কোনো অফিসার কিংবা সাধারণ সৈনিক কাজটা করতে উদ্বুদ্ধ হতে পারে।'

জর্জির জানতে চান– 'কী ঘোষণা দেয়া যেতে পারে?'

মারকুস বললেন– 'যেমন ধরুন, জায়গিরস্বরূপ জুম দুর্গটা দিয়ে দিলেন।'

জুম দুর্গ সাবতিলা নগরী থেকে দুই মনযিল সম্মুখে এক পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত। তার চার পাশের অঞ্চল অত্যন্ত সবুজ ও উর্বর।

থেভঢোস বললেন– 'নগদ অর্থ কিংবা জায়গিরে কাজ হবে না। এগুলো এমন কোনো বিষয় নয়, যার জন্য একজন সৈনিক কিংবা কমান্ডার জীবনের বাজি লাগাবে।'

জর্জির জিজ্ঞেস করেন– 'তা হলে কী দেয়া যেতে পারে?'

ঃ মহারাজের সম্মুখে মুখ খুলতে আমার ভয় লাগছে।

ঃ ভয়ের কোনো কারণ নেই। এইমুহূর্তে দেশ ও জাতির মর্যাদা ও অস্তিত্বের প্রশ্ন। তুমি নির্ভয়ে বলো।

ঃ এই যুদ্ধ শুধু জাতীয় যুদ্ধই নয়; এটি ধর্মযুদ্ধও। খ্রিস্টবাদ ও ইসলামের প্রশ্ন। আমার মিসর-সিরিয়ার ঘটনা ও পরিস্থিতি জানা আছে। মুসলমানরা ক্ষমতাসীন হওয়ার পর ওখান থেকে খ্রিস্টবাদের অস্তিত্ব মুছে যাচ্ছে আর ইসলাম দিন-দিন প্রসার লাভ করছে। নির্বোধ ও কাপুরুষ খ্রিস্টানরা মুসলমান হয়ে যাচ্ছে। আমার ভয় হচ্ছে, এই অবস্থা আর দিনকয়েক অব্যাহত থাকলে দেশ দুটিতে একজন খ্রিস্টানও অবশিষ্ট থাকবে না। আমার এ-ও আশঙ্কা হচ্ছে, জংলী মুসলমানরা আফ্রিকাও জয় করে নেবে আর তখন এই অঞ্চল থেকেও খ্রিস্টবাদ বিদায় নেবে।

জর্জির বললেন– 'এই আশঙ্কা আমারও।'

থেভঢোস বললেন– 'এইমুহূর্তে খ্রিস্টানদেরকে তাদের প্রিয়তম সম্পদগুলোও উদারমনে বিসর্জন দেয়া উচিত। সম্পদ, সন্তান ও জীবন– যখন যেটি প্রয়োজন, ত্যাগ করা দরকার। এটা খ্রিস্টানদের পরীক্ষার সময়। দেশ-জাতির এই ক্রান্তিলগ্নে যে-খ্রিস্টান প্রিয় ধর্মকে রক্ষার জন্য প্রিয় বস্তুটিকে বিসর্জন দিতে প্রস্তুত হবে, খোদা ও খোদার পুত্র যিশু তাকে স্বর্গে স্থান দেবেন।'

প্রধান পাদরি থেভঢোসের মনে জোশ এসে যায়। তিনি ভাষণ দিতে শুরু করেন। জর্জির ও উপস্থিত সকল শ্রোতা অত্যন্ত নীরবে ও মনোযোগসহকারে তার ভাষণ শুনছেন। তিনি বললেন–

'যিশু খোদার পুত্র ছিলেন। তিনি যা বলতেন, তাই হয়ে যেত। কিন্তু খোদা তার পরীক্ষা নিলেন। নির্দয়, জালেম ও রক্তপিপাসু খ্রিস্টানরা কাঁটার মুকুট পরিয়ে শূলে চড়িয়ে তাকে হত্যা করে। তাবৎ বিশ্বের খৃস্টানদের পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য এই ফাঁসি প্রদান করা হয়েছিল।

'যা হোক, খোদা আপন পুত্রের পরীক্ষা নিয়েছেন। এখন আবার পরীক্ষা দেয়ার সময় এসেছে। আজ কে আছে, যে এই পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবেন? প্রত্যেক খ্রিস্টানের প্রতিটি মূল্যবান ও প্রিয় বস্তু উৎসর্গ করার এখনই উপযুক্ত সময়।'

জর্জির বললেন– 'আপনি সম্পূর্ণ ঠিক বলেছেন। প্রত্যেক খ্রিস্টানেরই আপনাপন প্রিয় বস্তুটি বিসর্জন দেয়া দরকার। আমি মনে করি, প্রতিজন খ্রিস্টান এর জন্য প্রস্তুত থাকবে।'

সভার সবদিক থেকে আওয়াজ আসে– 'আমরা প্রস্তুত।'

থেভডোস বললেন– 'আমি সকল খ্রিস্টানের নিকট এমনই কামনা করি।'

জর্জির বললেন– 'যা হোক, সেই পুরস্কার নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল, যার লোভে প্রতিজন খ্রিস্টান জীবনের বাজি লাগাতে প্রস্তুত হবে।'

থেভডোস বললেন– 'আমি সেদিকেই অগ্রসর হচ্ছিলাম। কিন্তু ভয় লাগছে, আমার প্রস্তাবে মহারাজ অসন্তুষ্ট হন কি-না!'

ঃ আমি একজন পরিপক্ক খ্রিস্টান। ধর্মের প্রশ্নে নাখোশ হওয়ার কিছু নেই। আমিও যে-কোনো ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত আছি। আপনি অকপটে ও নির্ভয়ে আপনার প্রস্তাব ব্যক্ত করুন।

ঃ আমি জানি, মহারাজ পাকা ধার্মিক। ধর্মের ব্যাপারে অত্যন্ত উদার মানুষ। বলছিলাম...

ঃ বলুন, অকুণ্ঠচিত্তে বলুন।

ঃ মহারাজের জয় হোক। আপনি ঘোষণা করে দিন, যে-ব্যক্তি মুসলমানদের সেনাপতির মাথা কেটে আনতে পারবে, আপনি তার সঙ্গে রাজকুমারী হেলেনকে বিয়ে দেবেন।

সম্রাট জর্জির হঠাৎ থমকে গিয়ে চমকে ওঠেন। যতই ধর্মপরায়ণ হোন, রাজা তো! দাম্ভিক খ্রিস্টান সম্রাট, যিনি কিনা রাজা-বাদশা ব্যতীত আর সব মানুষকে তুচ্ছ জ্ঞান করেন। সকল খ্রিস্টান সম্রাটই এমন হয়ে থাকেন। সম্রাটকে নিশ্চুপ ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় দেখে থেভডোস বুঝে ফেলেন, প্রস্তাবটি সম্রাটের মনঃপূত হয়নি। এই প্রস্তাবে তিনি সম্মত নন। তাই তাকে উৎসাহিত ও উজ্জীবিত করে তোলার লক্ষ্যে বললেন– 'এই প্রস্তাব আমি চিন্তা-ভাবনা না-করে দিইনি। আপনি চিন্তা করুন, প্রথমত, ধর্মের জন্য মহারাজের এই ত্যাগ সমগ্র খ্রিস্টজগতে আপনাকে একজন ধর্মপরায়ণ রাজা হিসেবে বিখ্যাত করে তুলবে। দ্বিতীয়ত, ঘোষণা পেলে প্রত্যেক পদাতিক, প্রতিজন অফিসার ও অশ্বারোহী সেনা সর্বশক্তি ব্যয় করে জীবন বাজি রেখে যুদ্ধ করবে। ফলে যুদ্ধের কায়া বদলে যাবে এবং মুসলমানরা পরাজিত হবে। খ্রিস্টবাদের জয় হবে। শেষ পর্যন্ত

ত্যাগটা আপনাকে বরণ না-ও করতে হতে পারে। আপনি শুধু ঘোষণাটা দিন।'

ঃ আপনি আসলে সঠিক কথাই বলছেন। কিন্তু আমি ভাবছি, বিষয়টি আমার মর্যাদায় আঘাত হানবে কি-না। তা ছাড়া রাজকুমারীরও তো সম্মতির প্রয়োজন আছে।

ঃ আপনি ইতস্তত করবেন না। এটা পুণ্যের কাজ। মনটা শক্ত করে ঘোষণা দিয়ে দিন। মুসলমানরা যখন অধিকহারে নিহত হতে শুরু করবে, তখন তাদের সেনাপতি ময়দান ছেড়ে পালাতে বাধ্য হবে। অথবা এমনও হতে পারে, তার মাথার মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে শুনলে সে আত্মগোপনে চলে যাবে। তাতে কেউ তার মাথাও কাটতে পারবে না, হেলেনও আপনার হাতছাড়া হবে না। মধ্যখানে আমরা জয় ছিনিয়ে আনতে সক্ষম হব। বাকি রইল তার সম্মতি। সে আমি দেখব। আপনি নিশ্চিন্তে ঘোষণা দিন।

ঃ আপনি ঠিক বলেছেন, মাথার মূল্য ধার্য করা হয়েছে শুনলে মুসলমানদের সেনাপতি পালিয়ে যাবে আর তখন তার সৈন্যরাও ময়দানে থাকতে সাহস পাবে না। কৌশলটা মন্দ নয়।

ঃ জি, ঘটনাটা এমনই ঘটবে।

জর্জির আবেগ-উদ্দীপ্ত হয়ে বললেন– 'ঠিক আছে, আমি ঘোষণা দিলাম, যে ব্যক্তি– সে যে-স্তরেরই খ্রিস্টানই হোক না কেন– মুসলমানদের সেনাপতির মাথা কেটে আনবে, তার সঙ্গে রাজকুমারী হেলেনকে বিয়ে দেব।'

সম্রাটের ঘোষণা শুনে উপস্থিত সকলে আনন্দিত হয়ে ওঠেন। প্রধান পাদরি থেভচোস মহারাজের ধর্মপরায়ণতার প্রমাণ পেয়ে গেলেন। এখন কোনো শক্তিই খ্রিস্টানদের জয় ঠেকাতে পারবে না।

সেনাপতি মারকুস বললেন– 'আজ অবধি কোনো রাজা-বাদশা দেশ-জাতি-ধর্মের জন্য এমন ত্যাগ দিতে পারেননি। এখন বিশ্বময় আমাদের মহারাজের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়বে। যে-ই শুনবে, আমাদের মহারাজের নামটা শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারণ করবে।'

জর্জির বললেন– 'কত রাজকুমার তাকে পেতে আগ্রহী। কিন্তু আজ আমি তাকে নিলামে তুলে দিলাম। তার মূল্য মুসলমানদের একজন সেনাপতির মাথা। তোমরা সমগ্র বাহিনীতে ঘোষণাটা শুনিয়ে দাও।'

'আমি এখনই ঘোষণা দিচ্ছি' বলেই সেনাপতি মারকুস উঠে যান। সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। সম্রাট জর্জির উঠে নিজতাঁবুতে চলে যান। উপস্থিত সকলে ওঠে যার-যার অবস্থানে ফিরে যায়।

বত্রিশ.

থেভডোস যখন সভাকক্ষ থেকে বের হন, তখন তার মনে বেজায় আনন্দ, যেন শত্রুপক্ষের কোনো দুর্ভেদ্য দুর্গ জয় করে ফেলেছেন। আনন্দে চেহারাটা তার জ্বলজ্বল করছে। আনন্দের সাগরে হাবুডুবু খেতে-খেতে তিনি রাজকুমারী হেলেনের তাঁবুর দিকে রওনা দেন। সম্রাট জর্জিরকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে যেভাবে তার প্রস্তাবে সম্মত করিয়েছেন, তেমনি স্বয়ং রাজকুমারী থেকেও সম্মতি আদায় করে তার দ্বারাও প্রচার করাতে চাচ্ছেন, যে-ব্যক্তি মুসলমানদের সেনাপতির মাথা কেটে আনবে, তাকে আমি স্বামী হিসেবে বরণ করে নেব।

থেভডোস রাজকুমারীর তাঁবুর সম্মুখে পৌছে যান। প্রহরীরা মাথা ঝুঁকিয়ে তাকে শ্রদ্ধা জানায়। এক প্রহরী দ্রুত ছুটে গিয়ে ভিতরে সংবাদ জানায়, প্রধান পাদরি এসেছেন। সেবিকা রাজকুমারীকে সংবাদটা জানায়। রাজকুমারী থেভডোসের অকৃত্রিম ভক্ত। সংবাদ পাওয়ামাত্র সে পাদরিকে স্বাগত জানানোর জন্য ছুটে যায়।

থেভডোস তাঁবুতে প্রবেশ করতে-না-করতেই রাজকুমারী দরজায় এসে দাঁড়ায়। আদবের সঙ্গে পাদরি সম্মুখে দাঁড়িয়ে তার ঢোলা জুব্বার এক কোণ নিজের কোমল হাতে নিয়ে চুম্বন করতে শুরু করে। থেভডোস মাথায় হাত বুলিয়ে তাকে আশির্বাদ প্রদান করেন।

রাজকুমারী উঠে দাঁড়ায়। পাদরি গলায় ঝুলন্ত ঝপমালাটি ধরে তার দানা নিয়ে খেলতে-খেলতে বলল– 'আজ আপনি আমার উপর বিরাট অনুগ্রহ করলেন। আপনার আগমনে হৃদয়টা আমার গর্বে ভরে গেছে। আমি আপনাকে সশ্রদ্ধ স্বাগতম জানাচ্ছি।'

থেভডোস রাজকুমারীর লাল-সাদা কোমল ও [illegible]জুক গন্ডদেশের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বললেন– 'আমি তোমাকে বিশেষ একটি কথা [illegible]লার জন্য এসেছি হেলেন!'

হেলেন তার রাজকীয় তাঁবুর একধারে পাতানো মূল্যবান সোফাটার প্রতি অঙ্গুলিনির্দেশ করে বলল– 'চলুন, ওখানে বসে কথা বলি।' বলেই রাজকুমারী সোফাটার দিকে হাঁটতে শুরু করে। থেভডোসও রাজকুমারীর সঙ্গে এগোতে শুরু করেন। রাজকুমারীর পরিধানে সাদা রেশমের ঢিলা পোশাক, যা অতিশয় চিত্তাকর্ষক। মুখমন্ডলের বর্ণ আর পোশাকের রং এক। আজ অপূর্ব এক সৌন্দর্য বিকশিত হচ্ছে তার রূপময় দেহ থেকে।

হেলেন ও থেভডোস একই সোফায় গিয়ে উপবেশন করে। থেভডোস বললেন- 'রাজকুমারী, তুমি এত রূপসী যে, জীবনের এতগুলো বছর অতিক্রম করা সত্ত্বেও আমি তোমার ন্যায় হৃদয়কাড়া রূপসী নারী আর দেখিনি।'

হেলেন মিটিমিটি হাসতে শুরু করে। উদ্দীপ্তনয়নে থেভডোসের দিকে দৃষ্টিপাত করে বলল– 'মন্তব্যের জন্য আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ।'

ঃ আমার একান্ত কামনা, তুমি যতটা রূপসী, পৃথিবীজুড়ে তোমার রূপের যতটা খ্যাতি; ধর্মপরায়ণতা ও দেশপ্রেমে তুমি তদপেক্ষা বেশি বিখ্যাত হয়ে যাও।

ঃ এ-বিষয়টি তো আপনার হাতে। আপনি আমার ধর্মের প্রধান গুরু।

ঃ হ্যাঁ, আমার হাতেই। আমি তার আয়োজনও করে রেখেছি।

ঃ কী আয়োজন করেছেন?

ঃ আমি এমন একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছি, যার আওতায় হতভাগ্য মুসলমানদের হত্যা করার জন্য প্রতিটি খ্রিস্টান মনে-প্রাণে প্রস্তুত হয়ে যাবে এবং এক-একটি মুসলমানকে খুঁজে-খুঁজে হত্যা করে ফেলবে। তুমি কি এ-কাজে আমাকে সাহায্য করতে প্রস্তুত আছ?

হেলেন পরীর মতো হৃদয়কাড়া মুচকি হেসে বলল– 'অবশ্যই করব। আপনি বললে কেন করব না?'

ঃ ধর্মের জন্য তোমার আবেগ-উদ্দীপনা কতখানি আমি জানতাম। এবার শোনো, মুসলমানদের হত্যা ও ধ্বংসে খ্রিস্টানদের মাঝে উত্তেজনা সৃষ্টির লক্ষ্যে তাদেরকে এমন একটি পুরস্কারের লোভ দেখাতে হবে, যা অর্জনের জন্য তারা সর্বান্তকরণে মাঠে ঝাঁপিয়ে পড়বে।

ঃ আপনার চিন্তার সঙ্গে আমিও একমত।

থেভডোস রাজকুমারীর ঝলমলে মুখমন্ডলের উপর চোখ রেখে বললেন– 'আমি ও সম্রাট জর্জির এমন একটি পুরস্কার ঠিক করেছি, যার জন্য প্রতিজন খ্রিস্টান জীবন বাজি রেখে যুদ্ধ করবে।'

ঃ কী সেই পুরস্কার পবিত্র পিতা?

ঃ রাজকুমারী বিস্ময়মাখা চোখে থেভডোসের মুখপানে তাকিয়ে থাকে।

ঃ হ্যাঁ রাজকুমারী, সে হচ্ছ তুমি। আজ দেখে-না-দেখে প্রতিজন খ্রিস্টান তোমাকে ভালবাসে। গোটা খ্রিস্টজগত তোমাকে কামনা করে। কাজেই আমরা যখন ঘোষণা দেব...।

হেলেন কথা কেটে দিয়ে বলল– 'তার আগে একটা কথা বলুন।'

ঃ কী কথা?

ঃ এই পুরস্কার কীভাবে এবং কাকে দেয়া হবে?

ঃ ক্ষমা করো রাজকুমারী, আমার কথা শেষ হয়নি। মহান সম্রাট সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন, যে-ব্যক্তি মুসলমানদের সেনাপতির মাথা কেটে আনবে, তার সঙ্গে তোমাকে বিয়ে দেবেন।

ঃ উত্তর শুনে হেলেন ভাবনার জগতে হারিয়ে যায়। মাথাটা অবনত করে কিছুক্ষণ চিন্তা করে। থেভঢোস তার পানে তাকিয়ে আছেন। তিনি রাজকুমারীর উত্তরের অপেক্ষা করছেন। কিন্তু, অনেকক্ষণ পরও রাজকুমারীর মুখ থেকে কোনো কথা বের না-হওয়ায় থেভঢোস বললেন– 'এত কী চিন্তা করছ রাজকুমারী!'

এবার হেলেন মাথা তুলে থেভঢোসের মুখপানে তাকিয়ে বলল– 'মহারাজ এ কী সিদ্ধান্ত নিলেন গুরু!'

ঃ কেন? তোমার কি দ্বিমত আছে?

ঃ দ্বিমত থাকারই তো কথা।

ঃ কেন?

ঃ কারণ, রাজবংশের একটি মেয়ের বিয়ে যে-কোনো সাধারণ খ্রিস্টানের সঙ্গে হতে পারে না।

ঃ এ তো সকলেরই জানা কথা।

ঃ তার পরও তিনি এমন অপমানজনক সিদ্ধান্ত কেন নিলেন?

ঃ তার একমাত্র কারণ, এ-ছাড়া দেশ ও জাতির অস্তিত্ব রক্ষা করার আর কোনো উপায় নেই।

ঃ কিন্তু পবিত্র পিতা, এ যে বিরাট অপমান ও লজ্জার ব্যাপার!

ঃ তোমার ধারণা ঠিক নয়। এতে বরং তোমার মর্যাদা বৃদ্ধিই পাবে। বিশ্বময় তোমার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়বে। অন্য সকল রাজকুমারী তোমাকে ঈর্ষা করবে।

ঃ তা হলে সম্রাট হেরাক্লিয়াস এমনটি করলেন না কেন?

ঃ অবশ্যই করতেন। কিন্তু তার কোনো কন্যা ছিল না।

ঃ ইরানের সম্রাটও তো এমন কোনো ঘোষণা দেননি! তার তো একাধিক রূপসীকন্যা ছিল?

ঃ তিনি দম্ভ প্রদর্শন করেছেন। আর সে-কারণেই তার পরাজয় ঘটেছে এবং তাকে নির্বাসিত জীবনে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে।

ঃ কিন্তু আমার মন এই অপমান মেনে নিতে রাজি নয়।

ঃ আমার প্রাণপ্রিয় কন্যা, এটা অপমান নয়– মর্যাদা। তুমি বুঝতে চেষ্টা করো।

ঃ বোধ হয় আপনিই মহারাজকে পরামর্শটা দিয়েছিলেন?

ঃ তা সত্য। শোনো রাজকুমারী, এর দ্বারা আমার ও মহারাজের উদ্দেশ্য হচ্ছে, ঘোষণাটা দিলে খ্রিস্টানদের মাঝে জীবনদানের এমন স্পৃহা জাগ্রত হবে, যার বলে তারা মুসলমানদের পায়ের তলার মাটি সরিয়ে দেবে এবং তাদের পরাজিত করে তাড়িয়ে দেবে।

ঃ এটাই কি উদ্দেশ্য?

ঃ হ্যাঁ, এটাই আমাদের লক্ষ্য। পুরস্কারটা লোভনীয় উপায়ে ঘোষণা দেয়ার জন্য মুসলিম সেনাপতির মাথার শর্ত আরোপ করা হয়েছে মাত্র।

হেলেনের ফ্যাকাশে চেহারায় ঔজ্জ্বল্য ফিরে আসে– 'আমি এবার বিষয়টি বুঝেছি।'

ঃ তা হলে তুমি রাজি?

ঃ হ্যাঁ, মহারাজ যেখানে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন, সেখানে আমার সম্মতির কী প্রয়োজন।

ঃ বিষয়টি সরাসরি তোমার সঙ্গে সম্পৃক্ত। সে-কারণে তোমার সম্মতিরও প্রয়োজন আছে।

ঃ এ-কাজে আমি কি কিছু পুণ্যেরও আশা করতে পারি?

ঃ পার। খোদার দরবারে অনেক পুণ্য পাবে হেলেন!

ঃ তা হলে আমি সম্মত।

ঃ প্রধান পাদরি থেভঢোসের চেহারাটা জ্বলজ্বল করে ওঠে। তিনি খুশিতে আটখানা হয়ে বললেন– 'এবার মুসলমানদের আর রক্ষা নেই। খ্রিস্টানরা প্রাণপাত লড়াই করে জয়ী হয়েই তবে ঘরে ফিরবে।'

ঃ যিশুখৃস্ট এমনই যেন করেন।

ঃ এখন আগামীতে যে যুদ্ধ হবে, তাতে তোমাকেও অংশগ্রহণ করতে হবে।

ঃ আমি সানন্দচিত্তে অংশগ্রহণ করব।

থেভঢোস উঠে দাঁড়ান। রাজকুমারী রীতি অনুযায়ী তার জুব্বায় চুমো খায়। থেভঢোস রাজকুমারী হেলেনকে আশির্বাদ প্রদান করে তাঁবু থেকে বেরিয়ে যান।

তেত্রিশ.

হেলেনের তাঁবু থেকে বের হয়ে থেভঢোস একদিকে হাঁটতে শুরু করেন। অনেকখানি পথ অতিক্রম করে একটি আলিশান তাঁবুতে প্রবেশ করেন। তাঁবুর ভিতরটা রাজকীয় সরঞ্জামে সজ্জিত। একধারে এক সোফায় সালওয়ানুস উপবিষ্ট। তাঁবুটা সালওয়ানুসের। সালওয়ানুস প্রধান পাদরি থেভঢোসকে দেখামাত্র তার সম্মানার্থে উঠে দাঁড়ায় এবং দ্রুতপায়ে কাছে গিয়ে কুর্নিশ করার জন্য এতটা অবনত হয় যে, তার মাথা মাটির সঙ্গে মিশে যায়। কুর্নিশ করে উঠে দাঁড়িয়ে সালওয়ানুস থেভঢোসের জুব্বায় চুমো খেয়ে বলল– 'আমার সৌভাগ্য যে, হুজুর আমার তাঁবুতে আগমন করেছেন।'

ঃ তোমাকে একনজর দেখতে এবং তোমার খবরাখবর জানতে এলাম।

ঃ এ আমার বিরাট সৌভাগ্য।

থেভঢোস কয়েক পা হেঁটে সালওয়ানুস যে-সোফাটায় বসা ছিল, সেটিতে গিয়ে বসেন। সালওয়ানুস পার্শ্বের একটা চেয়ারে বসে পড়ে। থেভঢোস জিজ্ঞাসা করেন– 'বলো, রাজকুমারীর ব্যাপারে এখন তোমার মনোভাব কী?'

ঃ তার ভালবাসা আমার শিরায়-শিরায় প্রবাহিত হচ্ছে। তাকে না-পেলে আমি বাঁচব না।

ঃ বিষয়টি অসম্ভব মনে হচ্ছে। ভালো হত, যদি তুমি তাকে ভুলে যেতে।

ঃ অনেক চেষ্টা করেছি; কিন্তু ভুলতে পারিনি।

ঃ কিন্তু রাজকুমারীকে অর্জন করা সহজ হবে না।

ঃ আমি জানি। তবে তাকে পাওয়ার জন্য আমি জীবন দিতেও প্রস্তুত আছি।

ঃ বুঝো, জীবনের বাজি লাগানো ছাড়া প্রেমে সফল হওয়া যায় না কিন্তু?

ঃ বুঝি। আপনি থাকতে আমার নিরাশ হওয়ার কোনো কারণ নেই :

ঃ তোমার ব্যাপারটা নিয়ে আমি ভাবি।

ঃ আমি জানি, হুজুর আমার জন্য চেষ্টার ক্রুটি করছেন না।

হঠাৎ কী মনে করে যেন সালওয়ানুসের চেহারাটা উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে। জিজ্ঞেস করে– 'আচ্ছা হুজুর, মহারাজের কাছে কখনও আমার প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছিলেন কি?'

ঃ তোমার প্রসঙ্গ... তা তোমার ধারণা কী?

ঃ আমার ধারণা, হুজুর অবশ্যই মহারাজের নিকট আমার প্রসঙ্গ তুলেছেন।

ঃ এটা তোমার সুধারণা। সফলতা সুধারণার পথ ধরেই অর্জিত হয়।

ঃ আপনার প্রতি আমার কী পরিমাণ ভক্তি ও শ্রদ্ধাবোধ রয়েছে, তা বলে বোঝাতে পারব না।

ঃ আমি জানি, আর সে-কারণেই আমি তোমার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।

ঃ তা হুজুর, মহারাজ আমার সম্পর্কে কী বলেছেন?

ঃ আমি মহারাজকে একান্তে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছি, সেনাপতির পুত্র সালওয়ানুস আসক্ত।

ঃ একথা শুনে তিনি বোধহয় নাখোশ হয়ে থাকবেন।

ঃ তোমার ধারণা সঠিক। তিনি বিষয়টাকে ভালো চোখে দেখেননি। আমি কথাটা বলার সঙ্গে-সঙ্গে তার চোখ দুটো লাল হয়ে ওঠেছিল। কিন্তু আমি বললাম– এতে সালওয়ানুসের কোনো দোষ নেই। দোষটা রাজকুমারীর অতিরিক্ত রূপের। মেয়েটি এতই রূপসী যে, যে দেখে সে-ই আসক্ত হয়ে পড়ে। তখন ধীরে-ধীরে সম্রাটের রাগ দূর হয়ে যায়।

সালওয়ানুস অত্যন্ত মনোযোগসহকারে থেভঢোসের কথাগুলো শুনছিল। থেভঢোস যখন বললেন, সম্রাটের খুব রাগ চড়ে গিয়েছিল, তখন ভয়ে তার হৃদকম্প শুরু হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু যখন জানল, থেভঢোস সম্রাটের রাগ পানি করে দিয়েছেন, তখন তার চেহারায় সজীবতা ফিরে আসে। সালওয়ানুস জিজ্ঞেস করে– 'আর কী কথা হয়েছে?'

ঃ তোমার প্রশংসা করে আমি তোমাকে রাজকুমারদেরও উপরে তুলে দিয়েছি। তোমার বীরত্বের বর্ণনায় আসমান-জমিন এক করে ফেলেছি। সম্রাট অতিশয় মনোযোগসহকারে আমার বক্তব্য শুনেছেন।

ঃ আপনি আমার বড় উপকার করেছেন।

ঃ কিন্তু ইনিয়ে-বিনিয়ে নানা কথা বলে শেষে যখন আসল কথাটা ব্যক্ত করলাম, তখন মহারাজ আবারও ক্ষেপে ওঠলেন। আমি আবারও দ্রুত ঠান্ডা করে দিয়ে বললাম, ভদ্রতা, বীরত্ব ও মর্যাদায় কোনো রাজকুমারও সালওয়ানুসের পাশে দাঁড়াতে পারবে না। ছেলেটা সবদিক থেকেই রাজকুমারীর উপযুক্ত।

সালওয়ানুস তন্ময় হয়ে থেভঢোসের বক্তব্য শুনছে। তার চেহারাটা এখন জ্বলজ্বল করছে। হাসিমাখা উদ্দীপ্ত মুখে জিজ্ঞেস করে– 'তা মহারাজ কী উত্তর দিলেন?'

ঃ তিনি জিজ্ঞেস করেন, সালওয়ানুস সত্যিই কি বীর? আমি বললাম, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। মহারাজ জিজ্ঞেস করেন– আমি তার পরীক্ষা নিয়ে দেখব। আমি ভয় পেয়ে গেলাম, মহারাজ আবার কী পরীক্ষা নেন। তাই আমি আর কোনো কথা বললাম না।

সালওয়ানুস বলে এঠে– 'তা আপনি কেন বললেন না, সালওয়ানুস যে-কোনো পরীক্ষা দিতে প্রস্তুত?'

থেভঢোস গভীরচোখে সালওয়ানুসের প্রতি দৃষ্টিপাত করে বললেন– 'এটা কি বাস্তব?'

সালওয়ানুস বুকে চাপড় মেরে বলল– 'বিলকুল– নিঃসন্দেহে এটা আমার বাস্তব দাবি। বিশ্বাস না-হয় তো আপনি পরীক্ষা করে দেখুন। বলুন কী করব?'

ঃ তা হলে আমি ভুল বলিনি।

ঃ আপনি কী বলেছেন?

ঃ এই তো, বলেছি, সালওয়ানুস যে-কোনো পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত।

ঃ বেশ বলেছেন। আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ।

ঃ মহারাজ বলেছেন, আমি সালওয়ানুসকে পুত্রের মর্যাদা দিতে প্রস্তুত আছি। তবে শর্ত হচ্ছে, তাকে মুসলিম বাহিনীর সেনাপতির মাথা কেটে আনতে হবে।

কথাটা শোনামাত্র সালওয়ানুসের মুখটা বিবর্ণ হয়ে যায়, মাথাটা নুয়ে পড়ে। এতক্ষণকার সব হম্বিতম্বি হঠাৎ পানি হয়ে যায়। তার মাঝে যে-জোশ ও বীরত্ব জন্ম নিয়েছিল, সব নেতিয়ে যায়। খানিক পর মাথাটা উপরে তুলে ক্ষীণস্বরে বলল– 'মুসলমানদের সেনাপতির মাথা কেটে আনতে হবে?'

ঃ কেন, ভালবাসার জযবা পানি হয়ে গেল না-কি?

ঃ হুজুর বোধহয় ভেবে দেখেননি, মুসলমানদের সেনাপতির মাথা কেটে আনা সহজ নয়।

ঃ পরীক্ষা সাধারণ ও সহজ কাজের নেয়া হয় না। তুমি সাহস হারিয়ো না, আশাহত হয়ো না। খোদা ও যিশুর নিকট প্রার্থনা করো। বিচিত্র কি যে, শেষ পর্যন্ত তুমিই সফল হবে।

ঃ অসম্ভব। আপনি জানেন না মুসলমান কোন ধাতুর তৈরী। একজন সাধারণ মুসলমানও লোহার তৈরী। হতভাগারা যেন মরতে জানেই না। আর সেনাপতি তো রীতিমত সিসার তৈরী। তার সম্মুখে যাওয়া এবং তাকে হত্যা করে তার মাথা কেটে আনা এতই কঠিন যে, কাজটা বাঘের সম্মুখে গিয়ে তার গোঁফের লোম তুলে আনার সমান।

সালওয়ানুসের এই প্রতিক্রিয়ায় থেভচোস বেজায় অসন্তুষ্ট হোন। তিনি বললেন– 'যদি জানতাম, তুমি এত কাপুরুষ, তা হলে কখনও আমি তোমার ব্যাপারটায় সম্পৃক্ত হতাম না।'

ঃ কিন্তু হুজুর, চিন্তা করে দেখুন, আপনি আমাকে পুরোপুরি মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিচ্ছেন!

ঃ তুমি যতটা শক্ত মনে করছ, আসলে কাজটা তত শক্ত নয়। তুমি পাঁচ হাজার পরীক্ষিত ও সাহসী যোদ্ধা নিয়ে মুসলিম সেনাপতির বাহিনীর উপর আক্রমণ করে তাদের সারিগুলো ছিন্নভিন্ন করে ফেলবে। পরে সেই ঘোর বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিতে তুমি পেছন থেকে আঘাত হেনে সেনাপতির মাথাটা কেটে নিয়ে আসবে।

ঃ না, আপনি যা-ই বলুন না কেন, এটা সম্ভব নয়। মুসলমানদের হাজার-হাজার চোখ থাকে। তারা সামনে-পেছনে, ডানে-বাঁয়ে সবদিকে সমান দেখে। তাই এ-কাজ আমার সাহস ও সাধ্যের অতীত।

ঃ তা হলে তোমাকে রাজকুমারীর ভাবনা ত্যাগ করতে হবে। সাহস করে ময়দানে অবতীর্ণ হলে আমার আশির্বাদও তো তোমার সঙ্গী হত।

ঃ তবে অভিশাপ দিয়ে আপনি মুসলিম সেনাপতিকে মেরে ফেলছেন না কেন?

ঃ তা-ই হবে। আমি অভিশাপ দেব। আর যাকে আশির্বাদ করব, সে-ই তার মাথা কেটে আনবে। শোনো সালওয়ানুস, তুমি হেলায় সুযোগ হাতছাড়া করছ। আমি নানা কৌশলে অনেক যুক্তি-তর্কের মাধ্যমে মহারাজকে এই মর্মে সম্মত করেছি, যে-ব্যক্তি মুসলিম সেনাপতির মাথা কেটে আনবে, তার সঙ্গে রাজকুমারী হেলেনকে বিয়ে দেয়া হবে। কাজটা আমি তোমার জন্যই করেছিলাম। আমার পরিকল্পনা ছিল, তুমি যখন মুসলিম সেনাপতির নিকট পৌছুবে, তখন আমি তোমাকে আশির্বাদ দেব। ফলে তুমি তাকে হত্যা করতে সক্ষম হবে। কিন্তু তুমি সম্মত হচ্ছ না, এটা তোমার দুর্ভাগ্য। এখন আমি তোমার স্থলে অন্য কাউকে প্রস্তুত করব।

কথাগুলো বলেই থেভঢোস ওঠে দাঁড়ান। সালওয়ানুস তড়িঘড়ি বলে ওঠে– 'হুজুর, আমি সম্মত আছি। হুজুর যখন আশির্বাদ করবেন, তখন আমি অবশ্যই সফলকাম হব।'

থেভঢোস খুশি হয়ে যান– 'যাক, শেষ পর্যন্ত তুমি ব্যাপারটা বুঝতে সক্ষম হয়েছ। যাও, প্রস্তুতি গ্রহণ করো। আগামী কাল আবার যুদ্ধ হবে।'

ঃ ঠিক আছে।

থেভঢোস চলে যান। সালওয়ানুস বসে ভাবনার সাগরে হাবুডুবু খেতে শুরু করে।

চৌত্রিশ.

খ্রিস্টানরা এখনও মুসলমানদের তিনগুণেরও বেশি। তবু কেন তারা আর রণাঙ্গনে আসছে না ভেবে মুসলমানরা হতবাক্। তা হলে কি তারা ভয় পেয়ে গেল! তবে, তারা কোনো-না-কোনো চক্রান্তের জাল বুনছে, সে-ব্যাপারে মুসলমানরা নিশ্চিত। কাজেই প্রতিটি মুহূর্ত তাদের সজাগ ও সচেতন থাকতে হচ্ছে।

খ্রিস্টান বাহিনী জেনে গেছে, যাবিলার পরাজিত শাসনকর্তা আরসানুস কতিপয় সৈন্যসহ মুসলমানদের সঙ্গে এসেছে। তাই তারা তাকে ও তার বাহিনীকে দেশ-জাতির বিশ্বাসঘাতক বলে অভিহিত করছে।

আরসানুসের সঙ্গীরা সংখ্যায় সামান্য– মাত্র আড়াইশ। তাদের পোশাক সাধারণ আফ্রিকান খ্রিস্টানদের চেয়ে খানিকটা ভিন্ন। তাই তাদের চিনতে মুসলমানদের সমস্যা হচ্ছে না। একদিন নিজতাঁবু থেকে সেনাপতি আব্দুল্লাহ

ইবনে সা'দের তাঁবুর দিকে যাওয়ার পথে সরোয়ার একস্থানে দুজন খ্রিস্টানকে সন্দেহজনক অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে।

সরোয়ার আরবিতে জিজ্ঞেস করে– 'তোমরা কারা?'

তারাও আরবি জানে। তারা হঠাৎ হতচকিত হয়ে ভয়ার্তচোখে সরোয়ারের প্রতি তাকায়। একজন বলল– 'আমরা যাবিলার বাসিন্দা।'

সরোয়ারের সন্দেহ বেড়ে যায়। বলল– 'কিন্তু তোমাদের পোশাক তো যাবিলার লোকদের চেয়ে ভিন্ন?'

সন্দেহভাজন খ্রিস্টান দুজন থতমত খেয়ে যায়। নিজেদের পোশাকের দিকে তাকায়। আসলেই তাদের পোশাক যাবিলার খ্রিস্টানদের অনুরূপ নয়। তাদের চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে যায়। তথাপি একজন বলল– 'আমাদের পোশাক ময়লা হয়ে যাওয়ায় দুজন মৃত সৈনিকের পোশাক পরে এসেছি।'

সরোয়ার তাদের পোশাকের প্রতি গভীর দৃষ্টিতে চোখ বুলিয়ে বলল– 'কিন্তু এগুলো নিহত খ্রিস্টানদের পোশাক হলে এতে রক্তের দাগ থাকত। তোমাদের পোশাকে তো তেমন কিছুই দেখছি না। কারণ কী?'

এবার লোক দুটির চেহারার রং আরো বিবর্ণ হয়ে যায়। তারা চোখে সর্ষে ফুল দেখতে শুরু করে। সরোয়ারের প্রশ্নের কোনো সদুত্তর দিতে ব্যর্থ হয়। সরোয়ার ধরে নেয়, এরা শত্রুর গুপ্তচর। কিন্তু, শুধু সন্দেহের ভিত্তিতে তাদের গ্রেফতার করা সমীচীন মনে করল না। বলল– 'আচ্ছা, তোমরা আমার সঙ্গে আরসানুসের নিকট চলো।'

আরসানুসের নাম শুনেই তাদের দেহের রক্ত শুকিয়ে যায়। পরস্পরে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে শুরু করে। কিন্তু, আদেশ পালন না-করে তো উপায় নেই। তারা সরোয়ারের সঙ্গে হাঁটতে শুরু করে। সরোয়ার তাদেরকে আরসানুসের তাঁবুতে নিয়ে যায়।

আরসানুস এখন সরোয়ারকে ভালোভাবেই জানে। সে খুব আগ্রহের সঙ্গে সরোয়ারকে স্বাগত জানায়। সরোয়ার খ্রিস্টান লোক দুটির প্রতি ইঙ্গিত করে জিজ্ঞেস করে– 'এরা কি আপনার বাহিনীর সৈনিক?'

আরসানুস লোক দুটিকে গভীরভাবে নিরীক্ষা করে বলল– 'না! কেন, এরা আমার বাহিনীর সদস্য হওয়ার দাবি করছে না-কি?'

ঃ হ্যাঁ।

ঃ তা হলে এরা গুপ্তচর; ধরা খেয়ে মিথ্যা বলে জীবন রক্ষা করার চেষ্টা করছে।

ঃ ঠিক আছে। আমি এদেরকে সেনাপতির নিকট নিয়ে যাচ্ছি।

ঃ চলুন, আমিও যাব।

সরোয়ার ও আরসানুস খ্রিস্টান দুজনকে নিয়ে আব্দুল্লাহ ইবনে সা'দের তাঁবুতে পৌঁছয়। তিনি তখন একাকি নিজ তাঁবুর সম্মুখে কম্বল পেতে বসে কাগজগুলো তির উলট-পালট করে দেখছিলেন। তিনি সহাস্যমুখে তাদের স্বাগত জানান। সরোয়ার সালাম দিয়ে সেনাপতির সম্মুখে গিয়ে দাঁড়ায়। সেনাপতি সালামের উত্তর দিয়ে তাদের বসতে বললেন। সরোয়ার ও আরসানুস বসে পড়ে আর ধৃত খ্রিস্টান দুজন দাঁড়িয়ে থাকে। আব্দুল্লাহ ইবনে সা'দ সরোয়ারকে উদ্দেশ করে বললেন– 'কেন এসেছ? এই খ্রিস্টান দুজন কারা?'

সরোয়ার উত্তর দেয়– 'এরা জর্জিরের গুপ্তচর।' বলেই সে সেনাপতিকে ঘটনার ইতিবৃত্ত শোনায়।

আব্দুল্লাহ ইবনে সা'দ সব শুনে বললেন– 'খ্রিস্টানগণ, স্বীকার করে নাও, তোমরা গুপ্তচর।'

এক খ্রিস্টান বলল– 'স্বীকার করছি আমরা গুপ্তচর। তবে, আপনি যদি আমাদের জীবনরক্ষার প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন, তা হলে আপনাকে এমন একটি তথ্য বলে দেব, যা আপনার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং যা জানা আপনার একান্তই জরুরি।'

ঃ যদি তেমন কোনো বিষয় থাকে, তা হলে আমি ওয়াদা করছি, তোমাদের মুক্ত করে দেব। তবে শর্ত থাকবে, তোমরা আর গুপ্তচরবৃত্তি করবে না।

ঃ ঠিক আছে, আমরা রাজি।

ঃ বলো, কী সে তথ্য?

ঃ সম্রাট জর্জির তার বাহিনীতে ঘোষণা করেছেন, যে-ব্যক্তি মুসলিম সেনাপতির মাথা কেটে আনবে, তার সঙ্গে তাঁর রূপসীকন্যা হেলেনকে বিয়ে দেবেন। যেহেতু রাজকুমারী হেলেন অনুপমা-সুন্দরী এবং অনেক রাজকুমারসহ বহু খ্রিস্টান তার প্রেমে মাতোয়ারা, তাই এ-ঘোষণার পর তাকে পাওয়ার আশায় খ্রিস্টানরা জীবনের বাজি লাগিয়ে যুদ্ধ করবে।

আব্দুল্লাহ ইবনে সা'দ স্মিত হেসে বললেন– 'রাজকুমারীর বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে খ্রিস্টানদেরকে যুদ্ধ করার জন্য উত্তেজিত করা হয়েছে! এ তো অত্যন্ত নির্লজ্জতা ও কাপুরুষতার পরিচয়। যা হোক, তোমাদের এই তথ্যটি অনেক গুরুত্বপূর্ণ। তাই আমি আমার ওয়াদা পূরণ করছি– যাও, আমি তোমাদেরকে ছেড়ে দিলাম।'

গুপ্তচরদ্বয় আনন্দে আত্মহারা হয়ে আদবের সঙ্গে অবনত হয়ে সালাম করে সেখান থেকে চলে যায়। সরোয়ার এবং আরসানুস আপনাপন অবস্থানে ফিরে যায়।

এদিন আসর নামায আদায় করে সেনাপতি আব্দুল্লাহ ইবনে স'দ তাঁবুতে ফিরে এসে দেখেন, ইবনে ওমর, ইবনে আব্বাস, ইবনে জাফর, হাসান ও হুসাইন (রা.) তাঁর অপেক্ষায় বসে আছেন। ইবনে ওমর বললেন– 'মাননীয় সেনাপতি, আজ দুজন গুপ্তচর গ্রেফতার হয়ে আপনার নিকট আনীত হয়েছিল?'

ঃ হ্যাঁ, তারা আমাকে বিস্ময়কর এক তথ্য দিয়েছে।

ইবনে আব্বাস বললেন– 'সেই বিস্ময়কর তথ্যটি হচ্ছে, জর্জির ঘোষণা দিয়েছেন, যে-ব্যক্তি মুসলিম সেনাপতির মাথা কেটে আনবে, তার সঙ্গে তার রূপসী কন্যাকে বিয়ে দেবেন।

ঃ তা-ই।

ইবনে জাফর বললেন– 'কিন্তু আপনি বিষয়টিকে কোনো গুরুত্ব দেননি!'

ঃ ব্যাপারটা আমার কাছে অত্যন্ত হাস্যকর মনে হয়েছে।

হযরত হাসান বললেন– 'আমিও বিষয়টাকে অতিশয় হাস্যকর এবং যারপরনাই কাপুরুষতা ও আত্মমর্যাদা পরিপন্থী মনে করি। যেমন আজব দেশ, তেমন আজব দেশের মানুষগুলোর স্বভাব-চরিত্র। কিন্তু আপনি বোধহয় একটা বিষয় গভীরভাবে ভেবে দেখেননি। জর্জিরের এই ঘোষণায় খ্রিস্টানদের যুদ্ধের স্পৃহা বহুগুণ বেড়ে গেছে!'

ঃ খ্রিস্টানদের সাহস বাড়ানোর লক্ষ্যে জর্জির এ-ঘোষণাটা দিয়েছে, সে আমি জানি।

ইবনে ওমর বললেন– 'আপনি ঠিক বলেছেন। কিন্তু ঘোষণার আরও তাৎপর্য আছে।'

ঃ থাকতে পারে; কিন্তু তোমরা বিষয়টাকে এত গুরুত্ব দিচ্ছ কেন?

ইবনে আব্বাস বললেন– 'বিষয়টি অতিশয় গুরুত্বপূর্ণই বটে।'

ঃ তোমরা চিন্তা করো না। আল্লাহর উপর ভরসা রাখো। তিনি যা ভালো তা-ই করবেন।

ইবনে জাফর বললেন– 'তা ঠিক; কিন্তু তিনি তো সাবধানতা অবলম্বন করারও আদেশ দিয়েছেন।'

ঃ যুদ্ধের ময়দানে যতটুকু সাবধান থাকা যায়, আমি অবলম্বন করব।

হযরত হাসান বললেন– 'আমাদের একটি পরামর্শ আছে– যুদ্ধের সময় আপনি ময়দানে অবতীর্ণ হবেন না।'

সেনাপতি আব্দুল্লাহ ইবনে সা'দ বিস্ময়মাখা চোখে সকলের প্রতি তাকিয়ে বললেন– 'এটা কি তোমাদের সকলের পরামর্শ?'

সবাই একবাক্যে বলে ওঠেন– 'জি, এই পরামর্শ আমাদের প্রত্যেকের।'

ঃ কিন্তু তোমাদের এই পরামর্শ যথাযথ নয়।

ইবনে জাফর বললেন– 'কেন?'

ঃ আমি যদি হাত-পা গুটিয়ে চুপচাপ বসে থাকি, তা হলে আমি আল্লাহর নিকট কী উত্তর দেব? তা ছাড়া আমি জিহাদের সাওয়াব থেকে বঞ্চিত হয়ে যাব না?

ঃ আপনি যখন রণাঙ্গনে উপস্থিত আছেন, তখন জিহাদের সাওয়াব থেকে বঞ্চিত হবেন না। তা ছাড়া এর জন্য আপনাকে কোনো জবাবদিহিও করতে হবে না।

ঃ কিন্তু তোমরা যুদ্ধ করবে আর আল্লাহ্ দেখবেন আমি তোমাদের পেছনে হাত-পা গুটিয়ে বসে আছি, তখন আমি লজ্জা পাব। আমার বংশের জন্য এটি এক কলঙ্কময় অধ্যায় হয়ে থাকবে।

ইবনে জাফর বললেন– 'আপনি নিজ থেকে তো আর এমনটি করছেন না। বরং আমরা আপনাকে বাধ্য করছি।'

ঃ তা হলে এটাই তোমাদের পরামর্শ?

ইবনে ওমর বললেন– 'হ্যাঁ, খ্রিস্টানরা যখন জানবে, আপনি রণাঙ্গনে অবতরণ করেননি, তখন খ্রিস্টানদের জোশ ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। তখন আর তারা মুসলমানদের বেশি ক্ষতি করতে পারবে না।'

ঃ কিন্তু আমীরুল মুমিনীন যখন বিষয়টি শুনবেন, তিনি কী বলবেন?

হযরত হাসান বললেন– 'আমীরুল মুমিনীন আদেশ দিয়েছেন, গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মজলিসে শুরার অধিকসংখ্যক সদস্য যে প্রস্তাবের উপর অভিমত ব্যক্ত করবে, সে অনুসারেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে। আমাদের সর্বসম্মত অভিমত হচ্ছে, আপনি আগামী যুদ্ধে ময়দানে অবতীর্ণ হবেন না।

ঃ ঠিক আছে; আমি তোমাদের সর্বসম্মত পরামর্শ মেনে নিলাম।

ইবনে ওমর বললেন– 'আমরা এ-জন্যই এসেছিলাম। আগামী কাল খ্রিস্টানরা ময়দানে অবতীর্ণ হবে।'

ঃ হ্যাঁ, আমারও তা-ই ধারণা। তোমরা প্রস্তুত থাকো।

ঃ ঠিক আছে।

সকলে উঠে চলে যায়।

পঁয়ত্রিশ.

অল্প সময়ের মধ্যে সমগ্র খ্রিস্টান বাহিনীতে দাবানলের মতো ঘোষণা ছড়িয়ে পড়ে, যে-ব্যক্তি মুসলিম সেনাপতির মাথা কেটে আনবে, সম্রাট জর্জির তার সুন্দরীকন্যা হেলেনকে তার সঙ্গে বিয়ে দেবেন। এ-ঘোষণায় একজন সাধারণ

সৈনিক থেকে শুরু করে উচ্চপদস্থ অফিসার পর্যন্ত প্রত্যেকের অন্তরে আনন্দের বান বইতে শুরু করে। প্রতিজন খ্রিস্টান মনে-মনে প্রতিজ্ঞা নিয়ে ফেলে, রাজকুমারীকে অর্জন করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা চালাবে। এই ঘোষণা খ্রিস্টানদের মাঝে সীমাহীন জোশ ও উদ্যম জাগিয়ে তোলে। কাপুরুষ আনাড়ি সৈনিকরাও হঠাৎ দুঃসাহসী বীর হয়ে ওঠে। প্রত্যেকে নিজ-নিজ অস্ত্র-বর্ম ইত্যাদি দেখে-শুনে ঠিকঠাক করতে শুরু করে। তারা যুদ্ধের জন্য সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করে অপেক্ষার প্রহর গুণতে থাকে।

পরদিন রাত পোহাবামাত্র জর্জিরের বাহিনীতে চাঞ্চল্য শুরু হয়ে যায়। সৈনিকগণ প্রাতঃকার্যাদি সম্পাদন করে অস্ত্রসজ্জিত হয়ে রণাঙ্গনে গিয়ে হাজির হতে শুরু করে। প্রতিটি ইউনিটের কমান্ডারগণ রীতিমত প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়েছে, কার আগে কে গিয়ে সকলের সম্মুখে অবস্থান গ্রহণ করবে, যাতে মুসলিম সেনাপতির মাথা কেটে আনতে সক্ষম হয়।

তারা অতি অল্প সময়ের মধ্যে ঝটপট সারিবদ্ধ হয়ে বিন্যস্ত হয়ে যায়। ডান, বাম, পশ্চাৎ ও অন্তর ঠিক করে ফেলে। সম্রাট জর্জিরও মধ্যস্থলে এসে দাঁড়িয়ে যান। তার সুন্দরীকন্যা হেলেনও একটি ঘোড়ায় চড়ে তার পার্শ্বে এসে দাঁড়ায়। পরিধানে হালকা গোলাপি পোশাক, যা সামরিক উর্দির মতো এত টাইট যে, রূপবতী মেয়েটির মোহনীয় অঙ্গসমূহের গঠন-কাঠামো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। সুডৌল বক্ষের স্ফীতি সুস্পষ্ট দৃশ্যমান। পোশাকটায় হীরা ও মণি-মুক্তার জরি লাগানো। ফলে সেটি ঝলমল করছে। হাতের প্রতিটি আঙুলে মুক্তখচিত আংটি। গলায় সোনার নেকলেস। মাথার রেশম-কোমল কোঁকড়ানো কালো চুলগুলো লাল ফিতায় বাঁধা। মাথায় মহামূল্যবান ধাতবখচিত মুকুট। সে-ও অস্ত্রসজ্জিত। পিঠে ক্ষুদ্র একটি ঢাল। ঢালের সঙ্গে একটি রুপার তূণ বাঁধা। কোমরে ঝুলছে ছোট্ট একটি তরবারি।

হেলেন রাজকুমারী– রাজার কন্যা। কিন্তু এই মুহূর্তে মেয়েটি হুরের মতো ভাব নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার রূপের ছটায় চারদিক আলো ছড়িয়ে পড়েছে। রাজা জর্জির ও রাজকুমারী হেলেনের চারদিকে রাজবাহিনী বর্মের উপর রেশমি পোশাক পরিধান করে রাজকীয় ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে।

মুসলিম বাহিনী ফজর নামায আদায় করেই রণাঙ্গনে এসে সমবেত হতে শুরু করেছে। বিগত দিনের মতো আজও তারা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে যায়। সেনাপতি আব্দুল্লাহ ইবনে সা'দ সিদ্ধান্ত মোতাবেক তাঁবুতেই অবস্থান করেন। তিনি হাবীবকে ইসলামী পতাকা দিয়ে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হিসেবে বাহিনীর

মধ্যস্থানে অবস্থান গ্রহণের জন্য প্রেরণ করেন। ইনি ভারপ্রাপ্ত সেনাপতির দায়িত্ব পালন করবেন। খ্রিস্টান বাহিনীতে সুরেলা শব্দে সামরিক ডংকা বাজতে শুরু করেছে। আজ প্রতিজন খ্রিস্টানই বীর সৈনিক। সবাই যেন সকলের চেয়ে দুঃসাহসী যোদ্ধা। তাদের হৃদয়ে উদ্দীপনার জোয়ার বইছে। প্রত্যেকে মুসলিম সেনাপতির মাথা কেটে রাজার পায়ে অর্পণ করার জন্য প্রস্তুত। এই মুহূর্তে কল্পনার জগতে তারা সবাই রাজকুমারী হেলেনের ভাগ্যবান স্বামী।

প্রথম দিনকার যুদ্ধে জর্জির দেখেছেন, মাত্র ত্রিশ হাজার মুসলমান অত্যন্ত বীরত্ব ও দুঃসাহসিকতার সঙ্গে তার ষাট হাজার সৈন্যের মোকাবেলা করেছিল। আর সেজন্যেই আজ তিনি তার সমুদয় সৈন্য নিয়ে রণাঙ্গনে অবতরণ করেছেন। শিবির পাহারার জন্য রেখে এসেছেন মাত্র পাঁচ হাজার সৈন্য।

রাজকুমারীর সঙ্গে তার সখী-বান্ধবী এবং দাসীরাও এসেছিল, যারা তার আলিশান তাঁবুর সন্নিকটে অন্য কয়েকটি তাঁবুতে অবস্থান গ্রহণ করেছে।

সম্রাট জর্জির তার সাধারণ সৈন্য ও অফিসারদের উদ্দীপনা দেখে যারপরনাই আনন্দিত হন। আজ তিনি নিশ্চিন্ত যে, তার উজ্জীবিত বাহিনী আজ আক্রমণ করামাত্র মুসলমানরা নিঃশেষ হয়ে যাবে। তবে, তিনি জানেন, তার বাহিনীর এই উৎসাহ-উদ্দীপনার মূলে তার পুরস্কারের ঘোষণা। রাজকুমারী হেলেনকে পাওয়ার জন্যই আজ বাহিনীতে এত সাজসাজ রব।

খ্রিস্টান বাহিনী আক্রমণের জন্য পূর্ণ প্রস্তুত। এমন সময় প্রধান পাদরি থেভঢোস অন্যান্য পাদরিদের নিয়ে বাহিনীর সম্মুখে দাঁড়ান। বহুসংখ্যক সেবক এই ধর্মনেতাদের সঙ্গে এসেছে। তাদের প্রত্যেকের হাতে রুপার তৈরি ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র ধুনিদান। যেগুলো থেকে সুগন্ধময় ধোঁয়া উড়ছে, যার সৌরভে সুরভিত হয়ে উঠেছে গোটা পরিবেশ। ধর্মনেতাদের এই দলটি বাহিনীর সম্মুখে এসে দাঁড়িয়ে যায়। থেভঢোস তার উভয় হাত উচ্চে তুলে ধরেন। অন্য সকল পাদরি তাকে অনুসরণ করেন। তার পর সকলে অনুচ্চস্বরে কী যেন আওড়াতে শুরু করেন। কিছুক্ষণ পাঠ করে তারা রুকুর মতো মাথানত করে বাহিনীর দিকে মুখ করে ডানহাত উর্ধ্বে তুলে ধরে সৈনিকদের আশির্বাদ দান করেন এবং ওভাবেই ডানদিকে মোড় ঘুরিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ক্যাম্পের দিকে চলে যান।

পাদরিদের চলে যাওয়ামাত্র সম্রাট জর্জির সেনাপতি মারকুসকে ডেকে আদেশ করেন– 'বাহিনীকে আক্রমণের সংকেত দাও।' সেনাপতি রাজাদেশ তামিল করেন। তিনি বাহিনীকে সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার ইঙ্গিত প্রদান করেন। আদেশ পাওয়ামাত্র খ্রিস্টান সৈন্যদের সারিগুলো বিক্ষুব্ধ সাগরের তরঙ্গমালার

মতো অগ্রসর হতে শুরু করে। তাদের অগ্রযাত্রা দেখে মুসলমানরাও অগ্রসর হতে শুরু করে। উভয় বাহিনী অত্যন্ত সুশৃঙ্খলভাবে, অথচ দ্রুত এবং হৃদয়ে জোশ ও ক্রোধের ঝড় নিয়ে অগ্রসর হতে থাকে। উভয়পক্ষের সম্মুখভাগের সারিগুলোর সৈন্যরা তরবারি উঁচিয়ে রেখেছে। চকচকে সাদা ধারালো তরবারিগুলো সূর্যের কিরণে ঝকমক করছে।

এক পর্যায়ে এসে উভয় বাহিনী দাঁড়িয়ে যায়। সঙ্গে-সঙ্গে অত্যন্ত জোরদারভাবে আঘাত-পালটা আঘাত শুরু হয়ে যায়। উভয়পক্ষের প্রতিজন সৈনিক বীর-বিক্রমে যুদ্ধ করতে থাকে। উভয়পক্ষই প্রতিপক্ষকে নিশ্চিহ্ন করার লক্ষ্যে প্রাণপণ আঘাত হানতে থাকে। রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। ছিন্ন মাথাগুলো কালবৈশাখীর ঝড়ে বৃন্তচ্যুৎ পাকা আমের মতো টুপটুপ করে পড়তে থাকে দেহগুলো মাটিতে লুটিয়ে পড়ে ঘোড়ার পদতলে পিষ্ট হতে থাকে। রক্তের ছিটা উড়তে শুরু করে। মারমার কাটকাট রবে যুদ্ধ চলতে থাকে। বীর সৈনিকগণ আপন-আপন তরবারির সক্ষমতা প্রদর্শনে জীবনবাজি লড়াই করছে।

মুসলিম বাহিনী তাদের চিরাচরিত রীতি অনুযায়ী নীরবে, অথচ দৃঢ়তার সঙ্গে লড়ে যাচ্ছে। তারা প্রবল উদ্দীপনা ও পূর্ণশক্তিতে আক্রমণ চালাচ্ছে। কিন্তু খ্রিস্টানরা আজ যে-বীরত্ব ও উৎসাহের সঙ্গে লড়াই করছে, প্রথম দিনকার যুদ্ধে এভাবে যুদ্ধ করতে দেখা যায়নি। মুসলমানরা বিস্ময়ে হতবাক্ যে, খ্রিস্টানরা আজ কীভাবে এত সাহসী ও বীর হয়ে ওঠল! তারা জানে না, আফ্রিকার সম্রাট জর্জিরের রূপসীকন্যা হেলেন জাদু নিয়ে রণাঙ্গনে উপস্থিত হয়ে স্বপক্ষের সৈনিকদের বীরত্বের পরীক্ষা নিচ্ছে এবং তার এই উপস্থিতিই প্রতিজন খ্রিস্টান সম্রাট ও প্রত্যেক অফিসারের অন্তরে জীবনবাজির আত্মা ফুঁকে দিয়েছে। যার ফলে আজ প্রতিজন খ্রিস্টান সৈনিক জীবন দেওয়া-নেওয়ার খেলায় এমন উন্মত্ত হয়ে ওঠেছে। জর্জিরের পুরস্কার ঘোষণার কথা সাধারণ মুসলিম সৈনিকরা জানে না।

মুসলমানরা আজ যতই বীরত্ব ও উদ্দীপনার সঙ্গে যুদ্ধ করছে, যতই দক্ষতার সঙ্গে আক্রমণ করে খ্রিস্টানদের হত্যা ও পিছপা করার চেষ্টা করছে; কিন্তু খ্রিস্টানরা যেন আজ মরতে আসেনি। তারা মুসলমানদের আক্রমণ প্রতিহত করে-করে পালটা আঘাত হেনে স্বস্থানে দৃঢ়পদে দাঁড়িয়ে থাকছে। আজ তারা যত মরছে, তত মারছে।

বেলা যত বাড়ছে, যুদ্ধ তত তীব্র আকার ধারণ করছে। ধীরে-ধীরে যুদ্ধের আগুন তীব্রতা লাভ করছে। উভয়পক্ষের সামনের সারিগুলো একে অপরের

হাতে হতাহত হচ্ছে। খ্রিস্টানদের সারিগুলো অনেক দীর্ঘ। তাদের ডান ও বামের মাঝে কয়েক মাইলের দূরত্ব। মুসলমানরাও তাদের সারিগুলো সমপরিমাণ ছড়িয়ে দিয়েছে।

আজ খ্রিস্টানরা অপূর্ব বীরত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করছে। প্রবল বিক্রমের সঙ্গে যুদ্ধ করছে তারা। দাঁতে দাঁত চেপে আক্রমণ করছে। মুসলমানরাও পাহাড়ের মতো অটলপায়ে দাঁড়িয়ে আছে এবং সমুদ্রের কূলবর্তী পর্বতমালা যেরূপ ঝড়-বিক্ষুব্ধ তরঙ্গরাশিকে প্রতিহত করে, অনুরূপ খ্রিস্টানদের আক্রমণ প্রতিহত করছে। খ্রিস্টানদের অভাবনীয় বীরত্ব প্রদর্শনের ফলে আজকের যুদ্ধটা ভয়াবহ হওয়া সত্ত্বেও হতাহতের সংখ্যা কম। মৃত্যুর বাজার আজ ঠান্ডা। আর সেজন্যই উভয় পক্ষের যে-দুটি সারি সকালে সংঘাতে লিপ্ত হয়েছিল, দিনের এক-তৃতীয়াংশ সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর এখনও তারা-ই লড়াই করছে।

খ্রিস্টানরা চাচ্ছিল, মুসলমানদের মেরে-কেটে এবং পিষ্ট করে এগিয়ে গিয়ে তাদের সেনাপতি পর্যন্ত পৌঁছে যাবে এবং তাঁর মাথা কেটে আনার সৌভাগ্য অর্জন করবে। কিন্তু তারা জানে না, মুসলিম বাহিনীর সেনাপতি আজ রণাঙ্গনে অবতরণই করেননি। খ্রিস্টানরা জানে, যুদ্ধের ময়দানে ইসলামী পতাকা সেনাপতির হাতে থাকে। আর এখন সেই পতাকা বাহিনীর মধ্যস্থলে উড্ডীন দেখা যাচ্ছে। তাই তারা ধরে নিয়েছে, সেনাপতি ওখানেই অবস্থান করছেন। ফলে তারা মুসলমানদের সম্মুখস্থ সারিগুলো ভেদ করে মধ্যস্থলে পৌঁছে যাওয়ার জন্য প্রাণপাত যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে।

ক্রমান্বয়ে উভয় বাহিনীর উত্তেজনা তুঙ্গে উঠছে। তারা পূর্ণশক্তিতে আক্রমণ করে-করে প্রতিপক্ষের সারিগুলো ভেঙে ফেলার চেষ্টা শুরু করেছে। খ্রিস্টানরা মুসলমানদের এবং মুসলমানরা খ্রিস্টানদের সারির মধ্যে ঢুকে পড়ে প্রবল উৎসাহে যুদ্ধ চালাতে থাকে। মুসলমানরা অবাক হয়ে ভাবছে, যে-খ্রিস্টানরা দুদিন আগেও মৃত্যুর ভয়ে সম্মুখে অগ্রসর হতে ভয় পেত, আজ তারা এত নির্ভীকের মতো যুদ্ধ করছে কেন? আজ তাদের না হত্যা করা সম্ভব হচ্ছে, না তাদের পিছনে হটানো যাচ্ছে! ব্যাপারটা কী!

কিন্তু মুসলমান তো হার মানবার মতো জাতি নয়। তারাও ততোধিক উত্তেজিত ও উদ্দীপ্ত হয়ে এমন তীব্রতার সঙ্গে আক্রমণ চালায় যে, খ্রিস্টানরা হঠাৎ ঘাবড়ে যায়। তাদের অগ্রযাত্রা থেমে যায় এবং এগিয়ে-এগিয়ে আক্রমণ করার পরিবর্তে মুসলমানদের আক্রমণ প্রতিহত করতে শুরু করে। বিপুলসংখ্যক খ্রিস্টান মুসলমানদের মাঝে ঢুকে পড়েছে। ফলে তাদের

কয়েকটি সারি ভেঙে গেছে। মুসলমানরা তাদের সেই বিচ্ছিন্ন সারিগুলোতে পৌঁছে গিয়ে পরম বীরত্বের সঙ্গে আক্রমণ করতে থাকে। এবার যুদ্ধ ভিন্ন দিকে মোড় নিয়েছে, ঘোরতর রক্তক্ষয়ী রূপ ধারণ করেছে। দেহ থেকে মাথা কেটে-কেটে ভোরের শিশির-ফোঁটার মতো টুপটুপ করে মাটিতে পড়ছে। রণাঙ্গনে রক্তের ধারা বইছে। জীবন দেওয়া-নেওয়ার প্রতিযোগিতা চলছে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) অত্যন্ত বীরত্ব ও সাহসিকতার সঙ্গে যুদ্ধ করছেন। তিনি যে-সারিটির উপর আক্রমণ করছেন, তাকেই তছনছ করে দিচ্ছেন। যে-দলটির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ছেন, তাকে নিঃশেষ করে ফেলছেন। এতক্ষণে তিনি বহুসংখ্যক খ্রিস্টানকে হত্যা করে ফেলেছেন। কিন্তু এখনও তার জোশ কমেনি। বাহুর শক্তি এখনও এতটুকুও হ্রাস পায়নি। অত্যন্ত বীরত্ব ও উদ্দীপনার সঙ্গে আক্রমণ করে-করে তিনি শত্রুসেনাদের যমের হাতে তুলে দিচ্ছেন। যেদিকে অগ্রসর হচ্ছেন, লাশের উপর লাশ ফেলে এগিয়ে যাচ্ছেন। যাকেই সামনে পাচ্ছেন, তাকেই তরবারির আঘাতে দ্বিখণ্ডিত করে ফেলছেন।

এখন বেলা দ্বিপ্রহর। জোহরের সময় হয়ে গেছে। যুদ্ধ এখনও পূর্ণোদ্দমে চলছে। মুসলমানরা নীরবে, অথচ দৃঢ়পদে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। এমন সময় একদিক থেকে উচ্চশব্দে আকাশকাঁপানো আল্লাহু আকবার ধ্বনি ভেসে আসে। এই ধ্বনি শুনে মুসলমান ও খ্রিস্টান উভয় বাহিনীই যারপরনাই বিস্মিত হয়। সকলে চোখ তুলে যেদিক থেকে শব্দটা এসেছে, সেদিকে তাকাতে শুরু করে।

ছত্রিশ.

দেখতে-না-দেখতে মুসলিম বাহিনীর পিছন দিকে বিস্তীর্ণ অঞ্চলজুড়ে আকাশছাওয়া ধূলির ঝড় উত্থিত হয়। পরক্ষণেই তার মধ্য থেকে একটি সৈন্যবাহিনী আত্মপ্রকাশ করে। কারা আসছে? খানিক অপেক্ষা করার পর বোঝা গেল, ধূলির ঝড় তুলে যারা ধেয়ে আসছে, তারা ইসলামী বাহিনী। সকলের সম্মুখে এক সুদর্শন যুবক ইসলামের ঝাণ্ডাহাতে এগিয়ে আসছে। মুসলমানরা চিনে ফেলে, যুবক আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রা.)। তাদের বুঝতে বাকি রইল না, খলীফাতুল মুসলিমীন হযরত ওসমান (রা.) তাদের সাহায্যার্থে যথাসময়ে বাহিনী প্রেরণ করেছেন। মুসলমানরা আনন্দে ফেটে পড়ে। একে অদৃশ্য ও অপ্রত্যাশিত সাহায্য মনে করে উচ্চকণ্ঠে আল্লাহু আকবার ধ্বনি তুলে উল্লাস প্রকাশ করে।

এই ধ্বনি শুনে খ্রিস্টানরা ঘাবড়ে যায়। যেসব খ্রিস্টান নতুন মুসলিম বাহিনী

আসতে দেখেছিল, তারা হঠাৎ থমকে যায় এবং ভয়ার্তচোখে এদিক-ওদিক তাকাতে শুরু করে। এমন বীরত্বপূর্ণ যুদ্ধ করা সত্ত্বেও মুসলিমসেনাদের কোনোভাবে কুপোকাত কিংবা পিছনে সরানো যাচ্ছিল না। এখন আবার তাদের জন্য অতিরিক্ত সাহায্য এসে পড়েছে দেখে খ্রিস্টানরা হতচকিত হয়ে যায়। তাদের কলিজার পানি শুকিয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়। এবার তাদের চোখের তারায় মৃত্যুর ভয়াবহ দৃশ্য ভাসতে শুরু করে।

সম্রাট জর্জির তাকবীরধ্বনি শুনে নিজ বাহিনীর অফিসারকে বললেন– 'খোঁজ নাও তো, মুসলমানরা হঠাৎ এভাবে চিৎকার দিয়ে উঠল কেন? তারা সকাল থেকে এ-পর্যন্ত তো এমন কোনো শব্দ করেনি; নিশ্চয়ই বিশেষ কোনো ঘটনা ঘটেছে।'

অফিসার ছুটে গিয়ে এক গুপ্তচরকে ডেকে আনে। গুপ্তচর সম্রাটের সম্মুখে এসে দাঁড়িয়েই বলল– 'জাহাঁপনা, মুসলমানদের নতুন এক বাহিনী এসেছে। তাদের আগমনে আনন্দিত হয়ে তারা সমস্বরে চিৎকার করে কী যেন বলে ওঠেছে। এটা তাদের জাতীয় ধ্বনি।'

জর্জির জিজ্ঞাসা করেন– 'নতুন কত সৈন্য এসেছে?'

ঃ দশ হাজার হবে।

হঠাৎ জর্জিরের মুখটা মলিন হয়ে যায়। তিনি চিন্তিত ও সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠেন। কন্যা হেলেন পিতাকে চিন্তামগ্ন দেখে জিজ্ঞেস করে– 'আব্বাজান, মুসলমানদের আগের বাহিনীতে সৈন্য কত?'

ঃ ত্রিশ হাজার।

হেলেন সরলতার সঙ্গে বলল– 'তা হলে চিন্তা কিসের? এখন না-হয় তারা চল্লিশ হাজার হল। খ্রিস্টান তো প্রায় এক লাখ। আপনি মোটেও ভাববেন না। আমাদের বীর সেনারা মুসলমানদের কেটে টুকরো-টুকরো করে ফেলবে। তাদের আফ্রিকাদখলের স্বপ্ন চিরতরে মিটিয়ে দেবে।'

জর্জির দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন– 'আহ, যদি তেমনই ঘটত! কিন্তু মা, তুমি হতভাগা মুসলমানদের জান না। আমিও আগে জানতাম না। এরা অত্যন্ত যুদ্ধবাজ ও বীর হয়ে থাকে। মরতে তো জানেই না। আমি বিষয়টা যদি আগে থেকে জানতাম, তা হলে মিসর-সিরিয়া আক্রমণের চিন্তা-ই করতাম না। আমি নিজেই নিজপায়ে কুড়োল মারলাম। মুসলমানদের উত্তেজিত করে নিজেই এই বিপদ ডেকে আনলাম। এখন দেখো ফলাফল কী দাঁড়ায়। তোমার এ-কথা তো সত্য যে, এক লাখের মোকাবেলায় চল্লিশ হাজার কিছু নয়। কিন্তু মা, মুসলমানরা তো মানুষ নয়। সংখ্যায় যত বেশিই হোক, খ্রিস্টানরা তাদের মোকাবেলায় পেরে উঠবে না।

দেখলে তো, তারা সেই সকাল থেকে কীরূপ উদ্দীপনা ও বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করছে। এখন আরও সাহায্য এসে পৌঁছল। এতে তাদের সাহস আরও বেড়ে গেছে। এখন তারা আগের চেয়েও বেশি বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করবে।'

ঃ করুক, আমাদের খৃস্টান সৈন্যরাও কাপুরুষ নয়। আমি নিশ্চিত, শেষ পর্যন্ত জয় আমাদেরই হবে।

ঃ খোদা তোমার লাজ রক্ষা করুন।

ইতিমধ্যে নতুন ইসলামী বাহিনী রণাঙ্গনের নিকটে এসে পৌঁছেছে। মনে হল, তারা দূর থেকেই জেনে এসেছে, রণাঙ্গনে যুদ্ধ চলছে। কারণ, তাদের সকলের ডান হাতে তরবারি এবং বাঁ হাতে ঢাল উঁচানো। আর আক্রমণোদ্যত হয়েই তারা ঘোড়া হাঁকিয়ে ছুটে আসছিল।

নতুন মুসলিম বাহিনী এসে পৌঁছেই খ্রিস্টান বাহিনীর উপর আক্রমণ করতে শুরু করে। তাদের ঝকমকে ধারালো তরবারিগুলো চোখের পলকে শত্রুসেনাদের রক্তে রঞ্জিত হয়ে ওঠে। প্রতিজন মুসলিমসেনা রক্তপিপাসুর মতো শত্রুবাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।

খ্রিস্টানসেনারাও সাধ্যমতো মোকাবেলা করে যাচ্ছে। এতক্ষণ তারা আক্রমণ করে মুসলিম বাহিনীর সারি ভেদ করে তাদের অভ্যন্তরে ঢুকে যাওয়ার চেষ্টা করছিল। কিন্তু, এখন হঠাৎ তাদের কর্মকৌশল বদলে গেছে। এখন তারা আক্রমণ না-করে আক্রমণ প্রতিহত করা এবং জীবন রক্ষা করার কাজে আত্মনিয়োগ করে। তথাপি, যেহেতু তারা সংখ্যায় অনেক বেশি, তাই তারা রণাঙ্গনে দাঁড়িয়ে থাকতে এবং যুদ্ধ অব্যাহত রাখতে সক্ষম হয়।

কিন্তু, মুসলমানরা দেখতে পাচ্ছে, খ্রিস্টানদের মনোবল ক্রমান্বয়ে স্তিমিত হয়ে আসছে। এখন তাদের আক্রমণে তেজ নেই। তাই সুযোগ বুঝে মুসলমানরা প্রতিটি পয়েন্ট থেকে একযোগে জোরদার আক্রমণ করে বসে। তারা বীরত্বের সঙ্গে তরবারির আঘাত হেনে-হেনে শত্রুসেনাদের হত্যা করে চলছে। নবাগত বাহিনী বিরামহীনভাবে তাদের তরবারির ধার পরীক্ষা করে চলছে। তারা যখন যে-খ্রিস্টানকে সামনে পাচ্ছে, তাকেই হত্যা করে ফেলছে।

খ্রিস্টানরা এখন চোখে মৃত্যু ছাড়া আর কিছুই দেখছে না। তাদের সাহসী হৃদয়গুলোতে কম্পন শুরু হয়ে গেছে। এখন তাদের মাঝে আগের মতো না আছে জোশ, না মনোবল, না দৃঢ়তা। যুদ্ধ কীভাবে বন্ধ করবে, কীভাবে জীবন রক্ষা করবে এখন এ-ই তাদের ভাবনা। কিন্তু তাদের রাজা জর্জির এবং তার রূপসীকন্যা হেলেন রণাঙ্গনে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ অবলোকন করছেন। আর যেহেতু

এখন পর্যন্ত তাদের সমস্ত বাহিনী যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়নি; তাই তারা পিছু হটতেও সাহস করছে না। তারা এই আশা নিয়ে সম্মুখে অগ্রসর হচ্ছিল যে, মুসলমানদের সারি ভেদ করে ভিতরে ঢুকে তাদের সেনাপতিকে হত্যা করবে এবং পুরস্কারস্বরূপ রাজকুমারী হেলেনকে বিয়ে করবে। কিন্তু এখন তারা আক্ষেপ করছে, কেন একটি নারীর লোভে নিজের সাধের জীবনটাকে এভাবে ঝুঁকির মধ্যে নিক্ষেপ করলাম!

আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর রণাঙ্গনে পৌঁছেই এমন বীরত্বের সঙ্গে আক্রমণ করলেন যে, তিনি শত্রুবাহিনীর যে-সারিটির উপর আঘাত হানলেন, তাকে তছনছ করে দিলেন। প্রথম আক্রমণেই তিনি কয়েকজন খ্রিস্টানসেনা ও অফিসারকে যমের হাতে তুলে দেন। যেহেতু তাঁর বাহিনী এদিক-ওদিক ছড়িয়ে পড়েছিল, তাই তাঁর সঙ্গে রয়েছে মাত্র পাঁচশ অশ্বারোহীর একটি ইউনিট। এই পাঁচশ সৈনিকও ইবনে যুবাইরের অনুরূপ বীরত্বের সঙ্গে আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে। তারা একটি সারিকে ছিন্নভিন্ন করে আরেকটি সারির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে।

খ্রিস্টানরা ইসলামের এই সিংহদের মোকাবেলায় সাধ্যপরিমাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তারা পেরে উঠছে না। তারা মুসলমানদের তরবারি প্রতিহত করতে ঢাল পাতছে। কিন্তু, ধারালো তরবারি ঢাল কেটে তাদের মাথা ও কাঁধে আঘাত হানছে। ঢালও তাদের রক্ষা করতে ব্যর্থ হচ্ছে। খ্রিস্টানদের হাতের সঞ্চালনশক্তি কমে এসেছে। যতটুকু চলছে, তা ঢাল তুলে জীবন রক্ষার জন্য মাত্র। তবে তারা চিৎকার করছে বেশ জোরে-শোরে। গাধার ডাকের মতো এই বিকট ও কর্কশ চিৎকার দ্বারা মুসলমানদের সন্ত্রস্ত করতে চাচ্ছে। তাদের চিৎকারে রণাঙ্গন কেঁপে-কেঁপে ওঠছে।

আজ মুসলমানরা যুদ্ধে এত বেশি নিমগ্ন হয়ে পড়েছে যে, জোহরের সময় আসল এবং চলে গেল; কিন্তু তরা নামায পড়ার সুযোগ পেল না। কিংবা তারা টেরই পেল না, নামাযের সময় কখন আসল আর কখন গেল। দিবসের দুই-তৃতীয়াংশ শেষ হয়ে গেছে। অবশিষ্ট আছে এক-তৃতীয়াংশ। কিন্তু যুদ্ধের তীব্রতা এখন আগের তুলনায় বেশি তুঙ্গে। জানবাজগণ অতিশয় জোশ ও বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করছে। রক্তের নদী প্রবাহিত হচ্ছে। লাশের স্তূপ জমে গেছে।

এখন বেলা অপরাহ্ন। সম্রাট জর্জির সেনাপতি মারকুসকে ডেকে বললেন– 'দিনটা যুদ্ধে-যুদ্ধে শেষ হয়ে গেল; এবার যুদ্ধ বন্ধ হওয়া দরকার। বাহিনীকে পেছনে সরে আসার সংকেত দাও।'

'ঠিক আছে জাহাঁপনা' বলে মারকুস সেখান থেকে উঠে যান।

আজ সমস্ত খ্রিস্টানসৈন্য রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হয়েছিল বটে; কিন্তু সকলের যুদ্ধে শরীক হওয়ার সুযোগ ঘটেনি। মাত্র দুই-তৃতীয়াংশ সৈন্য যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে। যুদ্ধের আগুন অন্যদের পর্যন্ত পৌঁছয়নি। সেনাপতি মারকুস একজন অশ্বারোহী সেনার মাধ্যমে বাহিনীকে ফিরে আসবার আদেশ প্রেরণ করেন। আদেশ শোনামাত্র খ্রিস্টান সেনাদের দেহে প্রাণ ফিরে আসে। তারা তৎক্ষণাৎ এমন সুশৃঙ্খলভাবে ও সুকৌশলে পিছনে সরে যায়, যাতে মুসলমানরা বুঝতে না-পারে, খ্রিস্টান বাহিনী পরাজিত হয়ে পালিয়ে যাচ্ছে।

দিনভর একটানা যুদ্ধ করার কারণে মুসলমানরাও ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। তাই তারাও খ্রিস্টানদের ধাওয়া করা থেকে বিরত থাকে। বরং খ্রিস্টানদের পিছপা হতে দেখে ধীরে-ধীরে তারাও পিছনে সরে আসে। এভাবে দ্বিতীয় দিনের যুদ্ধও কোনো ফলাফল ব্যতীতই বন্ধ হয়ে যায় এবং উভয় বাহিনী আপন-আপন শিবিরে ফিরে যায়।

অল্পক্ষণ পর কয়েক হাজার খ্রিস্টানসেনা তাদের হতাহতদের তুলে নিতে ময়দানে আসে। তারা সমগ্র রণাঙ্গনে ছড়িয়ে গিয়ে আপন লোকদের কুড়িয়ে নিতে শুরু করে।

মুসলমানরা সর্বাগ্রে নামায আদায় করে। প্রথমে জোহর এবং পরে আসর নামায আদায় করে। তার পর সামান্য আহার করে। অবশেষে পাঁচশ সৈনিক শহীদ ও আহতদের তুলে আনতে রণাঙ্গনে পৌঁছে যায়।

আজকের যুদ্ধে প্রায় তিন হাজার খ্রিস্টান মারা গেছে। আহত হয়েছে চৌদ্দ হাজার। মুসলমান শহীদ হয়েছে তিনশ তেপ্পান্নজন। আহত হয়েছে একশ পঞ্চাশ। এভাবে এ-যাবত মুসলমান শহীদের মোট সংখ্যা দাঁড়াল পাঁচশ বিশে। আর মোট আহত হল ছয়শ। সেনাপতি আবদুল্লাহ ইবনে সা'দ যখন হতাহতের এই সংখ্যা অবহিত হন, তখন তিনি যারপরনাই দুঃখিত ও ব্যথিত হন। পাঁচশ মুসলমানের শহীদ হওয়া সাধারণ ব্যাপার নয়। কারণ, একজন মুসলিম যোদ্ধা পাঁচ-দশজন কাফেরের সমান। কালবিলম্ব না-করে মুসলমানরা জানাযা আদায় করে শহীদদের দাফনকর্ম সমাধা করে। মহিলারা আহতদের ব্যান্ডেজ-চিকিৎসায় আত্মনিয়োগ করে। তারা মাগরিবের আযানের আগেই সকল জখমির চিকিৎসা সম্পন্ন করে ফেলে।

সূর্য ডুবে গেছে। মাগরিবের আযানও হয়ে গেছে। নামায পড়ার জন্য মুসলমানরা দলে-দলে নামাযের স্থানে ছুটতে শুরু করেছে।

সাঁইত্রিশ.

যুদ্ধ মুলতবি হওয়ার পর যখন মুসলমানরা ক্যাম্পের দিকে ফিরে যাচ্ছিল, তখন আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রা.) যে-স্থানে ইসলামী পতাকা উড্ডীন রয়েছে, সেদিকে এগিয়ে যান। তিনি পতাকাধারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাচ্ছেন। নিয়ম অনুযায়ী ইসলামী পতাকাধারী মানেই বাহিনীর প্রধান সেনাপতি। কিন্তু গন্তব্যে পৌঁছে যখন তিনি সেনাপতি আবদুল্লাহ ইবনে সা'দের পরিবর্তে হাবীবের হাতে পতাকা দেখলেন, তো তিনি খানিক চিন্তিত ও সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠেন। মনে আশঙ্কা জাগে, তা হলে কি আবদুল্লাহ ইবনে সা'দ শহীদ হয়েছেন? না-কি তিনি অসুস্থ্য? মুজাহিদীনে ইসলামের সেনাপতি জীবিত ও সুস্থ্য থাকা সত্ত্বেও যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবেন না, তা তিনি ভাবতেই পারছেন না।

ইবনে যুবাইর হাবীবকে সালাম দিয়ে জিজ্ঞেস করেন– 'সেনাপতি কোথায়? অসুখ-টসুখ হয়েছে না-কি? না-কি... ।'

ঃ না, আল্লাহর রহমতে তিনি জীবিত এবং সুস্থ্য আছেন।

ইবনে যুবাইর যুগপৎ অনন্দিত ও বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করেন– 'তা হলে তিনি রণাঙ্গনে আসেননি কেন?'

ঃ এ-ব্যাপারে মজার এক কাহিনী শুনবেন। তবে এখন বলার সময় নেই।

ইবনে যুবাইরের বিস্ময় আরও বেড়ে যায়। তিনি কপালে ভাঁজ ফেলে বললেন– 'বিস্ময়কর কাহিনী!'

ঃ হ্যাঁ, বিস্ময়কর এক কাহিনী আছে।

ঃ আপনি আমার আগ্রহ ও কৌতূহল বাড়িয়ে তুলেছেন। সংক্ষেপে হলেও কিছু বলুন।

ঃ আমাদের আরব অঞ্চলের একটা বদনাম আছে, আমরা প্রেমপাগল। কিন্তু আফ্রিকানরা এ-ক্ষেত্রে আমাদের দেশকেও ছাড়িয়ে গেছে।

ইবনে যুবাইর আরও বিস্মিত হয়ে বললেন– 'জিজ্ঞেস করেছিলাম, সেনাপতি যুদ্ধে আসেননি কেন, আর আপনি কিনা আমাকে ভালবাসার কাহিনী শোনাতে শুরু করেছেন!'

হাবীব কথা কেটে বললেন– 'এই প্রেমই আজ সেনাপতির যুদ্ধে অংশগ্রহণ না-করার কারণ।'

ঃ বিষয়টি একটু খুলে বলুন; আমি তো কিছুই বুঝতে পারলাম না।

ঃ ব্যাপারটি হচ্ছে, আফ্রিকার সম্রাট জর্জিরের একটি অনিন্দ্যসুন্দরী কন্যা আছে। নাম হেলেন। মেয়েটি এত বেশি রূপসী যে, যে একনজর দেখে সে-

ই নাকি তার জন্য পাগল হয়ে যায়। মোটামুটি সকল খ্রিস্টান তার উপর আসক্ত এবং সবাই তাকে বিয়ে করতে আগ্রহী। সম্রাট তার বাহিনীতে ঘোষণা করেছেন, যে-ব্যক্তি মুসলিম সেনাপতির মাথা কেটে আনবে, রাজকুমারী হেলেনকে তার সঙ্গে বিয়ে দেবেন।

ইবনে যুবাইর মুচকি হেসে বললেন– 'বিস্ময়কর কাহিনীই বটে! তবে তার চেয়ে বেশি বিস্ময়কর ও বেদনাদায়ক হল একজন মুসলমান– যিনি কিনা একটি বাহিনীর সেনাপতিও– খ্রিস্টানদের ভয়ে এবং মৃত্যুর আশঙ্কায় জিহাদ ত্যাগ করে তাঁবুতে বসে আছেন। রাজকুমারীর বিয়ের প্রলোভনের ঘোষণা যেমন বিস্ময়কর ও আত্মসমর্যাদার পরিপন্থী, মুসলিম সেনাপতির তাঁবুতে বসে থাকাও তেমনি লজ্জাকর ও দুঃখজনক।'

ঃ কিন্তু, সেনাপতি নিজ থেকে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেননি। তাকে ময়দান থেকে বাধ্যতামূলক সরিয়ে রাখা হয়েছে।

ঃ ঠিক আছে, আমি এ-বিষয়ে সরাসরি তাঁর সঙ্গেই কথা বলব।

এদিন আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর অন্য ব্যস্ততার কারণে ইবনে সা'দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারেননি। পরদিন ভোরে ফজর নামাযের পর কুরআন তিলাওয়াত করে তাঁর তাঁবুতে প্রবেশ করে দেখতে পান ইবনে উমর, ইবনে আব্বাস, ইবনে জাফর, হাসান ও হুসাইন (রা.) তাঁবুতে উপস্থিত আছেন। ইবনে যুবাইরকে দেখে সকলে আনন্দিত হয়ে ওঠেন এবং সশ্রদ্ধচিত্তে স্বাগত জানান। আবদুল্লাহ ইবনে সা'দও অতিশয় আবেগের সাথে তার সঙ্গে আলিঙ্গনাবদ্ধ হন। বললেন– 'আপনি ঠিক সময়ে রণাঙ্গনে এসে পৌঁছেছেন। আপনার আগমন শত্রুবাহিনীকে ভীত ও ভাবিত করে তুলেছে।'

ঃ আমাদের আগমন খ্রিস্টানদের উপর প্রভাব বিস্তার করে থাকবে, এটা সত্য কথা। আমিও জিহাদের স্পৃহা এবং শাহাদাতের আকাঙ্ক্ষা নিয়েই এতটা পথ পাড়ি দিয়ে এসেছি।

ঃ আচ্ছা, আমীরুল মুমিনীন এবং মদীনাবাসী ভালো আছেন তো?

ঃ হ্যাঁ, আল্লাহর ফজলে সবাই ভালো আছেন। আমীরুল মুমিনীন আপনাকে সালাম বলেছেন।

ঃ ওআলাইকা ওয়া আলাইহিস সালাম। আল্লাহ তাঁকে সুস্থ্য রাখুন এবং দীর্ঘায়ু দান করুন।

ইবনে ওমর বললেন– 'কিন্তু, তিনি তো আপনাকে আটকে রেখেছিলেন। আমার ধারণা ছিল, তিনি আপনাকে অন্য কোনো অভিযানে প্রেরণ করবেন।'

ঃ আপনার ধারণা সঠিক। খলীফার আমাকে সুদান কিংবা আফগানিস্তান অভিযানে প্রেরণ করার পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু, পরে তিনি পরিকল্পনা পরিবর্তন করে ফেলেন।

ঃ দ্বিতীয় খলীফা হযরত ওমর (রা.)-এর আমলে যেসব বিদ্রোহী ইরানি ইসলামী সরকারের কাছে পরাজিত হয়েছিল, তারা আফগানিস্তান গিয়ে আফগানিদেরকে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তুলছে।

ঃ হ্যাঁ, এখন তৃতীয় খলীফা আশঙ্কা করছেন, তারা যে-কোনো সময়ে যে-কোনো ইসলামী ভূখণ্ডের উপর আক্রমণ করে বসতে পারে। তাই আফগানিস্তান অভিযান পরিচালনা করে তিনি এই শঙ্কাটা দূর করে ফেলতে চাচ্ছেন।

হযরত হাসান বললেন– 'মনে হয়, আফ্রিকাসংকট তাঁর এই পরিকল্পনা ব্যর্থ করে দিয়েছে।'

ঃ হ্যাঁ, তা-ই। এদিক থেকে কোনো সংবাদ না-পাওয়ায় তিনি চিন্তিত হয়ে পড়েছেন এবং যে-বাহিনীটিকে আফগানিস্তান প্রেরণের জন্য প্রস্তুত করেছিলেন, তাকে এদিকে পাঠিয়ে দেন।

আব্দুল্লাহ ইবনে সা'দ বললেন– 'এদিকে না-পাঠিয়ে বাহিনীটিকে আফগানিস্তান প্রেরণ করলেই ভালো হত।'

ইবনে যুবাইর বললেন– 'আপনি তাঁকে এখানকার পরিস্থিতি অবহিত করলে তিনি তা-ই করতেন।'

ঃ আমার ভুল হয়ে গেছে। আমার চিন্তা ছিল, সমগ্র আফ্রিকা জয় হয়ে গেলে মালে গনীমত ও বন্দিদের সাথে একসঙ্গে সুসংবাদটা পাঠিয়ে দেব।

সে-যুগে যোগাযোগমাধ্যম ছিল সীমিত ও কঠিন। উট-ঘোড়া-খচ্চরে চড়ে ভ্রমণ করতে হত। এক নগরীর সংবাদ আরেক নগরীতে পৌঁছাতে অনেকখানি সময় লেগে যেত। এক রাষ্ট্রের সংবাদ আরেক রাষ্ট্রে পৌঁছাতে বহুদিন সময় লাগত।

ইবনে যুবাইর বললেন– 'আপনি যদি অন্তত যাবিলা ও তারাবলিসের সংবাদটা পাঠিয়ে দিতেন, তা হলে আর খলীফাকে উৎকণ্ঠায় পড়তে হত না।'

ঃ আমি অকপটে স্বীকার করছি, আমার ভুল হয়ে গেছে। তবে, হয়ত আল্লাহ তাতেও কোনো কল্যাণ নিহীত রেখেছেন। আপনার এদিকে আসায় ভালোই হয়েছে।

ঃ তা ঠিক। আল্লাহর ইচ্ছার বাইরে কিছুই হয় না। আচ্ছা বলুন তো, আপনি জিহাদ ত্যাগ করে তাঁবুতে বসে রইলেন কেন?

ঃ আমীরুল মুমিনীনের আদেশ পালনার্থে।

ঃ আমীরুল মুমিনীন বুঝি আপনাকে আদেশ করেছেন, মুসলমানরা যখন জীবনের বাজি রেখে শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করবে, তখন আপনি চুপটি মেরে তাঁবুতে বসে থাকবেন?

ঃ না, তাঁর আদেশ এটা নয়। তিনি আদেশ করেছেন, উপদেষ্টাদের অধিকাংশ যে-পরামর্শ প্রদান করবে, আমাকে সেই মোতাবেক সিদ্ধান্ত নিতে হবে। মুসলমানরা আমাকে কেন তাঁবুতে বসিয়ে রেখেছে, সেই কাহিনী বুঝি আপনি শোনেননি?

ঃ শুনেছি। আপনি বোধহয় সম্রাট জর্জিরের কন্যার বিবাহ প্রসঙ্গের কথা বলছেন?

ঃ হ্যাঁ।

ঃ কিন্তু খ্রিস্টানরা একটি চাল চালল আর আপনারা তার সমুচিত কোনো উত্তর দিলেন না। আমার তো বড় আক্ষেপ লাগছে!

ইবনে আব্বাস বললেন– 'আব্দুল্লাহ ভাই, কাল সকাল থেকে শুরু করে সারাদিন যুদ্ধ করে আমরা যখন উভয়পক্ষ ক্লান্ত হয়ে পড়েছি, আপনি তখন এসেছেন। যদি সকালে আসতেন, তা হলে নিজচোখে দেখতেন, খ্রিস্টানরা একজন রাজকুমারীকে পাওয়ার জন্য কীরূপ উদ্দীপনা ও বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করেছে!'

ঃ তা তো করবেই। আমি শুনতে পেয়েছি, নাকি ঘোষণা হয়েছিল, যে-খ্রিস্টান আমাদের সেনাপতির মাথা কেটে নিতে পারবে, জর্জির তার সঙ্গে রাজকুমারী হেলেনকে বিয়ে দেবেন। বিপরীতে আপনারাও ঘোষণা করে দিতেন, যে-মুজাহিদ আফ্রিকার সম্রাট জর্জিরের মাথা কেটে আনবে, তাকে জর্জিরকন্যাকে দাসীরূপে দান করা হবে। এমন একটি পালটা ঘোষণা দিলে জর্জির ঠিকই দমে যেতেন!

আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইরের বক্তব্য সকলেরই মনঃপুত হয়। সকলেই বলে ওঠেন, ঠিকই তো; এমন চমৎকার একটি কৌশল তো আমাদের মাথায় আসেনি! সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যাওয়ায় সকলে আক্ষেপ করতে শুরু করে।

হযরত হাসান বললেন– 'আপনি চমৎকার একটি কৌশল বের করেছেন। ঘোষণাটি আমাদের দেয়াই উচিত ছিল।'

আব্দুল্লাহ ইবনে সা'দ বললেন– 'বাস্তবিক, আমরা বিরাট ভুল করে ফেলেছি।'

ইবনে যুবাইর বললেন– 'সুযোগ এখনও আছে। আপনি ঘোষণা দিয়ে দিন, যে-মুজাহিদ আফ্রিকার সম্রাট জর্জিরের মাথা কেটে আনবে, তাকে জর্জিরকন্যা হেলেনকে দাসীস্বরূপ দান করা হবে এবং এক লাখ দিনার পুরস্কার দেয়া হবে।'

হযরত হাসান বললেন– 'আমি একমত। ঘোষণা করে দেয়া হোক।'

ইবনে জাফর বললেন– 'আজ খ্রিস্টানরা রণাঙ্গনে আসেনি। বোধহয় আজকের দিনটা তারা বিশ্রাম করবে কিংবা অন্য কোনো ষড়যন্ত্র আঁটছে। কারণ যা-ই হোক, আজ যুদ্ধ মুলতবি থাকুক। আপনি এখনই যুবাইর ভাইয়ের প্রস্তাবটা সৈন্যদের মাঝে ঘোষণা করিয়ে দিন।'

সেনাপতি ইবনে সা'দ বললেন– 'তা-ই হবে।'

তখনই ইসলামী বাহিনীতে ঘোষণা করা হয়, যে-মুসলমান খ্রিস্টান সম্রাট জর্জিরকে হত্যা করবে, তাকে জর্জিরের রূপসীকন্যা হেলেনকে দাসীস্বরূপ দান করা হবে এবং এক লাখ দিনার পুরস্কার দেওয়া হবে।

মুসলমানরা এই ঘোষণাকে সম্রাট জর্জিরের ঘোষণার দাঁতভাঙা জবাব বলে অভিহিত করে। মুসলিম সৈনিকরাও রাজকুমারী হেলেনের রূপের কাহিনী শুনেছে। তারা জানে, এই রূপের গৌরবেই তার পিতা তাকে পুরস্কারের নামে নিলামে তুলেছিলেন। তারা আগামী দিনের যুদ্ধের অপেক্ষায় প্রহর গুণতে শুরু করে।

আটত্রিশ.

রাতে ঈশার নামায আদায় করার পর সরোয়ার আহতদের সেবা-চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে চলে যায়। আহতদের জন্য নারীক্যাম্পের সন্নিকটে তাঁবু ফেলে হাসপাতাল স্থাপন করা হয়েছে। মহিলারা আহতদের ব্যান্ডেজ পরিবর্তন, ঔষধ-পথ্য সেবন কিংবা অন্য কোনো সেবার জন্য এলে পুরুষরা এখান থেকে বেরিয়ে যায়। কাজ সেরে মহিলারা চলে যাওয়ার পর আবার পুরুষরা ফিরে আসে।

শত ব্যস্ততার মাঝেও মহিলারা পর্দার কোনো ত্রুটি করছে না। তারা যখন হাসপাতালে আসে, চাদর দ্বারা সর্বাঙ্গ এমনভাবে ঢেকে আসে যে, চোখ আর হাতের করতল ছাড়া অন্য কোনো অঙ্গ দেখা যায় না। তাদের হাসপাতালে আসবার সময় তিনটি– সকালে ফজর নামাযের পরপর, দুপুর ও রাত। সকালে এসে ব্যান্ডেজ পরিবর্তন করে ক্ষতস্থান পরিষ্কার করে। দুপুর ও রাতে খানা খাওয়ায়।

অনেক জখমির সঙ্গে গোলাম আছে। তাদের সেবা-চিকিৎসা গোলামরাই করে থাকে। এমনসব জখমিরা হাসপাতালে না-এসে নিজ-নিজ তাঁবুতেই অবস্থান করে।

সরোয়ার নারীক্যাম্পের নিকটে পৌঁছে কিশোর-কিশোরীদের কুরআন তিলাওয়াত শুনতে পায়। নিষ্পাপ শিশুদের মধুর তিলাওয়াত পরিবেশকে বিমোহিত করে তুলেছে। শিল্পীর সুরেলা কণ্ঠের গানের সুরও এত মধুর হয় না, যতটা মধুর এই শিশুদের কুরআন তিলাওয়াতের শব্দ। সরোয়ার হাঁটার গতি মন্থর করে গভীর মনোযোগসহকারে মহান আল্লাহর কালামের তিলাওয়াত শুনতে থাকে।

জোৎস্না রাত। আকাশে চাঁদ উঠেছে। আসমান থেকে জমিন পর্যন্ত মনোরম ও মনজুড়ানো চন্দ্রকিরণ ছড়িয়ে রয়েছে। পৃথিবীটায় যেন সাদা চাদর বিছিয়ে রয়েছে। যেদিকেই চোখ পড়ছে, মনে হচ্ছে, যেন আলোর বারি বর্ষিত হচ্ছে। তিরতির করে মৃদু মিষ্টিমধুর বাতাস বইছে। সরোয়ারের গায়ের ঢিলেঢালা আবাটা বাতাসের ঝাপটায় নড়াচড়া করছে। সরোয়ার কুরআন তিলাওয়াত শুনতে-শুনতে ধীরপায়ে অগ্রসর হচ্ছে। এক সময় সে নারীক্যাম্প অতিক্রম করে সম্মুখে এগিয়ে যায়। এখন ধীরে-ধীরে শিশুদের তিলাওয়াতের মধুর তান স্তিমিত হয়ে যাচ্ছে। আস্তে-আস্তে সরোয়ারের উতলাভাবও মিইয়ে আসে এবং তার হাঁটার গতি বেড়ে যায়।

সরোয়ার এখনও বেশিদূর এগোয়নি। হঠাৎ সম্মুখে সর্বাঙ্গ চাদরাবৃতা এক নারীমূর্তি চোখে পড়ে। মহিলার গন্তব্য যেহেতু নারীক্যাম্প, তাই বিপরীত দিক থেকে ওদিকে যাওয়ার তারও এটিই পথ।

সরোয়ার চোখ তুলে তাকায়। সম্মুখে সামান্য দূরে হাসপাতাল। চাঁদের আলোতে তাঁবুগুলো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে এবং মধ্যখানের পুরো পথটা নিরিবিলি-নির্জন। সরোয়ার সম্মুখ দিকে এগিয়ে-আসা মহিলার পথ ছেড়ে এগোতে থাকে। মহিলা নিকটে চলে এলে সরোয়ার হাঁটার গতি বাড়িয়ে দেয়। মহিলা সরোয়ারকে অতিক্রম করে এগিয়ে যায়। কিন্তু, পরক্ষণেই সরোয়ার অনুভব করে, কে যেন চাপা-পায়ে তার পিছনে-পিছনে হাঁটছে। সরোয়ারের মনে বিস্ময় জাগে, কে হাঁটছে! তবে পিছনে ফিরে না-তাকিয়ে সে সোজা সামনের দিকে হাঁটতে থাকে। একবার ভাবে, বোধহয় মহিলা এখনও বেশিদূর যায়নি; তার পদশব্দই কানে আসছে। কিন্তু, শেষে কয়েক পা অগ্রসর হওয়ার পর হঠাৎ পিছন দিক থেকে কে যেন বিজ্ঞের মতো বলে ওঠে– 'এভাবে পাশ কাটিয়ে কোথায় যাওয়া হচ্ছে?' শব্দটা সরোয়ারের শুধু কানেই বাজেনি– হৃদয়েও গেঁথে যায়। এই মধুর কণ্ঠটিই তাকে মাঝে-মধ্যে আত্মহারা করে তোলে। সরোয়ার মোড় ঘুরিয়ে তাকায়। দেখে, রূপরানী সালমা দাঁড়িয়ে!

সালমা গায়ের চাদরটা খুলে হাতে নিয়ে রেখেছে। সরোয়ার মনের মানুষটিকে পেয়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে বলে ওঠে– 'সালমা, তুমি?' সরোয়ারের চোখ দুটো সালমার কোমল গোলাপি গণ্ডদেশের উপর নিবদ্ধ। চাঁদের মিষ্টি আলোতে মেয়েটির মুখমণ্ডলটা ঝলমল করছে। গোলাপি মুখটা তাজা ফুলের মতো টকটক করছে। কাজল-কালো ডাগর চোখ দুটো যেন বিদ্যুৎ বর্ষণ করছে। কিন্তু মেয়েটির প্রশস্ত ললাটের উপর একটি কুঞ্চন রেখা

পড়ে আছে। এই রেখা প্রমাণ করছে, আজ মনটা তার ভালো নেই। সালমা বলল– 'আমাকে চিনেছেন বলে আমি আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।'

সরোয়ার বিনয়-বিগলিত কোমলকণ্ঠে বলল– 'প্রথমে তো চিনবার কোনো উপায়ই ছিল না।'

ঃ আমি শুনেছি, বিজ্ঞজনেরা হাঁটা দেখেও চেনে মানুষটা কে?

ঃ তা ঠিক। আমি মনে করেছিলাম অন্য কোনো মহিলা আসছে। আর যেহেতু পরনারীর প্রতি দৃষ্টিপাত করা গুনাহ, তাই...।

সালমা কথা কেটে বলল– 'ব্যস, হয়েছে। আমি বেশ জানি।'

সরোয়ারের দৃষ্টি এখনও সালমার ঝলমলে চেহারার উপর নিবদ্ধ। কণ্ঠে বিস্ময় ভাব ফুটিয়ে জিজ্ঞাসা করে– 'কী জান?'

ঃ বলব?

ঃ বলো।

ঃ রাজকুমারীকে কে দেখেছিল?

ঃ রাজকুমারী দরবারে অসংখ্য মানুষের ভিড়ের মধ্যে অশালীন পোশাক পরিধান করে সম্পূর্ণ বেপর্দা অবস্থায় উপস্থিত ছিল। ওই অবস্থায় অন্যদের মতো আমারও তার প্রতি চোখ পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু, প্রয়োজন মনে করলে তুমি আমার থেকে শপথ নাও, আমি ওই এক দৃষ্টির পর দ্বিতীয়বার আর তাকাইনি।

ঃ ভালো, তা এখন কোথায় যাচ্ছেন?

ঃ তুমি যেখান থেকে আসছ।

'আপনি আসলে কোনো কথারই সোজা উত্তর দিতে জানেন না।' বলেই সালমা বিস্ময়কর মনকাড়া এক ভঙ্গিতে শরীরটাকে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে মোড় ঘুরিয়ে নারীক্যাম্পের দিকে হাঁটতে শুরু করে।

সরোয়ার বুঝে ফেলে, তার হৃদয়রানী ক্ষেপে গেছে। কষ্টে সরোয়ারের হৃদয়টা মোচড় দিয়ে ওঠে। প্রাণটা বের হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়। বিগলিতকণ্ঠে বলে ওঠে– 'রাগ করে চলে যেও না সালমা, দাঁড়াও। তুমি জান না, তোমার রাগ-গোস্বা আমার কত অসহনীয়।'

সালমার হৃদয়টা মোমের মতো গলে যায়। সে দাঁড়ায়। সরোয়ারের প্রতি মুখ ফিরিয়ে বলে– 'সোজা করে কথা বলতে পারবেন না যখন, তখন আমাকে দাঁড় করিয়ে লাভ কী?'

সরোয়ার কয়েক পা অগ্রসর হয়ে সালমার সন্নিকটে গিয়ে বলল– 'আমার ভুল হয়ে গেছে প্রিয়া! তোমার মেজাজ জানা থাকা সত্ত্বেও আমি তোমাকে

ক্ষেপিয়ে তুলেছি। এ আমি অন্যায় করেছি। আগামীতে কথা বলার সময় সতর্ক থাকব। রাগ করো না বোনটি আমার!'

সরোয়ারের এই নমনীয় বক্তব্য সালমাকে কাত করে ফেলে– 'না, না আপনি কোনো ভুল করেননি। দোষটা আসলে আমারই। সবাই আমার সদাচারের প্রশংসা করে। আমি সকলের সঙ্গে সদাচারই করে থাকি। কিন্তু, কেন যেন আপনার সঙ্গে বাড়াবাড়ি করে ফেলি। আগামীতে এমনটা হবে না ইনশাআল্লাহ।'

ঃ আমার সৌভাগ্য যে, তুমি বিষয়টি অনুভব করতে পেরেছ।

সালমা মুচকি হেসে বলল– 'না, আর অন্যায় করব না।'

সালমার হাসিতে সরোয়ারের সাহস ফিরে আসে– 'আমি বেশ জানি, তুমি কেন আমার উপর রেগে যাও।'

সালমা আত্মহারার মতো বিস্ফারিত চোখে সরোয়ারের মুখপানে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে– 'কী জানেন আপনি?'

ঃ তুমি জান, আমি স্থির প্রতিজ্ঞা করেছি, আর আমি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করতে পারি না।

ঃ করুন না, আপনাকে কে বারণ করছে?

ঃ ওয়াদা ভঙ্গ করা পৌরুষের স্বভাব নয়।

সালমা হঠাৎ খিলখিল করে হেসে ওঠে। হাসিতে তার মুক্তাসদৃশ সাদা দন্তপাটি স্পষ্ট দেখা যায়। মুখমন্ডলে আলোর বান বইতে শুরু করে। সরোয়ার দেখতে পায়, সালমা আত্মনিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছে।

হাসি থামিয়ে সালমা বলল– 'আজ জানলাম, আপনি পৌরুষেরও দাবি করে থাকেন।'

সরোয়ার সালমার রূপবান চেহারার প্রতি তাকিয়ে থাকে। বলল– 'এ দাবি তো আমার করতে হয় না। তবে, ইচ্ছে করলে আমি বলতে পারি, বড় বীর-বাহাদুরও আমার কাছে হার মানতে বাধ্য। যত বিখ্যাত লড়াকুই হোক-না কেন, আমার মোকা ায় এসে কাত হয়ে যায়। আজ পর্যন্ত কোন বীর সৈনিক আমার মনে ভয় ধরাতে পারেনি। কিন্তু আমি যখন তোমার সম্মুখে আসি, তখন আমার অন্তরে ধুকধুকানি শুরু হয়ে যায়; সোজা করে কথা বলতে পারি না।'

সালমা মিটমিটিয়ে হাসছে। বলল– 'নাকি কথা খুঁজে পান না।'

ঃ তুমি যদি আমার সঙ্গে থাকতে আর আফ্রিকার সম্রাট জর্জিরের সঙ্গে নির্ভীকচিত্তে আমার কথা বলা শুনতে, তা হলে বুঝতে রাজা-বাদশাদের সম্মুখে কথা বলতেও আমার বাঁধে না। কিন্তু তোমার সামনে এলে আমি ঘাবড়ে যাই।'

সালমা গর্বিতচোখে সরোয়ারের প্রতি তাকায়– 'কেন ঘাবড়ে যান?'

ঃ তোমার রূপের ঝলক দেখে।

ঃ সালমা লজ্জা পায়। লাজুক চোখেই সরোয়ারের প্রতি তাকিয়ে বলল– 'এখন তো বেশ কথা বানানো শিখে ফেলেছেন।'

ঃ আমি যদি কথা গড়তেই জানতাম, তা হলে তুমি আমার উপর রাগ করতে পারতেই না। আর রাগ করো না সালমা, অন্যথায়...।

সালমা চটজলদি কথা কেটে বলল– 'অন্যথায় কোনো এক সময় আমার থেকে প্রতিশোধ নেবেন, না?'

সালমা আরবকন্যা, কুমারী মেয়ে। লজ্জার কারণে মনের সবগুলো কথা স্পষ্ট ব্যক্ত করতে পারছে না। ইচ্ছে হয় বলে, বিয়েটা হয়ে যাক; তখন শোধ নেব। কিন্তু মুখ ফোটে কথাটা বেরোয়নি। তাই একটু ঘুরিয়ে বলল। কিন্তু, সরোয়ার সালমার মনের কথাটা পড়ে ফেলে। বলল– 'অসম্ভব, আমি কোনোদিনও তোমার থেকে প্রতিশোধ নেয়ার কল্পনাও করতে পারব না।'

ঃ আপনি কোনোদিন আমার উপর শাসন চালাতে পারবেন না।

ঃ সম্পূর্ণ সত্য কথা। রূপের সৃষ্টি অভিমান করার জন্য আর প্রেমের সৃষ্টি অভিমান সহ্য করার জন্য।

সালমা আবারও লজ্জা পায়। বলল– 'আচ্ছা কবি-কবি ভাব তো!'

ঃ কাব্য গড়া আমার আসে না। সৈনিক শুধু তরবারিই চালাতে জানে– কবিগিরি নয়।

ঃ আপনি মনে হয় আমার দ্বারা আপনার সৈনিকগিরি ও বীরত্বের প্রশংসা করাতে চাচ্ছেন?

ঃ একদম না। বীর-বাহাদুররা কারও প্রশংসার কাঙাল হয় না।

সালমা হেসে বলল– 'বাহাদুর সাহেব, আমি শুনেছি, আফ্রিকার সম্রাট জর্জির নাকি ঘোষণা করেছেন, যে-খ্রিস্টানসেনা মুসলিম সেনাপতির মাথা কেটে আনবে, তার সঙ্গে তিনি তার মেয়েকে বিয়ে দেবেন?

ঃ হ্যাঁ, তুমি ঠিকই শুনেছ।

ঃ আচ্ছা, বিষয়টা আত্মমর্যাদার পরিপন্থী নয় কি? এই ঘোষণার মাধ্যমে কি তিনি আপন কন্যাকে নিলামে তুলে দিলেন না?

ঃ তা তো বটেই; কিন্তু খ্রিস্টানদের কাছে এটা অপমানজনক নয়।

ঃ কিন্তু একজন আত্মমর্যাদাসম্পন্ন মানুষ বিষয়টাকে মেনে নেয় কী করে?

ঃ বললাম না, ওদের দৃষ্টিতে এটা আত্মমর্যাদার পরিপন্থী নয়।

ঃ কিন্তু ঘটনা থেকে আমি ভালোভাবে বুঝে ফেলেছি, রাজকুমারী অতিশয় রূপসী মেয়ে এবং সমগ্র খ্রিস্টজগতে তার রূপের খ্যাতি আছে।

ঃ বটে; কিন্তু তুমি তার চেয়েও সুন্দরী...।

সালমা চিত্তহারী তির্যকচোখে সরোয়ারের প্রতি তাকিয়ে বলল– 'আবার ও-রকম কথা-বার্তা শুরু করেছেন কিন্তু আপনি।'

ঃ সত্য কথা যথাসময়ে বলে ফেলাই ভালো।

সালমা হেসে ওঠে। পরে হাসি থামিয়ে বলল– 'আপনি-না অনেক পাজি হয়ে গেছেন।'

সরোয়ার সালমার হাস্যোজ্জ্বল মুখপানে তাকিয়ে থাকে– 'বিশ্বাস না-হলে সুযোগমতো তোমার সামনে উপস্থিত করে দেখিয়ে দেব, তুমি তার চেয়েও বেশি রূপসী।'

'তাওবা তাওবা, আমি আপনার সঙ্গে আলাপে মগ্ন হয়ে পড়লাম! আব্বাজান আমার অপেক্ষা করছেন। আচ্ছা, সালাম।' বলেই সালমা মোড় ঘুরিয়ে দ্রুতগতিতে নারীক্যাম্পের দিকে হাঁটতে শুরু করে। সরোয়ার কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে তার হবু রূপসী স্ত্রীর পানে তাকিয়ে থাকে। সালমা দূরে চলে গেলে সে হাসপাতাল অভিমুখে হাঁটতে শুরু করে।

উনচল্লিশ.

জর্জির রিপোর্ট পান, দু-দিনের যুদ্ধে প্রায় পঞ্চাশ হাজার খ্রিস্টান মারা গেছে এবং চৌদ্দ হাজার আহত হয়েছে। এত অধিকসংখ্যক সৈন্যের মৃত্যুতে তিনি চিন্তিত ও বিমর্ষ হয়ে পড়েন। তার মনে বিশ্বাস জন্মাতে শুরু করেছে, মৃত্যুর এই হার যদি অব্যাহত থাকে, তা হলে মুসলমানরাই জয়ী হবে। কখনও-কখনও তার অনুভূতি জাগে, অকারণে মুসলমানদের উপর আক্রমণের পরিকল্পনা নিয়ে নিজের জন্য বিপদই ডেকে আনলাম, চরম বোকামি করলাম। এক সময় যত উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে তার মনে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার আকাঙ্ক্ষা জন্ম নিয়েছিল, এখন সন্ধি করার জন্য ততোধিক ইচ্ছা জাগ্রত হতে শুরু করেছে। মনে আক্ষেপ জাগছে, যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে মুসলমানরা তো সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে এসেছিল; তখন তাদের পাত্তা দিলাম না। সন্ধির দুটি শর্ত ছিল। মুসলমান হয়ে যাওয়া এবং জিযিয়া প্রদান করা। উভয় শর্তকেই অগ্রহণযোগ্য মনে করেছিলাম। তবে, এখনও এই দুটি শর্ত অগ্রহণযোগ্যই মনে হচ্ছে। তিনি ভাবছেন, মান-মর্যাদা রক্ষা করে যদি তৃতীয় সহজ কোনো

শর্তে সন্ধি করে ফেলা যেত! কিন্তু তিনি এটাও জানেন, মুসলমান একবারই সন্ধির প্রস্তাব পেশ করে। যতই ক্ষতি স্বীকার করার আবশ্যক হোক, তারা একবারের পর দ্বিতীয়বার সন্ধির জন্য আসে না। তাই জর্জির এমনটি আশা করতে পারছেন না যে, মুসলমানরা আবারও সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে আসবে। নিজের পক্ষ থেকে উদ্যোগ শুরু করা, সে-ও তো মানহানিকর! তা ছাড়া এখন নিজের থেকে কিছু বলতে গেলে মুসলমানরা ভাববে, আমি দমে গেছি। আর সে-কারণে তারা সন্ধি করতে সম্মত হবে না।

দ্বিতীয় দিনের যুদ্ধ শেষে তাঁবুতে ফিরে এসে জর্জির এই ভাবনা ও উৎকণ্ঠায় কেবল এপাশ ওপাশ করতে থাকেন। তার চোখে ঘুম এল না। থেকে-থেকে মনে তার এই আক্ষেপই জেগে উঠছিল যে, কেন আমি যুদ্ধের সূচনা করলাম, কেন জীবনে অশান্তি টেনে আনলাম!

শেষ প্রহরে তার দু-চোখের পাতা বুজে আসে। স্বপ্নে দেখেন, তিনি সৈন্য-সামন্তসহ এক বিজন অঞ্চলে শিকারে যাচ্ছেন। কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর একপাল হরিণের দেখা পান। তিনি ও তার সৈন্যরা ভাষাহীন জীবগুলোর পিছনে ছুটতে শুরু করেন। রাত পোহায়ে সূর্য উদিত হয়েছে। রোদ উঠেছে। হরিণগুলো সম্মুখে-সম্মুখে দৌড়াচ্ছে। তিনি এবং তার শিকারীর দল ওদের ধাওয়া করে ফিরছে। তার চোখ দুটো হরিণগুলোর উপর নিবদ্ধ। এক সময়ে তারা হরিণগুলোর কাছাকাছি পৌঁছে যায়। এখন তাদের ও হরিণগুলোর মাঝে কয়েক পায়ের দূরত্ব মাত্র। তিনি তরবারি দ্বারা হরিণগুলো শিকার করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। খাপ থেকে তরবারিটা বের করে হাতলটা শক্ত করে ধরেন। এ-মুহূর্তে তিনি সকলের সামনে। কিন্তু যেইমাত্র তিনি হরিণগুলোর উপর আঘাত হানতে উদ্যত হন, হঠাৎ হরিণগুলো ব্যাঘ্রের রূপ ধারণ করে ফেলে এবং নিরীহ হরিণ থেকে রক্তখোর হিংস্র বাঘে পরিণত হয়ে যায়।

সহসা সম্মুখে অনেকগুলো বাঘদর্শনে জর্জিরের আত্মা শুকিয়ে যায়। তার সমস্ত শরীর ভয়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। তিনি লাফ মেরে পিছনে সরে আসেন এবং সাহায্যের জন্য সঙ্গীদের ডাকতে শুরু করেন। কিন্তু ভয়ার্তচোখে সবদিক দৃষ্টিপাত করে কাউকে দেখতে পেলেন না। সকলেই উধাও। তার ভয় আরও শতগুণ বেড়ে যায়। নিজেকে বিপদগ্রস্ত ও অসহায় ভাবতে শুরু করেন। কিন্তু পরক্ষণেই দেখতে পান তার রূপসীকন্যা হেলেন একস্থানে ঘোড়ার পিঠে বসে আছে। তার চোখে-মুখে ভয়ের লেশমাত্র নেই। সে মন খুলে হাসছে। মেয়েটি ভাবলেশহীন কণ্ঠে বলল– 'ভয় পেও না বাবা, ওরা তোমার কোনো ক্ষতি

করতে পারবে না।' জর্জিরের দেহের রক্ত শুকিয়ে গেছে। ভয়ে শরীরটা তার থরথর করে কাঁপছে। মোড় ঘুরিয়ে মেয়েকে সাবধান করার জন্য বলবেন, বাঘ আক্রমণ করেছে; আমাকে বাঁচাও। কিন্তু মোড় ঘুরিয়ে তাকিয়েই তিনি হতবাক, হেলেনও উধাও!

জর্জিরের ভয় আরও বেড়ে যায়। তিনি ঘোড়ার মোড় ঘুরিয়ে ফিরে ছুটতে শুরু করেন। ছুটন্ত অবস্থায় পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখেন, বাঘগুলো লাফিয়ে-লাফিয়ে তাকে ধাওয়া করছে। তিনি ঘোড়ার গতি বাড়িয়ে দেন। ঘোড়া সর্বশক্তি ব্যয় করে ছুটতে থাকে।

জর্জির উক্ত অঞ্চল থেকে বেরিয়ে আসেন। এবার তিনি এমন একটি ভূখণ্ডে প্রবেশ করেন, যার রং গোলাপি। মাটি, ঘাস, গাছ, গাছের ডাল-পাতা ইত্যাদি সব কিছুর বর্ণ গোলাপি। জর্জির মাথা তুলে আকাশপানে তাকিয়ে দেখেন নীল আকাশটার রংও আজ গোলাপি। এমন ভূখণ্ড তিনি জীবনে আর কখনও দেখেননি। রোদটা পর্যন্ত গোলাপি। জর্জির যারপরনাই বিস্মিত হয়ে পড়েন। তিনি এই অঞ্চলটা তাড়াতাড়ি ত্যাগ করতে দ্রুত ঘোড়া হাঁকান। তিনি অবাক্‌চোখে পিছন দিকে ফিরে তাকান। দেখেন, হিংস্র বাঘগুলো একেবারে নিকটে এসে পড়েছে। তিনি ছুটে চলছেন।

এক সময় তিনি একটি নদীর তীরে এসে পৌঁছান। নদীতে রক্তের মতো লাল পানি প্রবাহিত হচ্ছে। তিনি ঘোড়াটাকে নদীতে নামাতে চেষ্টা করেন। কিন্তু ঘোড়া নামল না। তিনি চিৎকার দিয়ে ওঠেন। এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখেন, তাঁর কয়েকজন প্রজা এখানে-ওখানে দাঁড়িয়ে ভয়কাতর চোখে তাকে দেখছে।

রাত পোহায়ে এখন বেশ বেলা হয়ে গেছে। রোদের কিরণে জর্জিরের তাঁবুর ভিতরটা আলোকিত হয়ে ওঠেছে। তার ঘুম ভেঙে গেছে। এখনও তার মন-মস্তিষ্কে ভয়ানক স্বপ্নের গভীর প্রভাব রয়ে গেছে। চোখ খোলামাত্র তিনি ভয়ে কেঁপে ওঠেন। হঠাৎ তার দেহটা কাঁটা দিয়ে ওঠে। তিনি চুপচাপ বিছানায় পড়ে থেকে ড্যাবড্যাবে চোখে রূপসী দাসীদের প্রতি তাকিয়ে থাকেন।

এক দাসী বলল- 'মহারাজ ভয়ংকর কোনো স্বপ্ন দেখেছেন বোধ হয়?'

জর্জির কাঁপাকণ্ঠে উত্তর দেন- 'হ্যাঁ; তুমি দৌড়ে গিয়ে একজন প্রহরীকে এক্ষুনি সেনাপতি মারকুস এবং প্রধান পাদরি থেভডোসকে নিয়ে আসতে বলো।'

দাসী 'জি আচ্ছা' বলে আদেশ পালনার্থে উঠে যায়।

জর্জির বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ান। জরুরি কার্যাদি সম্পাদন করে হাত-

মুখ ধুয়ে অপর একটি তাঁবুতে গিয়ে বসেন। সম্রাট জর্জির এই তাঁবুতে বসেই বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে বৈঠক করেন। অত্যধিক সুসজ্জিত তাঁবুটি। যেন একটি রাজ হলরুম। অল্পক্ষণ পরই সংবাদ আসে, থেভঢোস ও মারকুস এসে পৌঁছেছেন। জর্জির তাদেরকে তাঁবুতে ঢেকে পাঠান। তারা এসে তাঁবুতে প্রবেশ করে একধারে বসে পড়েন। জর্জির কোনো ভূমিকা ছাড়াই থেভঢোসকে উদ্দেশ করে বললেন– 'রাতে আমি অত্যন্ত ভয়ানক ও বিস্ময়কর এক স্বপ্ন দেখেছি।'

থেভঢোস বললেন– 'ঈসা মসীহ্ আপনার ও আমাদের সকলের মঙ্গল করুন। বলুন কী স্বপ্ন দেখেছেন?'

সম্রাট জর্জির বিস্তারিতভাবে স্বপ্নের বিবরণ প্রদান করেন। শুনে মারকুস ও থেভঢোস দারুণ বিস্মিত ও চিন্তিত হয়ে পড়েন। কিছুক্ষণ অবনতমস্তকে চিন্তামগ্ন থাকার পর মাথা তুলে থেভঢোস বললেন– 'বাস্তবিকই অতিশয় বিস্ময়কর ও ভয়ংকর স্বপ্ন বটে! কিন্তু আপনি একবিন্দু বিচলিত হবেন না। আমার মনে হচ্ছে, গতকাল দিনভর আপনি ভয়াবহ যুদ্ধের দৃশ্য অবলোকন করেছেন। তাই স্বপ্নযোগে সেসব দৃশ্যই ভিন্ন আঙ্গিকে আপনার সম্মুখে ভেসে ওঠেছে। স্বপ্ন কল্পনার প্রতিচিত্র বই নয়। সাধারণত মানুষ শোয়ার সময় যা কিছু কল্পনা করে, ঘুমের মধ্যে তা-ই দেখে। আচ্ছা, আপনি কি শোয়ার সময় মুসলমানদের কল্পনা করেছিলেন?'

ঃ অপয়া মুসলমানদের কল্পনায় রাতের বেশিরভাগ সময়ই আমি এপাশ-ওপাশ করে নির্ঘুম কাটিয়েছি।

ঃ ব্যস, আপনার ভয়ের কিছু নেই। যা কিছু কল্পনা করেছিলেন, ওসবই স্বপ্নে দেখেছেন।

ঃ কিন্তু আমার আশঙ্কা হচ্ছে মুসলমানরা আমার বাহিনীকে পরাজিত করে আমাকে হত্যা করে ফেলে কিনা!

থেভঢোস সান্ত্বনার সুরে বললেন– 'কক্ষনো এমনটি হবে না। আপনার প্রতি খোদা ও ঈসা মসীহর অপরিসীম অনুগ্রহ আছে। আপনার জয় সুনিশ্চিত এবং অতি নিকটে। আপনি মনে কোনো দুঃচিন্তা স্থান দেবেন না।

ঃ কিন্তু দু-দিনের যুদ্ধের পর আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি, জয় মুসলমানদেরই হবে।

থেভঢোস আবেগপ্রবণ হয়ে ওঠেন। বললেন– 'এমনটি কোনোদিনও হবে না মহারাজ। জয় খ্রিস্টানদেরই হবে। হযরত ঈসা মসীহ্ স্বয়ং এসে খ্রিস্টানদের সাহায্য করবেন।'

ঃ কিন্তু তিনি এতদিনেও আসলেন না কেন?

ঃ এখনও তিনি খ্রিস্টানদের পরীক্ষা নিচ্ছেন।

ঃ হযরত, আমরা খ্রিস্টান। খোদা ও তাঁর পুত্রকে মান্য করি। আমাদের পরীক্ষা নেয়া হচ্ছে কেন?

ঃ এটা খোদার রহস্য, খোদার লীলা। খোদার লীলা-রহস্য মানুষের পক্ষে বোঝা কঠিন। আপনি শান্ত হোন।

ঃ কিন্তু আমি সন্ধি করে যুদ্ধ থেকে হাত গুটিয়ে নেয়া ভালো মনে করি।

থেভডোস যখন দেখলেন, সম্রাট যুদ্ধ থেকে সরে আসতে চাচ্ছেন, তখন কৌশলে কাজ নিতে মনস্থ করেন। বললেন– 'কিন্তু, সন্ধি কীভাবে সম্ভব?'

ঃ সে পরামর্শের জন্যই আমি আপনাদের তলব করেছি। মুসলমানরা সন্ধির দুটি শর্ত আরোপ করেছিল...।

ঃ কিন্তু সেই শর্ত দুটো খুবই কঠিন ছিল। একজন আত্মমর্যাদাসম্পন্ন খ্রিস্টান, বিশেষ করে আপনার ন্যায় একজন প্রতাপান্বিত মহান রাজা এমন শর্ত গ্রহণ করতে পারেন না।

থেভডোস তড়িঘড়ি করে কথাটা এজন্য বলে ফেললেন যে, তার মনে ভয় ঢুকে গেছে, সম্রাট উক্ত শর্তগুলোর কোনো একটি মেনে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে বসেন কি-না।

জর্জির বললেন– 'আপনি সত্য বলেছেন। এই দুটো শর্তই অগ্রহণযোগ্য। কিন্তু, ভেবে দেখুন তো, এমন কোনো কৌশল খুঁজে বের করা যায় কি-না, যার ফলে মুসলমানরা সন্ধি করতে বাধ্য হবে।'

আফ্রিকার সম্রাট মুসলমানদের পতন ঘটানোর প্রতিজ্ঞা নিয়েছিলেন। মিসর-সিরিয়া জয় করে তার আরবের উপরও সেনাভিযান পরিচালনা করার পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু এখন মুসলমানদের দুদিনের যুদ্ধ দেখার পরই সন্ধি করতে প্রস্তুত হয়ে গেছেন। অথচ, তিনি জানেন, মুসলমানরা এখনও তার বাহিনীর মাত্র তিন ভাগের এক ভাগ।

মারকুস বললেন– 'মুসলমানদের যুদ্ধের দৃশ্য মহারাজ অপেক্ষা আমি বেশি দেখেছি। আমার মনে হচ্ছে, তাবৎ বিশ্বে মুসলমান অপেক্ষা যুদ্ধে বেশি আগ্রহী, নির্ভীক ও সাহসী আর কোনো জাতি নেই। যুদ্ধ অব্যাহত থাকলে আমাদের সব কজন সৈন্যের প্রাণ হারাবার আশঙ্কা আছে। মাত্র দু-দিনের যুদ্ধে মুসলমানরা পঞ্চাশ হাজার খ্রিস্টানকে হত্যা এবং চৌদ্দ-পনেরো হাজারকে আহত করেছে। তাই আমার মতে সন্ধি করে নেয়াই মঙ্গলজনক হবে।

মুসলমানরা যে-দুটি শর্ত আরোপ করেছে, সেগুলো গ্রহণ করার মতো নয়। তবে, আমরা একটি কাজ করতে পারি। মুসলমানদের সেনাপতিকে কোনো একটি প্রলোভনের ফাঁদে ফেলে সন্ধি করিয়ে নেয়া যেতে পারে।'

জর্জির বললেন– 'এই দুর্মুখ মুসলমানরা কারও কোনো প্রলোভনের জালে আটকায় না।'

ঃ জীবনের নিরাপত্তা পেলে আমি আরেকটি কথা বলতে চাই।

ঃ নির্ভাবনায় বলো।

ঃ রাজকুমারীর রূপের খ্যাতি মুসলমানদের কানেও পৌঁছেছে। মহারাজ যদি মুসলমানদের সেনাপতিকে রাজকুমারীর বিয়ের লোভ দেখান, তা হলে নিশ্চয়ই তিনি সন্ধি করে ফেলবেন। আর এভাবে আমাদের দেশটা ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পাবে।

ঃ ভেবে দেখা যায়।

সহসা থেভড়োসের মনে ভয় ঢুকে যায়, পাছে মুসলমানরা প্রস্তাবটা মেনে নিয়ে ফেলে কি-না! তিনি চাচ্ছেন না কোনো মুসলমানের সঙ্গে রাজকুমারীর বিয়ে হোক। তাই বললেন– 'এ তো বিরাট অপমানজনক ব্যাপার। একজন সম্রাটের পক্ষে এটা মোটেও মানানসই নয়।'

জর্জির বললেন– 'হ্যাঁ, আমিও বিষয়টি অমর্যাদাকর মনে করছি।'

থেভড়োস বললেন– 'আমি জানতে পেরেছি, রাজকুমারীকে পাওয়ার আশায় খ্রিস্টানরা অত্যন্ত উৎসাহ ও বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করছিল। আজ আপনি এ-ও ঘোষণা করে দিন, আগামী কাল রাজকুমারী নিজে যুদ্ধে অবতীর্ণ হবে। দেখবেন, খ্রিস্টানরা তখন কীরূপ প্রাণপাত লড়াই করে এবং কীভাবে মুসলমানদের পরাস্ত করে ফেলে। হযরত মসীহ না করুন, কালও যদি যুদ্ধের কোনো ফলাফল না দাঁড়ায়, তা হলে অন্য কোনো পন্থা খুঁজে বের করতে হবে। আপনার নিকট এখনও পর্যাপ্ত সৈন্য আছে।'

জর্জির বললেন– 'ঠিক আছে, আগামী কালের যুদ্ধে এ-কৌশলটা প্রয়োগ করে দেখা হোক।'

বৈঠক সমাপ্ত হয়ে যায়। সম্রাট জর্জির ঘোষণা করেন– 'আগামী কাল তিনি নিজে এবং তার রূপসী বীরকন্যা হেলেনও যুদ্ধে অবতীর্ণ হবেন। আর যে-খ্রিস্টান যতজন মুসলমানকে হত্যা করবে, তাকে তত হাজার দিনার পুরস্কার দেওয়া হবে। আর যে-ব্যক্তি মুসলমানদের সেনাপতিকে হত্যা করবে, তার সঙ্গে রাজকুমারী হেলেনকে বিয়ে দেওয়া হবে।'

ঘোষণা শোনামাত্র খ্রিস্টানরা নতুন উদ্যমে যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু করে।

চল্লিশ.

পরদিন রাত পোহাবামাত্র খ্রিস্টান বাহিনীতে যুদ্ধের ডংকা বেজে ওঠে। খ্রিস্টান সৈন্যদের মাঝে চাঞ্চল্য শুরু হয়ে যায়। অশ্বারোহী ইউনিটগুলো রণাঙ্গনে এসে-এসে সারিবদ্ধ হতে শুরু করে। প্রতিজন খ্রিস্টান সৈনিক জেনে গেছে, আজ রূপসী রাজকুমারী এবং তাদের সম্রাট স্বয়ং যুদ্ধ করবেন। যে-খ্রিস্টান যত মুসলমানকে হত্যা করবে, তাকে তত হাজার দিনার পুরস্কার দেওয়া হবে। তা ছাড়া যে মুসলিম সেনাপতিকে হত্যা করবে, তার জন্য রাজকুমারীকে পাওয়ার প্রতিশ্রুতি তো আছেই। তাই আজ গত যুদ্ধের তুলনায় খ্রিস্টানদের উৎসাহ অনেক বেশি। প্রতিজন সৈনিক আজ যেন সকলের চেয়ে বড় বীর যোদ্ধা। সেনাপতি মারকুস, তদীয় পুত্র সালওয়ানুস পরিপূর্ণরূপে অস্ত্রসজ্জিত হয়ে এসেছেন। আজ সম্রাটও যেহেতু যুদ্ধ করবেন, তাই তিনিও অস্ত্রসজ্জিত। ইতিপূর্বে তিনি যখনই রণাঙ্গনে আগমন করতেন, একধারে পাতা সামিয়ানার নিচে দাঁড়িয়ে থাকতেন। কিন্তু আজ সেই সামিয়ানা নেই। রূপরানী হেলেন আজ রৌপ্যবর্মের উপর গোলাপি রেশমি পোশাক পরিধান করেছে। পোশাকটির সর্বাঙ্গ হীরা ও মুক্তার জরিলাগানো। সোনা ও হীরার গহনায় ঢেকে আছে মেয়েটি। মাথায় অতিশয় সুন্দর একটি মুকুট। মুকুটটিও মণি-মুক্তাখচিত। রাজকুমারীর পোশাক, পোশাকের মণি-মুক্তা, অলংকার ও মুকুটের হিরে-জহরতগুলো ঝকমক করছে। সবাই মিলে তার মুখমণ্ডলটাকে আগুনের গোলায় পরিণত করেছে। চেহারাটা তার এত বেশি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে যে, দর্শকরা তার উপর চোখ রাখতে পারছে না। এই মুহূর্তে কোনো কিছুর সঙ্গে তাকে তুলনা করা যাচ্ছে না– তার সামনে হুর-পরীও কিছুই না।

আজ হেলেনও অস্ত্রসজ্জিতা। অত্যন্ত নির্ভীক ও প্রশান্তমনে ঘোড়ার পিঠে বসে মুসলমানদের প্রতি তাকিয়ে আছে। সেনাপতি মারকুস সর্বসম্মুখের বাহিনীতে অবস্থান করছেন। সালওয়ানুস রাজকুমারীর পার্শ্বে একধারে দাঁড়িয়ে আছে। রাজকুমারীর প্রেমে পাগলপারা ছেলেটি আড়চোখে বারবার রাজকুমারীর চাঁদসুন্দর চেহারাটা দেখছে।

খ্রিস্টানদের ময়দানে এসে সারিবদ্ধ হতে দেখে মুসলমানরাও অস্ত্রসজ্জিত হয়ে প্রস্তুতি শুরু করে। সেনাপতি আব্দুল্লাহ ইবনে সা'দ আজ আর তাঁবুতে বসে থাকবেন না। তিনি অস্ত্রসজ্জিত হয়ে হাতে পতাকা নিয়ে রণাঙ্গন অভিমুখে অগ্রসর হতে শুরু করেন। প্রস্তুত হয়ে মুসলিম বাহিনী রণাঙ্গনে এসে সারিবদ্ধ হতে শুরু করে। আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইরও প্রস্তুত হয়ে যান। ঘোড়ার পিঠে চড়ে তিনি ইবনে সা'দের পার্শ্বে এসে দাঁড়ান।

ঃ কিছু বলবেন কি?

ঃ হ্যাঁ।

ঃ বলুন।

ঃ আমার পরামর্শ হচ্ছে, আজ অর্ধেক সৈন্য খ্রিস্টানদের মোকাবেলা করুক। অবশিষ্ট অর্ধেক সৈন্যকে লুকিয়ে রাখা হোক। যুদ্ধরত বাহিনী ক্লান্ত হয়ে পড়লে দুপুরের সময় তারা ক্যাম্প থেকে হঠাৎ বের হয়ে আক্রমণ চালাবে।

ঃ কৌশলটা ভালোই মনে হচ্ছে। ঠিক আছে, তা-ই করা হোক। আপনি হাসান ও হুসাইনকে আমার আদেশ জানিয়ে দিন, যেন তারা নিজ-নিজ বাহিনী নিয়ে ক্যাম্পেই অবস্থান করে। আর আপনিও তাদের সঙ্গে থাকুন।

ইবনে যুবাইর 'জি আচ্ছা' বলে চলে যান। হযরত হাসান ও হুসাইনকে সেনাপতির আদেশ জানিয়ে দেন। তিন কমান্ডার নিজ-নিজ বাহিনীসহ ক্যাম্পেই রয়ে যান।

আব্দুল্লাহ ইবনে সা'দ রণাঙ্গনে পৌঁছেই বাহিনীকে বিন্যস্ত করে ফেলেন। ডান, বাম, পশ্চাৎ ও মধ্যস্থল সব ঠিক করে ফেলেন। যেহেতু আজ অর্ধেক সৈন্য ক্যাম্পে রয়ে গেছে, তাই নারী-শিশু ও ক্যাম্প পাহারার জন্য অতিরিক্ত সৈন্য রাখার প্রয়োজন হয়নি। সরোয়ারও ময়দানে এসে ডান বাহুতে গিয়ে দাঁড়িয়ে যায়।

উভয়পক্ষের বিন্যাস সম্পন্ন হলে খ্রিস্টান বাহিনী বাজনা বাজাতে-বাজাতে এবং হট্টগোল করতে-করতে অগ্রসর হতে শুরু করে। আব্দুল্লাহ ইবনে সা'দও কামনা করছিলেন, দ্রুত যুদ্ধের ফল ফলে যাক। তাই তিনিও ইসলামী বাহিনীকে সম্মুখে অগ্রসর হতে ইঙ্গিত করেন। ইঙ্গিত পাওয়ামাত্র ইসলামের বীর সৈনিকগণ অত্যন্ত উদ্দীপনার সঙ্গে অগ্রসর হতে শুরু করে।

ইসলামী বাহিনীর সেনাপতি যে-ঘোষণা করেছেন, তা খ্রিস্টানরা জানে না। মুসলমানরা জানে না, আফ্রিকার সম্রাট জর্জির নতুন করে কী ঘোষণা দিয়েছেন। উভয়পক্ষ অগ্রসর হয়ে পরস্পর পরস্পরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তরবারিগুলো কোষ থেকে বেরিয়ে আসে। কালো ঢালগুলো ঊর্ধ্বে উঠে যায়। রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ শুরু হয়ে যায়। উভয়পক্ষই আগের তুলনায় বেশি উদ্দীপ্ত, অধিক ক্ষিপ্ত। ফলে, শুরু হওয়ামাত্র যুদ্ধ ঘোরতর রূপ ধারণ করে। শুরু থেকেই উভয়পক্ষের সৈন্যরা অসীম উদ্দীপনা ও অনুপম বীরত্বের সঙ্গে লড়াই আরম্ভ করে। তরবারিগুলো এত দ্রুত সঞ্চালিত হচ্ছে, যেন সেগুলো অবনমিত হচ্ছেই না এবং যোদ্ধারা সেগুলো উর্ধ্বে তুলে ধরে দাঁড়িয়ে আছে। খড়ের ঘরে

আগুন লাগলে যেমন বাতাসে দ্রুত আগুন ছড়িয়ে দাউদাউ করে ওঠে, আজ যুদ্ধের লেলিহান শিখা তেমনি দাউদাউ করে জ্বলছে। আগুনের মতো যুদ্ধও আজ সামনে যা কিছু পাচ্ছে, পুড়িয়ে ভস্ম করে দিচ্ছে। সারির-পর-সারি ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যাচ্ছে। হট্টগোল প্রতিমুহূর্তে বৃদ্ধি পাচ্ছে। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন তরবারিগুলো মুহূর্তমধ্যে রক্তরঞ্জিত হয়ে গেছে। অগণিত মস্তক দেহ থেকে ছিন্ন হয়ে গেছে। কর্তিত মাথাগুলো বৃন্তচ্যুৎ পাকা আমের মতো টুপটুপ করে মাটিতে পড়ছে। রক্তের ফোঁটা উড়ছে, যেন রক্তবৃষ্টি হচ্ছে। যুদ্ধ অবর্ণনীয় ঘোরতর রূপ ধারণ করেছে।

আজ মুসলমান রণাঙ্গনে এসেছে প্রায় বিশ হাজার। ক্যাম্পে রয়ে গেছে সমানসংখ্যক। কিন্তু, এই বিশ হাজারই প্রতিপক্ষকে নিশ্চিহ্ন কিংবা পরাজিত করে তাড়িয়ে দেওয়ার জন্য বদ্ধপরিকর হয়ে যুদ্ধ করছে। অথচ, এই মুহূর্তে তাদের মোকাবেলায় খ্রিস্টান সৈন্যের সংখ্যা সত্তর হাজার। আজ কত মুসলমান ময়দানে এসেছে, সেদিকে খ্রিস্টানদের কোনো খেয়ালই নেই। তারা বুঝে বসে আছে, মুসলমানদের সমগ্র বাহিনীই যুদ্ধ করছে। যদি জানত, যারা যুদ্ধ করছে, তারা মুসলমানদের অর্ধেক সৈন্য, তা হলে তাদের মনোবল কিছু বেড়ে যেত। তথাপি খ্রিস্টানরা অত্যন্ত বীরত্ব ও শক্তিমত্তার সঙ্গে লড়াই করছে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, আজ তারা মুসলমানদের হত্যা ও নিশ্চিহ্ন না-করে ক্ষান্ত হবে না। উভয়পক্ষের তরবারিগুলো অত্যন্ত উদ্দীপনার সঙ্গে কাজ করে চলেছে। বড়-বড় সুঠাম-সুদেহী বীরযোদ্ধা কেটে-কেটে পড়ে যাচ্ছে। খ্রিস্টানরাও নিহত হচ্ছে, মুসলমানরাও হচ্ছে। মুসলমানদের তুলনায় খ্রিস্টানরা বেশি হতাহত হচ্ছে। মুসলমানরা তাদেরকে পশুর মতো যবাই করছে। তবু খ্রিস্টানরা দমছে না। তাদের উদ্দীপনা ও বীরত্বে এতটুকু ভাটা পড়ছে না। সঙ্গীরা যত খুন হচ্ছে, জীবিতদের মনোবল ও বীরত্ব তত বেড়ে যাচ্ছে। আজ মুসলমানরা আপন সত্তাকে ভুলে গেছে। তারা লাফিয়ে-লাফিয়ে আক্রমণ করছে। শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করে-করে আপন তরবারির দ্বারা তাদের কর্তন করে চলেছে। পায়ে-পায়ে লাশ বিছিয়ে গেছে। লাশগুলো ঘোড়ার পদতলে পিষ্ট হচ্ছে। অশ্বক্ষুরের আঘাতে বলের মতো গড়াগড়ি খাচ্ছে। নিহতদের ঢাল-তরবারি-বর্শা ও অন্যান্য অস্ত্র স্থানে-স্থানে পড়ে আছে। মুসলমানরা এত বীরত্বের সঙ্গে আক্রমণ করছে যে, খ্রিস্টান সৈন্যদের সঙ্গে তাদের ঘোড়াগুলোও মৃত্যুমুখে পতিত হচ্ছে। তাই এখানে-ওখানে বহু ঘোড়াও মৃত পড়ে আছে। মৃত ঘোড়ার লাশের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে যুদ্ধরত ঘোড়াও হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাচ্ছে।

এখন হট্টগোল ও ডাক-চিৎকার তুঙ্গে উঠে গেছে। রণাঙ্গনে মৃত্যুর গরমাগরমি চলছে। সম্রাট জর্জির ও রাজকুমারী হেলেন এই মুহূর্তে ঘোড়ার পিঠে দাঁড়িয়ে নিশ্চিন্তমনে যুদ্ধ দেখছেন। সূর্য কিরণ ছড়াচ্ছে। রোদ খানিকটা প্রখর হয়ে ওঠেছে। তাই রূপরানী হেলেনের গোলাপি গণ্ডদেশ ঘর্মাক্ত হয়ে গেছে। তার পাপড়ির মতো গোলাপি চেহারাটা ঘর্মসিক্ত হয়ে আরও মনকাড়া হয়ে ওঠেছে। পিতা ও কন্যা দুজন দুটি ঘোড়ার পিঠে দাঁড়িয়ে দেখছেন। যুদ্ধক্ষেত্রটা এখনও তাদের থেকে খানিক দূরে। তবে, প্রতি মুহূর্তেই এই আশঙ্কা তাড়া করে ফিরছে, এই বুঝি যুদ্ধের লেলিহান আগুন এসে তাদেরও গ্রাস করে ফেলবে। এমন সময়ে এক অশ্বরোহী ছুটে এসে জর্জিরের পার্শ্বে দাঁড়িয়ে ঘোড়ার পিঠে বসে মাথাটা অবনত করে আদবের সঙ্গে সালাম করে ফিসফিস করে তার কানে কী যেন বলল। হেলেন আগন্তুক অশ্বারোহী এবং জর্জির উভয়ের দিকে তাকিয়ে আছে। সে দেখতে পেল, হঠাৎ সম্রাটের মুখটা মলিন হয়ে গেছে এবং চিন্তিতমনে কী যেন ভাবতে শুরু করেছেন। আরোহী চলে যায়।

রাজকুমারী জিজ্ঞেস করে– 'আব্বাজান, লোকটা কোনো খারাপ সংবাদ শুনিয়ে গেল না-কি?'

জর্জির খানিক নড়েচড়ে আত্মসংবরণ করে বললেন– 'লোকটা আমাদের গুপ্তচর– মুসলমানদের সংবাদ জানতে গিয়েছিল।'

হেলেন অপলকচোখে পিতার মুখপানে তাকিয়ে আছে। চেহারায় উৎকণ্ঠার ছাপ। বলল– 'কী সংবাদ নিয়ে এসেছে?'

ঃ মুসলমানদের সেনাপতি তার বাহিনীর মাঝে ঘোষণা করেছে, যে-ব্যক্তি আফ্রিকার সম্রাট অর্থাৎ– আমার মাথা কেটে নেবে, তাকে আমার কন্যা হেলেন অর্থাৎ– তোমাকে দাসীরূপে দান করবে আর এক লাখ দিনার পুরস্কার দেবে।

শুনে হেলেনের চেহারাটা লাল হয়ে যায়। হৃদয়টা উদ্দীপ্ত ও উত্তেজিত হয়ে ওঠে। দাঁত কড়মড় করে ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলে ওঠে– 'বেটার এত বড় সাহস! গোস্তাখ মুসলিম সেনাপতিকে উত্তর দেবে আমার এই তরবারি!' বলেই হেলেন তার ক্ষুদ্র ধারালো তরবারিটা কোষ থেকে বের করে হাতে নিয়ে উর্ধ্বে তুলে ধরে বলল– 'যে-যে মুসলমানের মাথায় আমার পিতাকে হত্যা করার খুন চাপবে, তাকে জবাব দেবে আমার এই তরবারি। কার বুকের পাটা কতখানি চওড়া আমি দেখে নেব।' জোশ ও গোস্বায় রূপসী রাজকুমারীর হৃদয়কাড়া আঁখিযুগল চিকচিক করে ওঠে।

সম্রাট জর্জির কন্যার উজ্জ্বল মুখপানে তাকিয়ে বললেন– 'আমার আদরের দুলালী, তোমার আবেগ ও সাহস প্রশংসার দাবিদার। আমি ভালোভাবেই জানি, তুমি একজন খ্রিস্টান নেতার কন্যা। তুমি মৃত্যুকে বরণ করে নেবে, তবু দাসত্বের লাঞ্ছনা মেনে নেবে না। কিন্তু, আমার আসল ভয়টা হচ্ছে, কথাটা জানাজানি হয়ে গেলে স্বজাতির মধ্যে কোনো গাদ্দার দাঁড়িয়ে যায় কি-না! আমাকে নিজ জাতির কোনো বিশ্বাসঘাতকের হাতে জীবন হারাতে হয় কি-না!'

ঃ আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আমি বেঁচে থাকতে এমনটি হতে দেব না। তা ছাড়া খ্রিস্টানরা কখনও এমন হীন কাজ করবে না।

ঃ তুমি জান না, মানুষ লোভে অন্ধ হয়ে বহু কিছু করতে পারে।

এমন সময়ে হঠাৎ যুদ্ধক্ষেত্রে হট্টগোল বেড়ে যায়। পিতা-কন্যা কথা বন্ধ করে সেদিকে তাকায়। দেখে, মুসলমানরা পা-পা করে পিছনে সরে যাচ্ছে আর খ্রিস্টানরা হট্টগোল করতে-করতে সম্মুখে অগ্রসর হচ্ছে। এই দৃশ্য দেখে জর্জির ও হেলেনের চেহারা আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। জর্জির বললেন– 'ঈসা আমাদের উপর কৃপা করেছেন যে, মুসলমানরা ভয়ে পিছপা হয়ে যাচ্ছে। আমাদের জয় সুনিশ্চিত।'

ঃ আব্বাজান সত্য বলেছেন। ঝাঁপিয়ে পড়ে মুসলমানদের নিশ্চিহ্ন করে ফেলার এখনই উপযুক্ত সময়। চলুন, আমরাও আক্রমণ করি। আমরা আক্রমণে অংশ নিলে খ্রিস্টানদের সাহস বেড়ে যাবে। তারা অতি অল্প সময়ের মধ্যে মুসলমানদের পিষে ফেলবে।

'ঠিক আছে, চলো।' বলেই জর্জির তার বাহিনীকে অগ্রসর হতে ইঙ্গিত করেন। সঙ্গে-সঙ্গে শাহী প্লাটুন প্রবল উদ্দীপনার সঙ্গে অগ্রসর হতে শুরু করে। সম্রাট জর্জির ও রাজকুমারী হেলেন সহাস্যমুখে এগোতে শুরু করেন।

আপন সম্রাট ও রাজকুমারীকে যুদ্ধক্ষেত্র অভিমুখে অগ্রসর হতে দেখে খ্রিস্টানদের মনোবল বেড়ে যায়। অনেকে গলাফাটা চিৎকার দিয়ে শ্লোগান তোলে– 'সম্রাট জর্জিরের জয় হোক।' ধ্বনি শুনে যুদ্ধরত খ্রিস্টানরা মোড় ঘুরিয়ে তাকায়। জর্জিরকে এগিয়ে আসতে দেখে তারা দ্বিগুণ উজ্জীবিত হয়ে ওঠে এবং পূর্বাপেক্ষা অধিক বীরত্বের সঙ্গে আক্রমণ চালায়।

মুসলমানরা এখনও পা-পা করে পিছু হটছে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, তারা পরাজিত হয়ে পলায়ন করছে। সূর্যটা মাথার উপর উঠে এসেছে। রোদের প্রখরতা আরও বেড়ে গেছে। ঝিরঝির বাতাস বইছে। মুসলমানরা পিছনে সরে যাচ্ছে আর খ্রিস্টানরা সম্মুখে অগ্রসর হচ্ছে। এমনকি তারা ইসলামী ক্যাম্পের

নিকটে পৌঁছে গেছে। এ-পর্যন্ত পিছিয়েই মুসলমানরা হঠাৎ শক্তপায়ে দাঁড়িয়ে যায় এবং জোরদার আক্রমণ শুরু করে। যে-খ্রিস্টানরা তাদের ধাওয়া করে-করে অগ্রসর হচ্ছিল, তারাও এগিয়ে-এগিয়ে আক্রমণ করতে থাকে। জর্জির এবং হেলেনও যথারীতি এগিয়ে আসছেন। হঠাৎ খ্রিস্টানরা ভুবনকাঁপানো 'আল্লাহ আকবার' ধ্বনি শুনতে পায়। তারা ঘাবড়ে গিয়ে ইসলামী বাহিনীর ক্যাম্পের দিকে তাকায়। দেখে, বহুসংখ্যক নতুন মুসলিম সৈন্য ঘোড়া হাঁকিয়ে তরবারি উঁচিয়ে রণাঙ্গনের দিকে ধেয়ে আসছে। দেখে খ্রিস্টানদের কলিজার পানি শুকিয়ে যায়, মনোবল ভেঙে যায়। এবার বুঝতে পারে, মুসলমানদের পিছপা হওয়া ছিল একটি কৌশল। সম্রাট জর্জির হতভম্ব ও বিচলিত হয়ে পড়েন।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর, হাসান ও হুসাইন রিজার্ভ সৈন্যদের নিয়ে ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে এসেছেন। রণাঙ্গনে অবতরণ করেই তারা খ্রিস্টানদের উপর তীব্রগতিতে আক্রমণ করেন। খ্রিস্টানরাও পালাবার জায়গা না-পেয়ে শক্তপায়ে দাঁড়িয়ে যায়।

একচল্লিশ.

সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত মাত্র বিশ হাজার মুজাহিদ সত্তর হাজার খ্রিস্টানের মোকাবেলা করছিল। শেষে তারা পরিকল্পিতভাবে পিছনে সরে আসে। তারা কৌশলটা এই অবলম্বন করে যে, এতে খ্রিস্টানরা নিজক্যাম্প থেকে দূরে চলে আসবে এবং মুসলমানরা পলায়ন করছে মনে করে বিন্যাস ও শৃঙ্খলা পরিত্যাগ করে তাদের ধাওয়া করবে। হয়েছেও তা-ই। খ্রিস্টান বাহিনী যখন মুসলমানদেরকে পিছপা হতে দেখে, তখন তারা মুসলমানদের পিছু নিয়ে ইসলামী ক্যাম্পের সন্নিকটে চলে যায়। যে-মুহূর্তে খ্রিস্টানরা ধরে নেয়, জয় তাদের সুনিশ্চিত, ঠিক তখন মুসলমানরা শক্তপায়ে দাঁড়িয়ে যায় এবং ক্যাম্প থেকে তাজাদম মুসলমানগণ আল্লাহ আকবার ধ্বনি তুলে বেরিয়ে এসে তীব্র গতিতে আক্রমণ চালায়। ইসলামের এই সিংহরা এমন বীরত্বের সঙ্গে আক্রমণ চালায় যে, খ্রিস্টানরা ঘাবড়ে যায়। শুধু সাধারণ সৈনিকরাই নয়– আফ্রিকান বাহিনীর অফিসার-কমান্ডাররাও দুশ্চিন্তায় পড়ে যায়। কিন্তু, যেহেতু এখনও তাদের সংখ্যা মুসলমানদের চেয়ে বেশি, তাই তারাও মোকাবেলায় দাঁড়িয়ে যায় এবং সাহসিকতার সঙ্গে লড়তে শুরু করে। তবে, এখন আর তাদের সেই আগ্রাসী শক্তি অবশিষ্ট নেই। এখন তারা আগ বাড়িয়ে আক্রমণ করছে না– মুসলমানদের আক্রমণ প্রতিহত করছে শুধু।

গোপন অবস্থান থেকে যে-ইসলামী বাহিনীটি বেরিয়ে এসেছিল, তাদের একটি ইউনিট হযরত হাসানের নেতৃত্ব ডান দিকে এবং একটি হযরত হুসাইনের নেতৃত্বে বাঁ দিকে দাঁড়িয়ে যায়। ইবনে যুবাইর সম্মুখ থেকে আক্রমণ করেন। মোটকথা, এই তরতাজা বাহিনীটি এদিক-ওদিক দাঁড়িয়ে গিয়ে খ্রিস্টানদের এমনভাবে ঘিরে ফেলে, যাতে তারা ইচ্ছে করলেও পালাতে না পারে।

এখন অত্যন্ত ঘোরতর যুদ্ধ চলছে। মুসলমানরা অতিশয় উদ্দীপনার সঙ্গে ছুটে-ছুটে আক্রমণ করছে। তাদের তরবারি প্রাণসংহারী বজ্রের ন্যায় শত্রুর উপর নিপতিত হচ্ছে এবং তাদের দেহসত্ত্বাকে জ্বালিয়ে ভস্ম করে দিচ্ছে। প্রতিজন মুসলিম সৈনিক রুদ্রমূর্তির রূপ ধারণ করে বিক্রমের সঙ্গে আক্রমণ করছে। খ্রিস্টানরাও যথাসাধ্য প্রতিরোধ করে যাচ্ছে। তাদের কমান্ডারগণ সৈনিকদের সাহস বাড়ানোর লক্ষ্যে দামামা বাজাচ্ছে ও গলা ফাটিয়ে চিৎকার করছে। আহতরা কোঁকাচ্ছে। ঘোড়াগুলো বিকট শব্দের রব তুলছে। সব মিলে তারা রণাঙ্গনটাকে কেয়ামতের মাঠ বানিয়ে ফেলেছে।

আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর সম্মুখ থেকে আক্রমণ করেছিলেন। আব্দুল্লাহ ইবনে সা'দও সামনেই ছিলেন। কিন্তু, রণাঙ্গনের পরিধি এত বিস্তৃত যে, দুজনের মাঝে বিস্তর ব্যবধান। উভয় ইসলামী সিংহ অত্যন্ত জোশ ও বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করছেন। তাদের বেপরোয়া তরবারিগুলো একের-পর-এক মস্তক বিচ্ছিন্ন করে চলছে। যে-শত্রুসেনাটি সামনে পড়ছে, তাকেই খণ্ডিত করে মাটিতে ফেলে দিচ্ছে।

সেনাপতি আব্দুল্লাহ ইবনে সা'দ গতযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেননি। সহযোদ্ধারা তাকে জোরপূর্বক তাঁবুতে বসিয়ে রেখেছিল। তাই আজ তিনি সেদিনকারও কাফফারা আদায় করছেন। অতিশয় উদ্দীপনা এবং অনুপম বিক্রমের সঙ্গে আক্রমণ করে শত্রুসেনাদের এক-এক করে যমের হাতে তুলে দিচ্ছেন। তিনি খ্রিস্টানদের এক-একটি দলের উপর আক্রমণ করছেন আর তাদের মধ্য থেকে দু-চারজনকে হত্যা করে ফেলছেন। আক্রমণ-প্রতিরোধে ব্যর্থ হয়ে অন্যরা এদিক-ওদিক ছড়িয়ে পড়লে আরেকটি দলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ছেন। এভাবে তিনি খ্রিস্টানদের কচুকাটা করে চলছেন।

আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর এখন তাঁর থেকে সামান্য দূরে। তিনিও পূর্ণ সাহস, দৃঢ়তা ও বীরত্বের সঙ্গে আক্রমণ করছেন। তিনি ঢাল ছাড়া শত্রুসেনাদের আক্রমণ প্রতিহত করে এমন জোরে তরবারির আঘাত হানছেন যে, তরবারি যার উপর পতিত হচ্ছে, তাকেই টুকরো-টুকরো করে ফেলছে। ঢাল ও শিরস্ত্রাণ

ভেঙে রক্তের ফোয়ারা বইয়ে তবেই ফিরে আসছে। তাঁর পিছনে তাঁর পাঁচশত জানবাজ সৈনিক, যারা তাঁরই মতো উদ্দীপনা, তাঁরই ন্যায় জোশ এবং তাঁরই অনুরূপ বীরত্বের সঙ্গে তাঁর সঙ্গে-সঙ্গে অগ্রসর হচ্ছে।

আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইরের দৃষ্টি রাজপতাকার উপর নিবদ্ধ। পতাকাটি যদিও তার থেকে বেশ দূরে, তবু তিনি দৃঢ় প্রত্যয় নিয়েছেন, পতাকা পর্যন্ত পৌছুবেনই। আর সেজন্যই তিনি মধ্যস্থিত সেনা-সারিগুলো ছিন্নভিন্ন করে শত্রুসেনাদের হত্যা করে-করে এগিয়ে যাচ্ছেন। ইবনে যুবাইর নিশ্চিত, রাজপতাকার তলে আফ্রিকার সম্রাট জর্জির অবস্থান করে থাকবেন। তিনি আরও জানেন, সম্রাজ জর্জির যতক্ষণ পর্যন্ত রণাঙ্গনে উপস্থিত থাকবেন, ততক্ষণ খ্রিস্টানসেনারা দৃঢ়পদে যুদ্ধ করে যাবে। তাই তিনি দ্রুততার সঙ্গে সেদিকে অগ্রসর হতে শুরু করেছেন। তবে খ্রিস্টানরাও মোমের পুতুল নয়। তারাও বীর এবং বীরের সন্তান। তারাও বীরত্বের সঙ্গে লড়ে যাচ্ছে, পায়ে-পায়ে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে।

রণাঙ্গনে হই-হুল্লাড়-হট্টগোল এখন তুঙ্গে। অত্যন্ত রক্ষক্ষয়ী লড়াই চলছে। খ্রিস্টানরা মুসলমানদের মাঝে এবং মুসলমানরা খ্রিস্টানদের মাঝে ঢুকে পড়েছে। উভয় পক্ষেরই বেশির ভাগ সারি তছনছ হয়ে গেছে। যুদ্ধ চলছে এখন এলোপাতাড়ি। তরবারি তার কর্তনকর্ম অব্যাহত রেখেছে। মানবমুন্ড কর্তিত হয়ে-হয়ে পড়ছে। মস্তকবিহীন ধড়গুলো ধপাস-ধপাস করে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে ছটফট করে-করে নিথর হয়ে যাচ্ছে। রক্তের ধারা প্রবাহিত হচ্ছে। রণাঙ্গনটা এখন কসাইখানার রূপ ধারণ করেছে।

সরোয়ার মাথায় কাফন বেঁধে রেখেছে। নিজ বাহিনীর সঙ্গে সে-ও বেজায় ব্যস্ত। তার অবস্থান বাম বাহুতে। লড়ছে প্রাণপণ। আক্রমণ চালাচ্ছে অত্যন্ত উদ্দীপনা ও বীরত্বের সঙ্গে। সামনে যে-শত্রুসেনাকে পাচ্ছে, তাকেই হত্যা করে ফেলছে। এতক্ষণে অগণিত খ্রিস্টানকে সে মৃত্যুর কোলে তুলে দিয়েছে। এখনও তাঁর বাহুর' শক্তি এতটুকু কমেনি। এখনও তার জিহাদের স্পৃহা সামান্যতম হ্রাস পায়নি। বরং তার শক্তি-সাহস ও স্পৃহা যেন উত্তরোত্তর বেড়ে চলছে। তার ইউনিটের সৈনিকরাও অত্যন্ত বীরত্ব, সাহসিকতা ও উদ্দীপনার সঙ্গে মারমার কাটকাট করে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। তারা তার সঙ্গেই আছে। আপন কমান্ডারের মতো তারাও বীরত্বের প্রমাণ দিয়ে ফিরছে।

ইবনে ওমর ও ইবনে আব্বাস দুজনে পাশাপাশি অবস্থান করছেন। তাঁরা অতিশয় বীরত্বের সঙ্গে লড়ে যাচ্ছেন। তাদের তারবারিও শত্রুসেনাদের জীবন হরণ করে চলছে। এ-যাবত তারাও বহু খ্রিস্টানকে হত্যা করে ফেলেছেন।

এক দিক থেকে হযরত হাসান এবং অপর এক দিক থেকে হযরত হুসাইন (রা.) আক্রমণ করেছিলেন। আল্লাহর সিংহ হযরত আলী মুরতাজার এই পুত্রদ্বয় এমন বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করছেন যে, তাদের ধারালো তরবারি সামনে যাকে পাচ্ছে, তাকেই হত্যা করে ফেলছে। তারা এবং তাদের ইউনিটের সৈন্যরা ইতিমধ্যে বহুসংখ্যক শত্রুসেনাকে হত্যা করেছেন। তারা ডান ও বাম দিক থেকে খ্রিস্টানদের কোণঠাসা করতে-করতে এগিয়ে চলছেন।

সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়েছে। যুদ্ধ এখন পূর্ণ যৌবনে উপনীত হয়েছে। উভয়পক্ষই প্রাণপাত লড়াই করছে। খ্রিস্টানদের প্রত্যয়, তারা মুসলমানদের নিশ্চিহ্ন করে ফেলবে। আর মুসলমানদের দৃঢ়প্রতিজ্ঞা, তারা খ্রিস্টানদের নিপাত না-করে ক্ষান্ত হবে না। ইতিমধ্যে বিপুলসংখ্যক খ্রিস্টানসেনা মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে। তবু, এখনও তারা মুসলমানদের অপেক্ষা অনেক বেশি। আর সেই সংখ্যাধিক্যের উপর নির্ভর করেই তারা এখনও বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করছে। যদিও তাদের প্রতিটি সারি ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে, তবু তারা বিক্ষিপ্ত হয়েও এলোপাতাড়ি যুদ্ধ অব্যাহত রেখেছে। তাদের তরবারিও কর্তন করছে। কিছু-কিছু মুসলমানও শহীদ হচ্ছে। কিন্তু, ইসলামের বীর শার্দূলরা শত্রুর আধিক্য ও নিজেদের স্বল্পতার পরোয়া না-করে মহান আল্লাহর উপর ভরসা করে যারপরনাই বীরত্বের সঙ্গে লড়ে যাচ্ছে। তারা যত শীঘ্র সম্ভব খ্রিস্টানদের নিপাত ঘটানোর লক্ষ্যে অতিশয় উদ্দীপনা ও বীরত্বের সঙ্গে আক্রমণ চালাচ্ছে।

খ্রিস্টান বাহিনীতে এখন সানাইয়ের বাজনা বন্ধ হয়ে গেছে। কারণ, এখন সকল খ্রিস্টান যুদ্ধে লিপ্ত। বাজনা বাজানোর ফুরসত কারুর নেই। কিন্তু হট্টগোল এখন আগের চেয়েও বেশি বেড়ে গেছে। প্রতিজন খ্রিস্টান পূর্ণ শক্তিতে চিৎকার করছে। আহতরা কাতরাচ্ছে। মুমূর্ষুরা আর্তচিৎকার করে-করে জীবনের শেষ মুহূর্তটি অতিক্রম করছে। কিন্তু, যারা যুদ্ধ করছে, এ-সবের প্রতি তাদের কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। তারা লড়ছে আর মরছে। তরবারিগুলো এতই দক্ষতা ও পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করছে যে, কারুরই জীবন নিরাপদ মনে হচ্ছে না। নানাভাবে নিরাপত্তা বিধান করা সত্ত্বেও কোনো-না-কোনো দিক থেকে কারও-না-কারও তরবারি এসে মাথাটা কেটে ফেলছে।

আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাজপতাকার দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। বহু সারি ছিন্নভিন্ন করে পথ পরিষ্কার করে-করে তিনি রাজ-সেনা-ইউনিটের কাছাকাছি পৌঁছে গেছেন। সৌভাগ্যবশত সর্বপ্রথম মারকুস তার সামনে পড়ে যান। তিনি অত্যন্ত বীরত্বের সঙ্গে তার উপর আক্রমণ করেন। মারকুস সাধারণ সৈনিক

নন– বাহিনীর সেনাপতি। অতিশয় বীরযোদ্ধা ও নিপুণ রণকৌশলী। তিনি বেশ দক্ষতার সঙ্গে আক্রমণ প্রতিহত করে নিজে পালটা আক্রমণ চালান।

দুই সুভিজ্ঞ সেনানীর লড়াই চলছে। উপভোগ করার মতো দৃশ্য। তাদের চারপার্শ্বের খ্রিস্টান ও মুসলিম সৈনিকরা যুদ্ধ বন্ধ করে তাদের যুদ্ধ দেখতে শুরু করে। দুজনে দীর্ঘ সময় আপন-আপন নৈপুণ্য ও যোগ্যতা প্রদর্শন করতে থাকেন। এখনও তারা লড়াই করছেন। সরোয়ারের বাহিনীর এক সৈনিক বলল– 'কমান্ডার, দাঁড়িয়ে থাকছি কেন? শত্রুটাকে বধ করে ফেলি না কেন?'

শোনামাত্র সরোয়ারের মনে উত্তেজনা জেগে ওঠে। সে অত্যন্ত বীরত্ব ও উদ্দীপনার সঙ্গে মারকুসের উপর আঘাত হানে। মারকুস পালটা আঘাত করেন। কিন্তু, সরোয়ারের তরবারি মারকুসের তরবারি কেটে তার মাথায় গিয়ে আঘাত হানে। মারকুসের ভাঙা তরবারি আর কর্তিত মাথা ছিটকে একসঙ্গে মাটিতে নিক্ষিপ্ত হয়। দৃশ্যটা দেখে মুসলমানরা উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। তারা আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে আল্লাহু আকবার ধ্বনি তুলে খ্রিস্টানদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। সরোয়ারও আক্রমণে তাদের সঙ্গে যোগ দেয়। ওদিকে ইবনে যুবাইর রাজসেনাদের হত্যা করে করে-করে জর্জিরের দিকে এগিয়ে যেতে থাকেন।

সম্রাট জর্জির ও রাজকুমারী হেলেন দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে যুদ্ধের ডামাডোল দেখছেন। মুসলমানরা যতই তাদের নিকটে যাচ্ছে, ততই তাদের চেহারার রং ফ্যাকাশে হয়ে যাচ্ছে। রাজকুমারী হেলেনের নিকট তার বান্ধবী লুসিয়াও দাঁড়িয়ে আছে। তার অবস্থা অবর্ণনীয়। যেন গায়ে এক ফোঁটাও রক্ত নেই; সব পানি হয়ে গেছে। মেয়েটি থরথর করে কাঁপছে।

ইবনে যুবাইর রাজসেনাদের পরাস্ত করে জর্জিরের সম্মুখে পৌছে যান এবং দূর থেকেই হুংকার ছাড়েন– 'ওহে আফ্রিকার দাম্ভিক শাসক, সাহস থাকে তো বীরের ন্যায় মোকাবেলা করো।'

জর্জির বীর সৈনিকই বটে। তিনি তরবারি উত্তোলন করে ঝট করে ইবনে যুবাইরের উপর আক্রমণ করেন। ইবনে যুবাইর ঢাল দ্বারা আক্রমণ প্রতিহত করে পূর্ণশক্তিতে নিজেও আঘাত হানেন। ইবনে যুবাইরের রক্তমাখা তরবারি দেখে জর্জির কেঁপে ওঠেন। ভয়ে তার মনটা ছোট হয়ে যায়। হাতের শক্তি হারিয়ে যায়। ইবনে যুবাইয়ের আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য ঢালটা উত্তোলন করতে ব্যর্থ হন। ইবনে যুবাইরের তরবারি তার কাঁধে আঘাত হানে। সোনা-রুপার কারুকার্যখচিত বর্ম ছেদ করে তরবারিটা ঢুকে যায় অনেকখানি। কাঁধটা

কেটে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় দেহ থেকে। তরবারি সরিয়ে এনে আবারও আঘাত হানেন ইবনে যুবাইর। আহ্ বলে একটা চিৎকার দেওয়ারও সুযোগ মিলল না জর্জিরের। মাথাটা কেটে পড়ে গেল মাটিতে। ধড়টা ঘোড়ার পিঠ থেকে নিচে গড়িয়ে পড়ে তড়পাতে লাগল।

দাম্ভিক ও অহংকারী সম্রাটের স্পেশাল বাহিনীর সৈন্যরা হা করে তাকিয়ে আছে শুধু। একজন সৈনিকও তার সাহায্যার্থে এগিয়ে আসবার সাহস পেল না। এই হৃদয়বিদারক দৃশ্য দেখে রাজকুমারী হেলেন কেঁপে ওঠে। তার বুকে পিতৃস্নেহ উথলে ওঠে। শোকে-দুঃখে-বেদনায় তার কলজেটা ছিঁড়ে যায়। রাগে-ক্ষোভে ফেটে পড়ে। দুচোখ থেকে যেন আগুনের হলকা ঠিক্‌রে পড়ছে। খানিক দাঁড়িয়ে থেকে হেলেন হঠাৎ করে তরবারিটা উঁচিয়ে ধরে। ঘোড়াটা খানিক এগিয়ে নিয়ে ইবনে যুবাইরের নিকটে পৌঁছে পূর্ণশক্তিতে আঘাত হানতে উদ্যত হয়। ইবনে যুবাইরের চোখ ছিল অন্য দিকে। হঠাৎ কী যেন ভেবে এদিকে মোড় ঘোড়ান। অমনি কাউকে তার উপর আক্রমণোদ্যত দেখতে পান। আক্রমণকারী রাজবাহিনীর কোনো সৈনিক হবে ভেবে তিনি ঢালটা সামনে মেলে ধরে তরবারি উত্তোলন করেন। কিন্তু, যখন দেখতে পান আক্রমণকারী কোনো পুরুষ সৈনিক নয়– নিহত জর্জিরের কন্যা হেলেন, সঙ্গে-সঙ্গে তিনি তরবারিটা নামিয়ে ফেলে বললেন– 'আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইরের তরবারি কোনো নারীর উপর উত্তোলিত হতে পারে না।'

রাজকুমারীর দৃষ্টি ইবনে যুবাইরের মুখের উপর নিবদ্ধ। ইবনে যুবাইরের আচরণ ও বক্তব্যে তার ক্রোধ ঠান্ডা হয়ে যায়। সে-ও তার উত্তোলিত তরবারিটা নামিয়ে ফেলে। কয়েক মুহূর্ত ইবনে যুবাইরের মুখপানে নীরবে তাকিয়ে থেকে বেদনার্তকণ্ঠে বলল– 'নির্দয় জল্লাদ, এ তুমি কী করলে? আমার মাথার উপর থেকে আমার স্নেহশীল পিতার ছায়াটা কেন সরিয়ে দিলে?'

ইবনে যুবাইর এ-প্রশ্নের কী উত্তর দেবেন! তিনি মাথাটা নত করে নীরব হয়ে গেলেন। রাজকুমারী হেলেনের আঁখিযুগল থেকে অশ্রুর ধারা বইতে শুরু করে। ইবনে যুবাইর মাথা তুলে পুনরায় রাজকুমারী হেলেনের প্রতি তাকান। হেলেন কাঁদছে। দুচোখ বেয়ে দরদর করে অশ্রু ঝরছে। মেয়েটি নিষ্পলকচোখে অনাথ অসহায়ের মতো তার প্রতি তাকিয়ে আছে। হেলেনের কান্না দেখে ইবনে যুবাইরের হৃদয় গলে যায়। কিন্তু, মেয়েটিকে তিনি কী বলে সান্ত্বনা দিবেন? তাই কোনো কথা না-বলে চুপচাপ মোড় ঘুরিয়ে স্থান ত্যাগ করে আবার যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়েন।

বিয়াল্লিশ.

আফ্রিকার সম্রাট জর্জির যুদ্ধে নিহত হয়েছেন। মারা গেছেন তার সেনাপতি মারকুসও। মুহূর্তমধ্যে সংবাদটা খ্রিস্টান সৈন্যদের মাঝে দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে। সংবাদ শোনামাত্র খ্রিস্টানদের মনোবল উবে যায়। তারা যুদ্ধ করার সাহস হারিয়ে পালাবার পথ খুঁজতে শুরু করে।

এদিকে মুসলমানরা জোরদার আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে। তীব্র আক্রমণে তারা খ্রিস্টানদের অবশিষ্ট শক্তিটুকুও নিঃশেষ করে দেয়। খ্রিস্টানরা পালাতে শুরু করে। যেইমাত্র মুসলমানরা দেখল খ্রিস্টানরা পালাচ্ছে, তারা আল্লাহু আকবার ধ্বনি তুলে তাদের ধাওয়া করতে শুরু করে। এখনকার অবস্থা হচ্ছে, খ্রিস্টানরা ঊর্ধ্বশ্বাসে পালাচ্ছে আর মুসলমানরা ধাওয়া করে-করে তাদের হত্যা করছে। চতুর্দিকে এবং দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত এ-দৃশ্যই পরিলক্ষিত হচ্ছে। হই-হট্টগোল এত তীব্র আকার ধারণ করেছে যে, কারও একটি শব্দও বোঝা যাচ্ছে না। কান ফেটে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে।

সরোয়ার যেইমাত্র দেখল খ্রিস্টানরা পালাচ্ছে, সঙ্গে-সঙ্গে সে নিজ বাহিনীটিকে খ্রিস্টানদের ক্যাম্পের দিকে এগিয়ে যেতে নির্দেশ দেয়। নিজে পলায়মান শত্রুসেনাদের হত্যা করে-করে এগিয়ে চলে। পথে যত খ্রিস্টানদের সাক্ষাৎ পায়, সব কজনকে লাশে পরিণত করে ক্যাম্পে পৌছে যায়। খ্রিস্টানক্যাম্পে পৌছে সরোয়ার দেখতে পায়, রাজকুমারী হেলেনের সঙ্গে যে-রূপসী মেয়েরা এসেছিল, তারা রাজকীয় মূল্যবান সব জিনিসপত্র লুট করে ঘোড়ায় চড়ে পালাবার প্রস্তুতি নিচ্ছে। সরোয়ার তার বাহিনীকে ক্যাম্পের চারদিকে ছড়িয়ে দেয় এবং ঘোষণা করে, একজন পুরুষ কিংবা নারী কেউ পালাতে চেষ্টা করো না; অন্যথায় তাকে করুণ পরিণতি বরণ করতে হবে।

এখনও ক্যাম্পে হাজার-হাজার গোলাম অবস্থান করছে। তারা তাদের বাহিনীর মালামাল লুট করে পোটলা বেঁধে নিয়ে পালাবার চেষ্টা করছে। কিন্তু, এই বিশ্বাসঘাতক খ্রিস্টান নারী-পুরুষরা যখন মুসলিম শার্দূলদের দেখল এবং তাদের ঘোষণা শুনল, তখন তাদের সব পরিকল্পনা ভন্ডুল হয়ে গেল। তারা ভগ্নহৃদয় ও দুঃখভারাক্রান্ত মনে মূল্যবান সম্পদ বোঝাই বোচকা-বাচকি রেখে ঘোড়া থেকে নেমে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে এবং হতাশাভরা মলিনমুখে পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে শুরু করে। বিশেষ করে সুন্দীর তরুণীরা বেশি সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। তাদের চেহারার রক্ত শুকিয়ে গেছে। রূপ-লাবণ্য সজীবতা হারিয়ে ফ্যাকাশে হয়ে গেছে।তারা একধারে দাঁড়িয়ে থরথর করে কাঁপছে। তারা

জানে, যুদ্ধে বিজয়ী জাতি বিজিত জাতিকে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন করে ফেলে। নারীদের সম্ভ্রম ছিন্নভিন্ন হওয়া তো সুনিশ্চিত ও সাধারণ ব্যাপার। ভয়ে মেয়েগুলো একেবারে কাঠ হয়ে গেছে।

কিন্তু, তারা জানে না, মুসলমানের চরিত্র অন্যসব জাতির মতো নয়। তারা জানে না, মুসলমান কখনও মানুষের সঙ্গে অন্যায়, হিংস্র ও নির্মম আচরণ করে না। তারা জানে না, মুসলমান নারীর সম্ভ্রম রক্ষা করাকে তাদের ঈমানী কর্তব্য মনে করে এবং এর জন্য তারা প্রয়োজনে নিজেদের জীবন বিলিয়ে দিতেও কুণ্ঠিত হয় না। তারা জানে না, মুসলমানের তরবারি নারীর উপর উত্তোলিত হয় না। মুসলমান সেই সত্ত্বাকে ভয় করে চলে, যিনি সব সময় সব কিছু দেখেন। তাদের বিশ্বাস, মৃত্যুর পর মহান আল্লাহর সম্মুখে দাঁড়িয়ে জীবনের সকল কাজের জন্য জবাবদিহি করতে হবে। কাজেই যে-জাতি মহান আল্লাহকে ভয় করে, কীভাবে তারা অন্যের উপর জুলুম করতে পারে? তবে হ্যাঁ, যে-জাতি আল্লাহকে বিশ্বাস করে না, কিংবা দীন-ধর্মকে তামাশার বস্তু মনে করে, দুনিয়ার জীবনকেই সব কিছু জ্ঞান করে; কেবল তাদের পক্ষেই যা খুশি করা সম্ভব। এমন জাতির নীতি-নৈতিকতা ও আদর্শ-চরিত্র বলতে কিছুই থাকে না।

যা হোক, সরোয়ার খ্রিস্টান বাহিনীর ক্যাম্পটিকে অবরোধ করে তাকে নিরাপদ করে ফেলে। রাজকুমারী হেলেন চিন্তাক্লিষ্ট ও বেদনাবিধুর মুখে এখনও সেই স্থানটিতেই দাঁড়িয়ে আছে, যেখানে তার পিতা নিহত হয়েছেন। বেদনাহত রাজকুমারীর দুচোখ বেয়ে অশ্রু ঝরছে। চিন্তার সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছে মেয়েটি। কোনো ভাবনাই তাকে কূল দেখাতে পারছে না। শরীরের সবটুকু শক্তি যেন হঠাৎ উড়ে গেছে। বাহিনী পরাজিত। সম্রাট পিতা নিহত। দেশ সংকটাপন্ন। সম্মুখে অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু, তবু এখনও তাকে রূপসী এবং নিষ্পাপ বলেই মনে হচ্ছে। এখনও তার চেহারা চাঁদের মতো আলো বিচ্ছুরণ করছে।

হেলেন বেদনার একটা পাহাড় মাথায় নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এমন সময় তার বান্ধবী লুসিয়া এসে পার্শ্বে দাঁড়িয়ে ক্ষীণকণ্ঠে বলল— 'রাজকুমারীজি, আপনি ধৈর্যধারণ করুন।'

হেলেন বেদনামাখা গম্ভীরমুখে লুসিয়ার প্রতি তাকায়। হৃদয়টা তার খাঁ-খাঁ করে ওঠে। পরক্ষণেই অঝোরে কাঁদতে শুরু করে। কিছুক্ষণ পর কান্নাজড়িত কণ্ঠেই বলে— 'ধৈর্য ধরব লুসিয়া? আমার সুখের বাগানটা উজাড় হয়ে গেছে। স্নেহশীল পিতা মারা গেছেন। আহ, মুহূর্তমধ্যে কী হয়ে গেল!'

লুসিয়া রাজকুমারীকে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করে– 'এখন ধৈর্যধারণ ব্যতীত আপনার উপায়ই বা আছে কী রাজকুমারীজি! দেখুন, হতভাগা মুসলমানরা খ্রিস্টানদের ধাওয়া করে ফিরছে। এখন ধারে-কাছে কেউ নেই। পালানোর সুযোগ আছে। আসুন, আমরা এখান থেকে পালিয়ে যাই।'

হেলেন অশ্রুসিক্ত আঁখিযুগল তুলে লুসিয়ার মুখপানে তাকিয়ে ভাবলেশহীন কণ্ঠে বলল– 'পালিয়ে যাব কোথায়? কোথায় গিয়ে আশ্রয় নেব? সুখ-আনন্দের সঙ্গে আমার স্বাধীনতাটাও তো শেষ হয়ে গেল লুসিয়া!'

ঃ না, এখনও সুযোগ আছে। সুযোগটা হাতছাড়া করবেন না প্রিন্স। সাবতিলা দূরে নয়। আমরা ওখানে সহজেই পৌঁছে যেতে পারব।

ঃ আমি যাব না; তুমি যেতে চাইলে যাও।

লুসিয়া বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাস করে–'কেন যাবেন না?'

ঃ কারণ, যারা আমার পিতাকে হত্যা করেছে, তারা আমাকেও মেরে ফেলবে।

ঃ এমন কথা বলবেন না রাজকুমারী! সাবতিলার মুকুট আপনার মাথায় উঠবে। সমগ্র জাতির মস্তক আপনার পায়ে অবনত হবে। আপনি দেশের রানী হবেন।

হেলেন শীতল নিঃশ্বাস ছেড়ে বলল– 'এখন আর আমার কোনো বাসনা নেই।'

ঃ আপনার না থাকতে পারে, আফ্রিকার গণমানুষের তো আছে।

ঃ আমি এমন কাপুরুষ খ্রিস্টানদের আর মুখ দেখতে চাই না, যারা আপন রাজার লাশ আর রাজকুমারীকে শত্রুর মাঝে একাকি ফেলে পালিয়ে গেছে!

ঃ কিন্তু, এখানে দাঁড়িয়ে থাকলে তো মুসলমানরা আপনাকে গ্রেফতার করে দাসী বানিয়ে ফেলবে। অনিন্দ্যসুন্দরী রাজকুমারী হয়ে আপনাকে মুসলমানদের দাসত্ব বরণ করে জীবন কাটাতে হবে। আপনার মতো ব্যক্তিত্বের জন্য এ কত বড় অসম্মান, ভেবে দেখবেন না!

ঃ নিয়তিতে লেখা থাকলে মুসলমানদের দাসী আমাকে হতেই হবে। কোনো চেষ্টা-কৌশল, কোনো শক্তি আমার এই লিখন খণ্ডাতে পারবে না।

ঃ কিন্তু আপনি মুসলমানদের জানেন না। ওরা অত্যন্ত রক্তপিপাসু, হিংস্র ও নির্দয় জাতি। আপনি চাঁদ–পৃথিবীর রূপের চাঁদ। ওরা আপনার সম্ভ্রম তছনছ করে ফেলবে।

হেলেন উত্তেজিত হয়ে ওঠে। তার চেহারাটা লাল হয়ে যায়। রাগে-ক্ষোভে দুচোখ থেকে আগুন ঠিকরে পড়তে শুরু করে। দাঁতে দাঁত চেপে কঠিন গলায় বলল– 'তা-ই যদি করে, তা হলে এই খঞ্জর...।' হেলেন থেমে দাঁত কড়মড় করতে-করতে কোমর থেকে একটা খঞ্জর বের করে লুসিয়াকে দেখিয়ে বলল–

'এটি এক-দুজন মুসলমানের পেটে বিদ্ধ হয়ে আমার বুকে গেঁথে যাবে। তুমি জান না লুসিয়া, আমি আফ্রিকার সম্রাট জর্জিরের কন্যা। আব্বাজান দেশ ও জাতির জন্য জীবন দান করেছেন। নিজের সম্ভ্রম রক্ষার জন্য আমিও আমার জীবন বিলিয়ে দেব। প্রাণ থাকতে কোনো হায়েনা আমার সম্ভ্রম লুট করতে পারবে না।'

ঃ কিন্তু, তাতে আপনার কী লাভ হবে রাজকুমারী!

ঃ আমি আব্বাজানের লাশ ফেলে যাব না।

ঃ তা হলে আসুন, মহারাজের লাশটাও তুলে নিয়ে যাই।

ঃ সম্ভব হবে না। মুসলমানরা সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে। কীভাবে যাব? কোন পথে যাব?

ঃ আসুন না, চেষ্টা করে দেখি।

ঃ লাভ নেই। কোনো ফল হবে না।

লুসিয়া খানিক কী যেন ভাবে। তারপর বলল– 'আপনি জিদ ধরবেন না রাজকুমারী, আসুন, যিশুর দোহাই দিয়ে বলছি, আসুন আমরা পালিয়ে যাই।'

হেলেন লুসিয়ার প্রতি তাকিয়ে বলল– 'আমি যাব না লুসিয়া, ইচ্ছে হলে তুমি যাও।'

ঃ আপনাকে একাকি ফেলে রেখে?

ঃ আমার সঙ্গে থেকে নিজের জীবনটা ধ্বংস করো না।

ঃ আমি আপনার নিমকখোর। পরিণতি যা হবে হোক, আমি আপনার সঙ্গেই থাকব। আপনি যেখানে যাবেন, আমিও সেখানেই যাব। মৃত্যু ছাড়া অন্য কিছু আমাকে আপনার থেকে আলাদা করতে পারবে না।

ঃ তা হলে আমি তোমাকে কৃতজ্ঞতা জানাব লুসিয়া।

এমন সময় সালওয়ানুস একদল অশ্বারোহী সেনা নিয়ে ওখানে গিয়ে পৌঁছে। রাজকুমারীকে দেখামাত্র তার চেহারা আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। নিকটে এসে মমতার সঙ্গে রাজকুমারীকে সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানিয়ে বলল– 'ঈসা মসীহর অপার অনুগ্রহ যে, আমি আপনাকে অক্ষত ও নিরাপদ পেয়েছি। আসুন, আমি আপনাকে নিরাপদে সাবতিলা পৌঁছিয়ে দিই।'

হেলেন সরল-সোজা মেয়ের মতো লাজুকচোখে প্রেমপাগল সালওয়ানুসের প্রতি তাকিয়ে বলল– 'আমি তোমাকে ধন্যবাদ জানাই সালওয়ানুস! কিন্তু, আমি যাব না। তুমি চলে যাও। ওদিকে মুসলমানরা নেই। সুযোগটাকে কাজে লাগিয়ে চুপচাপ এখান থেকে বেরিয়ে যাও।'

সালওয়ানুস হেলেনের গোলাপি গণ্ডদেশের উপর চোখ নিবদ্ধ করে বলল– 'কিন্তু রাজকুমারী, এই সেবক আপনার সন্ধানে হন্যে হয়ে ঘুরে ফিরছিল।

পর্যন্ত এসে পৌঁছুতে আমাকে জীবনের ঝুঁকি বরণ করতে হয়েছে। হঠাকারিতা পরিহার করে আপনি চলুন।'

ঃ না, আমি যাব না সালওয়ানুস, আমি আবারও তোমাকে কৃতজ্ঞতা জানাই। তুমি যাও এবং মুসলমানদের নাগাল থেকে বেরিয়ে যাও।

ঃ কিন্তু, আমি যে আপনাকে ছাড়া যেতে পারি না!

ঃ এই হঠকারিতা পরিত্যাগ করো; তুমি চলে যাও।

ঃ রাজকুমারী, আপনি জানেন না, আপনার প্রতি আমার ভালবাসা কতখানি।

'ভালবাসা?' বলেই হেলেন বিস্ময়মাখা দৃষ্টিতে সালওয়ানুসের প্রতি তাকায়।

সালওয়ানুস গম্ভীরমুখে বলল– 'হ্যাঁ, আমি আপনাকে মনে-প্রাণে ভালবাসি। বিশ্বাস না-হলে আপনার বান্ধবী লুসিয়াকে জিজ্ঞেস করুন।'

ঃ ওসব মন থেকে ঝেড়ে ফেলো। আমি আফ্রিকার সম্রাটের কন্যা। আমার শিরায় শাহী রক্ত প্রবাহমান। আমি তোমার হতে পারি না।

ঃ কিন্তু, মহারাজ যে ঘোষণা দিয়েছিলেন...।

ঃ আফসোস, তুমি কাজ করে দেখাতে পারনি। যদি সক্ষম হতে, তা হলে সে ভিন্ন কথা ছিল।

ঃ কিন্তু রাজকুমারী, আমি আপনাকে অর্জন করার সংকল্প গ্রহণ করেছি। এখন আপনি আমার মুঠোয় চলে এসেছেন। তাই আমি আপনাকে ছেড়ে যাব না। খুশিমনে না যাবেন, তো জোর করে হলেও নিয়ে যাব।

সালওয়ানুসের এই ঔদ্ধত্যপূর্ণ বক্তব্যে রাজকুমারী ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। রাগে চোখ-মুখ লাল হয়ে যায়। দুচোখ থেকে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হতে শুরু করে। কঠিন গলায় বলে ওঠে– 'নরাধম! অসভ্য! এই বুঝি তোর পরিকল্পনা!'

সালওয়ানুসের মেজাজও গরম হয়ে যায়। কঠোর ভাষায় বলল– 'হেলেন, ভুলে যাও তুমি রাজকুমারী ছিলে। তোমার পিতা মারা গেছেন। রাজত্ব তোমাদের হাতছাড়া হতে চলেছে। এখন তুমি একটি সাধারণ অনাথ মেয়ে বই নও। এই মুহূর্তে তুমি আমার কব্জায়। আমি তোমাকে ভয় করি না। স্বেচ্ছায় না যাবে, তো আমি তোমাকে ধরে জোর করে যাব। এতক্ষণ তো আমার ইচ্ছে ছিল, তোমাকে গির্জায় নিয়ে যথারীতি বিবাহ করব। এখন বলছি, আমি তোমাকে গণিকা বানাব।'

রাগে হেলেনের গোলাপি চেহারাটা লাল হয়ে গেছে। সে কোষ থেকে তরবারিটা বের করে হাতে নেয়। হুংকার ছেড়ে বলে– 'অজাত, অসভ্য কোথাকার! মুখ সামলে কথা বলবি বলে দিচ্ছি। অন্যথায় এই তরবারি তোর বুকে গেঁথে যাবে।'

সালওয়ানুস অবজ্ঞার সঙ্গে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে। বলল– 'আচ্ছা, এখনই দেমাগটা ঠিক করে দিচ্ছি।' বলেই সে তার সৈন্যদের ইঙ্গিত করে। তারা রাজকুমারীকে গ্রেফতার করার জন্য এগিয়ে আসে। দেখে রাজকুমারী কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে। তার চেহারায় হতাশার ছাপ ফুটে হয়ে ওঠে। অসহায়া রাজকুমারী অস্থিরচোখে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। মুসলমানরা তার থেকে এত দূরে খ্রিস্টানদের ধাওয়া করে ফিরছে যে, গলা ফাটিয়ে চিৎকার করেও সে-পর্যন্ত শব্দ পৌছানো সম্ভব নয়। সে বুঝে ফেলে, আর নিস্তার নেই। সালওয়ানুস তাকে গ্রেফতার করে তুলে নিয়েই যাবে। তাই সে-ও সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে, দু-চারটি দুর্বৃত্তকে হত্যা করেই তবে যাব।

সালওয়ানুসের সৈন্যরা এখনও তার নিকটে এসে পৌছয়নি। এমন সময় সে কতগুলো ধাবমান ঘোড়ার ক্ষুরধ্বনি শুনতে পায়। হেলেন মোড় ঘুরিয়ে দেখে, তার পিছন দিক থেকে অন্য একদল খ্রিস্টানসৈন্য এগিয়ে আসছে। দেখতে-না-দেখতে বাহিনীটি নিকটে চলে আসে। সকলের সম্মুখে যাবিলার পরাজিত শাসক আরসানুস। এসেই সে হুংকার ছেড়ে বলল– 'সাবধান! রাজকুমারীর প্রতি হাত বাড়ালে পরিণতি ভালো হবে না।'

রাজকুমারী কিছুই বুঝতে পারছে না। এর আবার উদ্দেশ্য কী? সে ফ্যালফ্যালচোখে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে শুধু। সালওয়ানুস ক্ষোভে ফেটে পড়ে। সে বুঝে ফেলে, আরসানুস রাজকুমারীকে উদ্ধার করতে এসেছে। সফল হলে তার তো সব মাটি হয়ে যাবে। তাই চিৎকার করে সঙ্গীদের বলল– 'আমার বীর সৈনিকগণ, এই বিশ্বাসঘাতক দলটিকে টুকরো-টুকরো করে ফেলো। আক্রমণ করো। এরা স্বজাতির সঙ্গে গাদ্দারি করে মুসলমানদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে।'

আদেশ পাওয়ামাত্র সৈনিকরা একযোগে আরসানুস ও তার বাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। সালওয়ানুস নিজেও যুদ্ধে লিপ্ত হয়। দুটি ক্ষুদ্র খ্রিস্টান সেনাদল পরস্পর যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে।

তেতাল্লিশ.

যে-মুহূর্তে মুসলমানরা খ্রিস্টানদের তাড়া করে-করে হত্যা ও গ্রেফতার করছে, যে-সময়ে সরোয়ার খ্রিস্টানদের ক্যাম্পের উপর প্রহরা বসিয়ে দাস-দাসীদের লুটতরাজ প্রতিহত করছে, ঠিক এমনই এক মুহূর্তে খ্রিস্টানদের দুটি দল পরস্পর সংঘাতে জড়িয়ে পড়েছে।

সালওয়ানুস ও আরসানুস আপন-আপন সৈনিকদের হুংকার দিয়ে উত্তেজিত করে তুলছে এবং তাদের অনুগত সৈনিকরা উজ্জীবিত হয়ে বীরত্বের সঙ্গে প্রতিপক্ষের উপর আঘাতের-পর-আঘাত হানছে। সালওয়ানুস-আরসানুসও যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছে। রাজকুমারী হেলেন ও লুসিয়া একধারে দাঁড়িয়ে এই যুদ্ধের তামাশা প্রত্যক্ষ করছে। উভয়েই ভালো করে জানে, এই যুদ্ধ রাজকুমারীকে কেন্দ্র করে হচ্ছে। সালওয়ানুস ও আরসানুস দুজনই রূপসী রাজকুমারী হেলেনের প্রেমে মাতোয়ারা। উভয়ই তাকে অর্জন করতে যুদ্ধ করছে। লুসিয়া ও হেলেন পাশাপাশি দাঁড়ানো। লুসিয়া মুখটা হেলেনের কানের কাছে নিয়ে ফিসফিস করে বলল– আমার কথা শুনলেন না রাজকুমারী! দেখলেন তো এখন কী বিপদ নেমে এল! ঈসা মসীহ আপনাকে জীবন-সম্ভ্রম রক্ষার সুযোগ করে দিয়েছিলেন; কিন্তু আপনি সেই সুযোগ পায়ে ঠেলে সরিয়ে দিলেন!

হেলেন দৃঢ়তার সঙ্গে উত্তর দেয়– 'না লুসিয়া, আমি এখান থেকে যেতে পারি না।'

লুসিয়া তার বিস্মিত চোখ দুটো হেলেনের উজ্জ্বল চেহারার উপর নিবদ্ধ করে বিস্ময়মাখা কণ্ঠে বলল– 'কেন যেতে পারেন না?'

ঃ অপেক্ষা করো, কারণটা জানতে পারবে।

ঃ আপনি বোধহয় জানেন না, আরসানুসও আপনার প্রত্যাশী।

ঃ আমি জানি। সে মহারাজের নিকট প্রস্তাবও প্রেরণ করেছিল।

ঃ তার মানে আপনি আরসানুসের সঙ্গে যেতে সম্মত আছেন?

ঃ না লুসিয়া, আমি কারও সঙ্গেই যেতে চাই না।

ঃ কিন্তু বিবদমান দুজনের যে জয়ী হবে, সে তো আপনাকে তুলে নেয়ার চেষ্টা করবেই।

ঃ তুমি নিশ্চিন্ত থাকো। আমি কারও সঙ্গেই যাব না।

লুসিয়ার উদ্বেগ বাড়তে থাকে। তার বুঝে আসছে না, রাজকুমারীর কী হয়েছে। সুযোগ থাকা সত্ত্বেও কেন পালাচ্ছে না এবং কী করতে চাচ্ছে।

আরসানুস ও তার সৈন্যরা সালওয়ানুসের বহুসংখ্যক সঙ্গীকে হত্যা করে ফেলেছে; আরসানুস এখন সালওয়ানুসের উপর আক্রমণ করছে। দুই খ্রিস্টান বীরযোদ্ধা সবটুকু শক্তি ও যোগ্যতা ব্যয় করে পরস্পর যুদ্ধ করছে। অবশেষে আরসানুস জয়ী হয়। সালওয়ানুস আরসানুসের তরবারির আঘাতে প্রাণ হারায়। এ-দৃশ্য দেখে সালওয়ানুসের সঙ্গীরা ঊর্ধ্বশ্বাসে পালাতে শুরু করে। আরসানুস তাদের ধাওয়া না-করে পালাতে সুযোগ দেয়।

আরসানুসের সম্মুখে এখন কোনো প্রতিপক্ষ নেই। তাই তরবারিটা মুছে রক্ত পরিষ্কার করে কোষে ঢুকিয়ে রাজকুমারীর নিকট এসে দাঁড়ায় এবং অতিশয় শ্রদ্ধার সঙ্গে বলে– 'রাজকুমারী, বেয়াদব সালওয়ানুসটাকে উপযুক্ত শাস্তি দিয়েছি। এবার বলুন, আপনি কোথায় যেতে চান। বলুন, আমি আপনাকে আপনার কাঙ্খিত গন্তব্যে পৌছিয়ে দেব।'

হেলেন ও লুসিয়ার ধারণা ছিল, আরসানুস তাদেরকে তার সঙ্গে যেতে বাধ্য করবে। কিন্তু, তার বিনয়-বিগলিত বক্তব্য শুনে তারা যারপরনাই বিস্মিত হয়। হেলেন বলল– 'আমি কোথায় যাব! আমার তো কোনো আশ্রয় নেই!'

ঃ আপনি হতাশ হবেন না। যেখানে গিয়ে আশ্রয় নেয়া ভালো মনে করেন, বলুন; খাদেম আপনাকে সেখানে সসম্মানে পৌছিয়ে দেবে। যদি ভালো মনে করেন, তা হলে সাবীলার পথও আপনার জন্য উন্মুক্ত। আপনার এই সেবক আপনার নিরাপত্তাবিধানে জীবন দিতেও প্রস্তুত।

ঃ না, আমি কোথাও যেতে চাই না।

ঃ রাজকুমারী বোধহয় আমাকে বিশ্বাস করতে পারছেন না। আমি স্বীকার করছি যে, আমি আপনার প্রতি আসক্ত। মহারাজের নিকট আপনার বিয়ের প্রস্তাব প্রেরণ করেছিলাম, তা-ও অস্বীকার করি না। আর এখন আপনার সম্মুখে অকপটে স্বীকার করছি, আমি আপনাকে অর্জন করার লক্ষ্যেই মুসলমানদের সঙ্গে এসেছিলাম। কিন্তু, এখানে এসে আমি বদলে গেছি। এখন রাজকুমারীর সন্তুষ্টি মোতাবেক কাজ করাই আমি কর্তব্য মনে করি। আদেশ করুন, আমি আপনার আদেশ মান্য করতে একপায়ে খাড়া আছি।

ঃ কিন্তু আপনার মাঝে এই পরিবর্তনটা কীভাবে সৃষ্টি হল?

ঃ শুনতেই যখন চাচ্ছেন, তো শুনুন। আমি মুসলমানদের সঙ্গে থাকছি বেশ কিছুদিন হয়ে গেল। এ-সময়টায় আমি তাদেরকে কাছে থেকে দেখার সুযোগ পেয়েছি। তারা অত্যন্ত সচ্চরিত্রবান, সুসভ্য, খোদাভীরু, ধর্মপরায়ণ ও পবিত্রহৃদয়ের মানুষ। তাদের সাহচর্য আমার হৃদয়-চরিত্রের সকল কালিমা ও অসাধুতা ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার করে দিয়েছে। মুসলমানরা অবলা নারীদের উপর জুলুম করা অন্যায় জ্ঞান করে। এখন আমিও নারীনির্যাতনকে অপরাধ ভাবতে শুরু করেছি।

ঃ কিন্তু, আমি তো মুসলমানদের সম্পর্কে এর বিপরীত ধারণা পেয়েছিলাম। আমি শুনেছি, তারা অত্যন্ত রক্তপিপাসু, হিংস্র, অজ্ঞ, অধার্মিক ও স্বার্থপর জাতি।

ঃ আমিও এমনই শুনেছিলাম রাজকুমারী! কিন্তু কাছে থেকে দেখলাম বিপরীত। এসব কট্টর খ্রিস্টানদের ইসলাম ও মুসলিমবিরোধী অপপ্রচার মাত্র।

ঃ এই অপপ্রচারে খ্রিস্টানদের লাভ হচ্ছে কী?

ঃ তারা চাচ্ছে না, মুসলমান ও খ্রিস্টানরা মিলেমিশে জীবনযাপন করুক। তারা ভয় করছে, মুসলমানদের উন্নত চরিত্রমাধুরী দেখে খ্রিস্টানরা মুসলমান হয়ে যাবে, তখন তাদের রাজত্ব-কর্তৃত্ব অচল হয়ে যাবে।

ঃ আপনি কোথায় থাকেন?

ঃ ইসলামী ক্যাম্পে। যেতে চাইলে আপনাকেও নিয়ে যেতে পারি। যাবীলা যেতে সম্মত হলে বলুন, ওখানে পৌঁছিয়ে দেব।

ঃ এখনই কোথাও যেতে চাচ্ছি না। আমি দেখতে চাই মুসলমানরা আমার সঙ্গে কীরূপ আচরণ করে।

ঃ তারা আপনাকে আপনার পদমর্যাদা অনুপাতে সম্মান করবে। শোনেননি, মুসলমানরা সম্রাট হেরাক্লিয়াসের কন্যাকে গ্রেফতার করেছিল; কিন্তু হেরাক্লিয়াস যখন মেয়েকে ফেরত চাইলেন, তারা সম্মানের সঙ্গে তাকে পিতার নিকট পৌঁছিয়ে দিল?

হেলেন শীতল নিঃশ্বাস ছেড়ে বলল– 'হ্যাঁ, শুনেছি। কিন্তু তার পিতা জীবিত ছিলেন। আমার পিতা তো মারা গেছেন।'

ঃ কিন্তু আপনি রাজকুমারী। মুসলমানরা আপনাকে যথাযথ সম্মান দেখাবে। দেখুন, ওই তো মুসলমানরা খ্রিস্টানদের ধাওয়া করে ফিরে আসছে।

মুসলমানরা চতুর্দিক থেকে ফিরে আসছে। সকলে আবদুল্লাহ ইবনে সা'দের নিকট ইসলামী পতাকার তলে এসে-এসে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। সেনাপতি আবদুল্লাহ ইবনে সা'দ কিছু লোককে শহীদদের লাশগুলো একত্রিত করতে আদেশ করেন। কয়েকজনকে খ্রিস্টানক্যাম্পের মালপত্র নিয়ে আসার জন্য সেদিকে প্রেরণ করেন।

অল্পক্ষণের মধ্যে দুটি কাজই সম্পন্ন হয়ে যায়। আজ মুসলমানরা শহীদ হয়েছে তিনশ। খ্রিস্টান মারা গেছে ষাট হাজার। চারশ মুসলমান আহত হয়েছে। আহত খ্রিস্টানদের কোনো সংখ্যা নেই– অগণিত। ইতিহাসের বিখ্যাত এই যুদ্ধে সর্বমোট আটশ বিশজন মুসলমান শহীদ হয়েছেন। এক হাজার আহত হয়েছেন। খ্রিস্টান মারা গেছে এক লাখ দশ হাজার। প্রথম দিককার যুদ্ধগুলোতে সাধারণ আহত-হওয়া যেসব সৈন্য শেষ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে প্রাণ হারিয়েছে, নিহতদের এই সংখ্যার মধ্যে তারাও অন্তর্ভুক্ত। এভাবে এক লাখ বিশ হাজারের মধ্যে মাত্র দশ হাজার খ্রিস্টানসেনা কোনোমতে প্রাণরক্ষা করতে সক্ষম হয়েছে। মুসলমানগণ জানাজা পড়ে শহীদদের দাফন করে ফেলে।

মালে গনীমত ও বন্দিদের ইসলামীক্যাম্পে পৌঁছিয়ে দেওয়া হয়। আরসানুস রাজকুমারী হেলেন ও লুসিয়াকে সেনাপতি আবদুল্লাহ ইবনে সা'দের নিকট উপস্থিত করে বলল– 'মহামান্য সেনাপতি, এই মেয়েটি সম্রাট জর্জিরের কন্যা হেলেন।'

আবদুল্লাহ ইবনে সা'দ চোখ তুলে হেলেনের রূপবান মুখের প্রতি তাকিয়ে বললেন– 'এই কি সেই মেয়ে, জর্জির যাকে আমার মাথার বিনিময়ে নিলামে তুলেছিলেন?'

আবদুল্লাহ ইবনে সা'দের প্রশ্নটা কানে প্রবেশ করামাত্র হেলেন কেঁপে ওঠে। তার মনে ভয় ধরে যায়, ইসলামী সেনাপতি তাকে নিঃসন্দেহে হত্যা করে ফেলবেন। হেলেন মিনতিভরা ভয়ার্ত করুণচোখে ইবনে সা'দের প্রতি তাকিয়ে থাকে। আরসানুস বলল– 'জি, এই সেই রাজকুমারী, সমগ্র খ্রিস্টজগতে যার রূপের খ্যাতি বিরাজমান।'

আবদুল্লাহ ইবনে সা'দ স্মিত হেসে বললেন– 'মেয়েটা অতিশয় রূপসী, তাতে সন্দেহ নেই। আচ্ছা বোন, তোমার আব্বাজান কোথায়?'

জর্জির যুদ্ধে নিহত হয়েছেন আবদুল্লাহ ইবনে সা'দ জানেন না। তার ধারণা ছিল, তিনি পালিয়ে গেছেন। পিতার উল্লেখে হেলেনের হৃদয়টা বেদনায় ছ্যাৎ করে ওঠে। চোখ দুটো সজল হয়ে ওঠে। কাঁদো-কাঁদো কাঁপা কণ্ঠে বলল– 'মারা গেছেন।'

আবদুল্লাহ ইবনে সা'দ বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বললেন– 'মারা গেছেন? কে তাকে হত্যা করেছে?'

ঃ এক তরুণ মুসলমান।

ঃ আমাকে ক্ষমা করো রাজকুমারী! আমি তোমার মনে কষ্ট দিয়েছি। ঘটনাটা জানা থাকলে তোমার সম্মুখে তার আলোচনা তুলতাম না। তোমার দুঃখে আমিও দুঃখিত। আমি তোমাকে এখনই মুক্তি দিয়ে দিতাম। কিন্তু ব্যাপারটি এখন আমার সাধ্যের ভেতরে নেই।

আবদুল্লাহ ইবনে সা'দের এহেন হৃদ্যতাপূর্ণ কোমল আচরণ ও স্নেহপূর্ণ কথোপকথন হেলেনের অন্তরে তীব্র রেখাপাত করে। মেয়েটি জিজ্ঞেস করে– 'ব্যাপারটি আপনার সাধ্যের বাইরে কেন? আপনি তো বাহিনীর সর্বাধিনায়ক?'

ঃ আমার এই অক্ষমতার কারণ হচ্ছে, তোমার পিতা ঘোষণা করেছিলেন, যে-ব্যক্তি আমার মাথা কেটে নিয়ে তার পায়ে অর্পণ করবে, তার সঙ্গে তোমাকে বিয়ে দেবেন। জবাবে আমিও ঘোষণা করেছি, যে-মুসলমান আফ্রিকার সম্রাট জর্জিরকে হত্যা করবে, তাকে তার কন্যা হেলেন অর্থাৎ– তোমাকে দাসীরূপে দান করব, আর এক লাখ দিনার পুরস্কার দেব। তোমার

পিতা নিহত হয়েছেন এবং কোনো-না-কোনো মুসলমান তাকে হত্যা করেছে। তাই তোমার মালিক এখন সে। তবে হ্যাঁ, আমি ওয়াদা দিচ্ছি, তোমার দাবিদার মুসলমানকে বলব, সে যেন তোমাকে মুক্ত করে দিয়ে ঘোষিত এক লাখ দিনার আমার থেকে নিয়ে নেয়।'

ঃ ঠিক আছে, ভাগ্যে যা আছে আমি তা-ই বরণ করে নেব।

ঃ মনটাকে ছোট করো না রাজকুমারী! আমি নিশ্চিত, তোমার পিতার ঘাতক তোমার দাবি পরিত্যাগ করবে আর তুমি মুক্ত হয়ে ফিরে যাবে। যদি না-করে, তা হলে মুসলমানদের মাঝে জীবনযাপন করতে তোমার কোনো কষ্ট হবে না।

আবদুল্লাহ ইবনে সা'দ কিছুক্ষণ নীরব থেকে বললেন- 'একাকি আলাদা থাকতে চাইলে বলো, তোমার জন্য আলাদা তাঁবু স্থাপন করিয়ে দিই। আর আরব নারীদের সঙ্গে থাকতে চাইলে, তা-ও বলো নারীক্যাম্পে তাদের নিকট পাঠিয়ে দিই।'

ঃ আপাতত আমাকে মুসলিম নারীদের মাঝেই থাকতে দিন।

ঃ ঠিক আছে। সরোয়ার, রাজকুমারীকে আমাদের মহিলাদের নিকট পৌঁছিয়ে দাও।

ইতিমধ্যেই সরোয়ার আবদুল্লাহ ইবনে সা'দের নিকট এসে পৌঁছেন। সে রাজকুমারী হেলেনকে সঙ্গে করে নারীক্যাম্পে নিয়ে আরব নারীদের কাছে পৌঁছিয়ে দিয়ে আসে। আরব মহিলাগণ যখন জানতে পারে, হেলেন রাজকুমারী এবং সেই রাজকুমারী, যার বিবাহের জন্য মুসলিম সেনাপতির মাথার শর্ত আরোপ করা হয়েছিল, তখন সকল নারী তাকে দেখার জন্য হুমড়ি খেয়ে পড়ে। রূপসী আরবকন্যা সালমাও আসে। তার রূপ দেখে সবাই বিস্মিত ও বিমোহিত হয়। সকল আরব তরুণী ও মহিলারা হেলেনের সঙ্গে অতিশয় সদাচার দেখাতে শুরু করে। সবাই তাকে তার যথাযথ মর্যাদার সঙ্গে বরণ করে নেয়।

মুসলিম মহিলাদের জানা ছিল, খ্রিস্টান রাজা ও রাজপুত্র-রাজকন্যারা অত্যন্ত ভোগ-বিলাসিতার মধ্যে প্রতিপালিত হয়ে থাকে। আরামদায়ক নরম মখমলের গদি ও মহামূল্যবান গালিচায় উপবেশন করে। কোমল আরামদায়ক বিছানায় শয়ন করে। সোনা-রূপার বরতনে আহার করে। তাই এক মহিলা বলল- 'রাজকুমারী, আমরা সহজ-সরল জীবনযাপন করি। আমাদের উপকরণাদি নেহায়েতই কম এবং সাধারণ। আমাদের বিছানা মোটা কম্বল। কাঁশার থালায় খাই। তাই এখন এখানেই বসুন, সেনাপতিকে বলে আপনার উপযোগী সরঞ্জামাদির ব্যবস্থা করিয়ে দেব।'

হেলেন বলল– 'না, আমি আপনাদের সঙ্গে থাকতে এসেছি। যতক্ষণ থাকব, আপনাদের মতোই থাকব। অতিরিক্ত কিছুরই ব্যবস্থা করতে হবে না।'

আরব মহিলা বলল– 'কিন্তু তাতে আপনার কষ্ট হবে যে!'

আরব মুসলিম নারীদের এহেন হৃদ্যতা ও সমবেদনাপূর্ণ আচরণ এবং তাদের অনুপম চরিত্র ও মানবতাবোধ দেখে হেলেন বলল– 'না, আপনাদের সঙ্গে আপনাদেরই মতো করে থাকতে আমার কোনোই কষ্ট হবে না।'

পরদিন ফজর নামায আদায় করেই আবদুল্লাহ ইবনে সা'দ হেলেনকে নিজতাঁবুতে ডেকে পাঠান এবং সকল অফিসারকে তলব করেন। সকলে এসে উপস্থিত হলেও আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর সংবাদ পাঠান, তিনি কাজে ব্যস্ত আছেন; এখন আসতে পারবেন না।

সকল মুসলিম অফিসার এসে উপস্থিত হলে সেনাপতি আবদুল্লাহ ইবনে সা'দ বললেন– 'মুসলমানগণ, আফ্রিকার সম্রাট জর্জির মারা গেছে। তার অনুপমা সুন্দরীকন্যা হেলেন গ্রেফতার হয়েছে। আপনাদের মধ্যে যিনি জর্জিরকে হত্যা করেছেন, তিনি এগিয়ে এসে রাজকুমারীকে এবং এক লাখ দিনার পুরস্কার গ্রহণ করুন।'

আবদুল্লাহ ইবনে সা'দের ধারণা ছিল, জর্জিরকে অবশ্যই এই অফিসারদেরই কেউ হত্যা করে থাকবেন। কিন্তু উপস্থিত একজনও পুরস্কার গ্রহণের জন্য উঠে দাঁড়ালেন না। রাজকুমারী হেলেন এদিক-ওদিক চোখ বুলিয়ে কাউকে খুঁজছে। পাশে বসে বান্ধবী লুসিয়া তার কাণ্ডকীর্তি অবলোকন করছে। যখন কেউ কোনো উত্তর দিল না, তখন আবদুল্লাহ ইবনে সা'দ বললেন– 'মনে হচ্ছে, আপনাদের কেউ জর্জিরকে হত্যা করেননি।'

ইবনে ওমর বললেন– 'সকলের নীরবতা তো তা-ই প্রমাণ করছে।'

ইবনে সা'দ বললেন– 'তবে তো আমাকে আমভাবে ঘোষণা দিতে হবে।'

হযরত হুসাইন বললেন– 'তা তো করতেই হবে।'

আবদুল্লাহ ইবনে সা'দ তৎক্ষণাৎ কয়েকজন অশ্বারোহীকে ডেকে বললেন– 'তোমরা সমগ্র ক্যাম্পে সকল সৈনিকের মাঝে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করে দাও, রাজকুমারী হেলেন গ্রেফতার হয়েছে। যে তার পিতা জর্জিরকে হত্যা করেছে, সে যেন সেনাপতির তাঁবুতে এসে ঘোষিত পুরস্কার নিয়ে যায়।'

অশ্বারোহী সৈন্যরা ছুটে যায়। তারা সমগ্র বাহিনীতে ঘোষণাটা প্রচার করে দেয়। প্রত্যেক সৈনিক ও প্রতিজন অফিসার-কমান্ডার ঘোষণা সম্পর্কে অবহিত হয়। ইবনে যুবাইরও ঘোষণাটা শোনেন। তিনি মুখ টিপে হেসে

বাইরে থেকে তাঁবুতে গিয়ে বসেন।

ঘোষক অশ্বারোহীরা ফিরে গিয়ে আবদুল্লাহ ইবনে সা'দকে অবহিত করে, ঘোষণা হয়ে গেছে। রাজকুমারী ও মুসলিম অফিসারগণ ধরে নেন, এবার জর্জিরের ঘাতক এসে উপস্থিত হবে। কিন্তু, কয়েক ঘণ্টা সময় অতিবাহিত হওয়ার পরও কেউ আসল না।

আবদুল্লাহ ইবনে সা'দ বললেন– 'আশ্চর্য, জর্জিরকে কে হত্যা করল! লোকটা পুরস্কার নিতে আসছে না কেন!'

ইবনে ওমর বললেন– 'মনে হয় সে কোথাও গিয়ে থাকবে।'

আবদুল্লাহ ইবনে সা'দ বললেন– 'ঠিক আছে, আমি অপেক্ষা করছি। রাজকুমারী, তুমি তাঁবুতে চলে যাও।'

হেলেন তাঁবুতে চলে যায়। আবদুল্লাহ ইবনে সা'দ জোহর পর্যন্ত অপেক্ষা করেন। কিন্তু কেউ আসল না। অবশেষে জোহর নামাযের পর সকলের মাঝে আবারও ঘোষণাটা প্রচার করা হল। ইবনে যুবাইর এবারও ঘোষণা শুনে মুচকি একটা হাসি দিয়ে তাঁবুতে চলে যান।

এদিন ইবনে সা'দ প্রতি ওয়াক্ত নামাযের পর ঘোষণা করাতে থাকেন। কিন্তু, পুরস্কার নেওয়ার জন্য কেউ আসল না। আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর প্রতিবারই ঘোষণাটি শুনছেন আর একটা করে মুচকি হাসি উপহার দিচ্ছেন; কিন্তু পুরস্কার নিতে আসছেন না।

পরদিন ফজর নামাযের পরও এলান করা হল। এবারও যখন কেউ আসল না, তখন আবদুল্লাহ ইবনে সা'দ হেলেনকে ডেকে জিজ্ঞেস করেন– 'এটাই কি সত্য যে, তোমার পিতাকে কোনো মুসলমান হত্যা করেছে?'

হেলেন ভগ্নহৃদয়ে উত্তর দেয়– 'হ্যাঁ, আব্বাজানকে একজন মুসলমানই হত্যা করেছে।'

আবদুল্লাহ ইবনে সা'দ বললেন– 'কিন্তু কী আশ্চর্যের ব্যাপার, কাল থেকে ঘোষণা করাচ্ছি; অথচ, এই মুহূর্ত পর্যন্ত কেউ পুরস্কার নিতে এল না। এখন আমি তোমাকে সাবতিলা নিয়ে যাব। নগরী দখল করে তোমাকে বাহিনীর সঙ্গে খলীফার নিকট পাঠিয়ে দেব। তোমার ব্যাপারে তিনিই ফয়সালা নেবেন।'

হেলেন কী উত্তর দেবে। সে চুপচাপ বসে থাকে। কিছুক্ষণের মধ্যে তাকে নারীক্যাম্পে পাঠিয়ে দেওয়া হল। সেনাপতি আবদুল্লাহ ইবনে সা'দ বাহিনীতে ঘোষণা করিয়ে দেন– 'বাহিনী আগামী কাল সাবতিলার উদ্দেশ্যে রওনা হবে; সকলে প্রস্তুতি গ্রহণ করো।'

চুয়াল্লিশ.

নারীক্যাম্পে অবস্থান করে রাজকুমারী হেলেন আরবের মুসলিম মহিলাদের সরল জীবনের নমুনা দেখল। না তারা দামি পোশাক পরিধান করে, না মহামূল্যবান অলংকার। তারা সাদাসিধে, অথচ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পোশাক পরিধান করে। তারা পবিত্রতা-পরিচ্ছন্নতাকে ঈমানের অঙ্গ মনে করে। শিশুদেরকে দৈনিক দুবার গোসল করায়। নিজেরা একবার করে। পরস্পর মিল-মহব্বত এমন যে, বিশ্বাস করার উপায় নেই তারা সহোদরা নয়।

রাজকুমারীর ধারণা ছিল, যেহেতু আরব গরমপ্রধান দেশ আর গরম দেশের মানুষ কৃষ্ণবর্ণ হয়ে থাকে; তাই মুসলিম নারী-পুরুষরা কালো এবং কুৎসিৎই হবে। কিন্তু, চোখে দেখল বিপরীত। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সব আরবই ফর্সা এবং রূপবান। মহিলাদের গঠন-আকৃতি অত্যন্ত আকর্ষণীয়। তদুপরি তাদের শালীন সাজগোজও বেশ চমৎকার। সকলের মাথায় ভ্রমরকৃষ্ণ রেশমকোমল দীঘল কেশ। তারা চুলগুলো দুটি বেণি করে দুই কাঁধের উপর দিয়ে বুকের উপর ছড়িয়ে রাখে। আরব নারীদের চুল বাঁধার এই পদ্ধতি রাজকুমারীর খুব ভালো লাগে।

সালমার রূপ দেখে রাজকুমারী অবাক্ হয়ে যায়। নিজের রূপে বেজায় গর্ব ছিল তার। কিন্তু, সালমার আকার-গঠন ও রূপ-সৌন্দর্যে যে-আকর্ষণ আছে, তা তার জগতমাতানো রূপে নেই। সালমার সঙ্গে তার সখ্য গড়ে ওঠে এবং তার তাঁবুতেই থাকতে শুরু করে। হাবীব ও সালমা এইজন্য বেজায় আনন্দিত যে, আফ্রিকার বিখ্যাত সুন্দরী মেয়ে রাজকুমারী হেলেন তাদের তাঁবুতে বাস করছে। দুজনের মাঝে এমন ভাব গড়ে ওঠে যে, হেলেন সালমাকে ছাড়া আর সালমা হেলেনকে ব্যতীত একমুহূর্তও থাকতে পারছে না। লুসিয়াও হেলেনের সঙ্গে সালমাদের তাঁবুতেই থাকছে। হেলেনের অন্যান্য সখী-দাসীদের জন্য নারীক্যাম্পের সন্নিকটে কয়েকটি তাঁবু স্থাপন করে দেওয়া হয়েছে।

হেলেন খানিকটা উদ্বিগ্ন ও চিন্তিত থাকছে। ব্যাপারটা সালমার ভালো লাগছে না। সালমা চাচ্ছে, হেলেন হাসিখুশি থাকুক। তাই সে বলল– 'রাজকুমারী, তুমি মুখটা অমন গোমরা করে রেখো না; তোমার হাস্যোজ্জ্বল চেহারাটা আমার বেশ ভালো লাগে।'

হেলেন বলল– 'আমি তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ সালমা। তোমার প্রতি আমার কী পরিমাণ খাতির জমে গেছে, তা তুমি ভালো করেই জান। তুমি আমার আরাম-আয়েশের প্রতি কত খেয়াল রাখছ। তা ছাড়া আমার ব্যথায় তুমিও যে ব্যথিত হচ্ছ, তা-ও আমি বুঝি। কিন্তু, এ আমার ভাগ্যের লিখন সালমা! আমার জন্য তুমি উদ্বিগ্ন হয়ো না।'

ঃ আমি তোমার ব্যথা বুঝি। কিন্তু, ওসব স্মরণ করে-করে মন খারাপ করে থাকলে স্বাস্থ্যটা নষ্ট করা ছাড়া আর কোনো লাভ হবে না। তুমি হৃদয়কে সান্ত্বনা দাও এবং মন থেকে দুশ্চিন্তা সরিয়ে দাও এবং হাসিখুশি থাকো।

ঃ ঠিক আছে, তা-ই করব।

ঃ এখানে তোমার কষ্টের একটি কারণ এ-ও যে, এখানে তোমার উপযুক্ত সাজ-সরঞ্জাম নেই।

ঃ না সালমা, এটা কোনো ব্যাপারই নয়। এ নিয়ে আমার একবিন্দু ভাবনা নেই। আমি এখন রাজকুমারী নই। ভোগ-বিলাসিতার প্রতি এখন আমার কোনো মোহ নেই। তোমাদের মতো সরল জীবনই এখন আমার অনেক পছন্দ।

ঃ তা হলে কিসের এত চিন্তা করছ?

ঃ চিন্তা... আচ্ছা একটা কথা বলবে?

ঃ অবশ্যই বলব। বলো কী কথা?

ঃ তোমার কি কারও সঙ্গে ভালবাসা আছে?

ভালবাসার উল্লেখে সালমার মুখটা লজ্জায় অবনত হয়ে যায়। সে মাথা ঝুঁকিয়ে চুপচাপ বসে থাকে। হেলেন বুঝে ফেলে, সালমা নাখোশ হয়েছে। কোমলকণ্ঠে বলল– 'মাফ করো সালমা, আমি তোমাকে কষ্ট দিলাম।'

সালমা মাথা তুলে হেলেনের উজ্জ্বল মুখপানে তাকিয়ে বলল– 'আমাদের সমাজে এ-জাতীয় কথাবার্তাকে খুবই অন্যায় মনে করা হয়।'

ঃ আমি জানতাম না। জানলে আলোচনাটা তুলতাম না।

ঃ কিন্তু তুমি প্রশ্নটা কেন করলে?

ঃ সালমা, আমার হৃদয়ে প্রেমের আগুন দাউ-দাউ করে জ্বলছে। যে-বেদনার সঙ্গে আমি অপরিচিত ছিলাম, তা-ই এখন উথলে ওঠছে।

ঃ সে-কারণেই বোধ হয় তুমি নিজ জন্মভূমি ত্যাগ করতে চাচ্ছ না?

ঃ জন্মভূমি! না সালমা! আপন দেশে থাকার ইচ্ছা আর আমার নেই।...

এমন সময় লুসিয়া এসে উপস্থিত হয়। সালমা-হেলেনের মধুর আলাপের ধারায় ছেদ পড়ে।

এদিন সন্ধ্যার পর সরোয়ার হাবীবের খোঁজে সালমাদের তাঁবুতে আসে। ঘটনাক্রমে হাবীব তাঁবুতে ছিলেন না। হেলেন, সালমা ও লুসিয়া তাঁবুর সম্মুখে কম্বল পেতে বসে গল্প করছে। সালমা দূর থেকে সরোয়ারের আগমন দেখে ফেলে। তার চেহারাটা ঝলমল করতে শুরু করে। চোখ দুটো আলোকময় হয়ে ওঠে। তারা যেখানে উপবিষ্ট, তার সন্নিকটে প্রদীপ জ্বলছে। জায়গাটা আলোকিত।

একজনের চেহারা অন্যরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। হেলেন সালমার চেহারায় এই হঠাৎ পরিবর্তনটা দেখে ফেলে। চৌকস মেয়ে কিনা, তাই বুঝে ফেলে কিছু একটা ব্যাপার আছে। সরোয়ার তিন রূপসী কন্যার আড্ডার নিকটে এসে পৌঁছয়। সালমা লাজুক চোখে তার প্রতি তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে- 'কেন আসলেন?'

হেলেনকে সরোয়ারই সেনাপতির তাঁবু থেকে নারীক্যাম্পে পৌঁছিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু, তখন উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা ও পেরেশানির কারণে হেলেন তাকে ভালোভাবে দেখতে পায়নি। এখন দেখল। ছেলেটির মাঝে পুরুষোচিত রূপের যাবতীয় বৈশিষ্ট্যই বিদ্যমান। সে তৎক্ষণাৎ বুঝে ফেলে লোকটাকে দেখে সালমার হঠাৎ চমকে ওঠার হেতু কী।

সরোয়ার অতিশয় নির্লিপ্ততার সঙ্গে উত্তর দেয়- 'চাচাজানকে একটা কথা বলতে এসেছিলাম; তিনি কি তাঁবুতে আছেন?'

ঃ না, কোথায় যেন গেছেন।

'তা হলে পরে আবার আসব।' বলেই সরোয়ার মোড় ঘুরিয়ে হাঁটতে শুরু করে। কয়েক পা অগ্রসর হওয়ার পর সালমা উঠে দাঁড়িয়ে হেলেনকে বলল- 'তোমরা বসো; আমি একটু ওনাকে জিজ্ঞেস করে আসি, আব্বাজানকে কী বলতে এসেছিলেন।'

সালমা দ্রুত লম্বা পা ফেলে সরোয়ারের নিকট পৌঁছে পেছন থেকে ডাক দিয়ে বলল- 'এই, একটু দাঁড়ান।'

সরোয়ার সঙ্গে-সঙ্গে থেমে যায়। রূপরানী প্রেয়সীর প্রতি মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে যায়। সালমা তার নিকটে গিয়ে দাঁড়ায়। বলল- 'বোধ হয় রাজকুমারীকে দেখতে এসেছিলেন!'

সরোয়ারের প্রেমপাগল চোখ দুটো সালমার রূপের আধার মুখখানার প্রতি নিবদ্ধ হয়ে আছে। মুখে গাম্ভীর্য ফুটিয়ে বলল- 'সত্য কথা বলব সালমা, এই মুহূর্তে আমি কোন সুন্দরীকে দেখতে এসেছিলাম?'

সালমা অনুপম এক ভঙ্গি তুলে মনকাড়া অপলকচোখে সরোয়ারের প্রতি তাকিয়ে আছে- 'হ্যাঁ, সত্য করে বলুন।'

ঃ আমি তোমাকে এবং শুধুই তোমাকে দেখতে এসেছিলাম।

উত্তর শুনে সালমার সন্দেহ দূর হয়ে যায়। সীমাহীন আনন্দে তার মুখমণ্ডলটা পূর্ণিমার চাঁদের মতো ঝলমল করে ওঠে। আঁখিযুগল থেকে জাদুমাখা প্রভা ঠিক্‌রে পড়তে শুরু করে। মুচকি একটা হাসি দিয়ে প্রতিক্রিয়াটা চাপা দেওয়ার জন্য বলল- 'কিন্তু আপনার আগমনের অন্য কোনো কারণও আছে নিশ্চয়ই।'

ঃ থাকলে সেটা কারণ নয়- অজুহাত বলতে পার।

সালমা হি-হি করে হেসে ওঠে। তার হাস্যোজ্জ্বল দন্তপাটি থেকে রূপের কিরণ বিচ্ছুরিত হয়ে ঝলমলে মুখমন্ডলের উপর আছড়ে পড়ে। সরোয়ারের মনে হল, মেয়েটি সৌন্দর্যের এক জীবন্ত প্রতিমা। মুখে হাসি মেখে সালমা বলল– 'অজুহাত... অজুহাতও গড়তে জানেন আপনি, না?'

ঃ তোমার দর্শনলাভের জন্য বহু কিছুই করতে হয় সালমা!

ঃ কিন্তু আমাকে দেখার অত সখ কেন আপনার?

ঃ বরং জিজ্ঞেস করো, তোমাকে দেখার সখ থাকবে না কেন?

সালমা মুচকি হেসে বলল– 'বেশ ভালো।'

ঃ উত্তরটা শোনো। তুমি আমার জীবন-আকাশের উজ্জ্বল সূর্য। তুমি রূপের চাঁদ। চাতক যেমন চাঁদকে, বুলবুল যেমন ফুলকে, ভ্রমর যেমন ফুলকলিকে দেখার জন্য উদগ্রীব থাকে; তেমনি আমিও তোমাকে না-দেখলে অস্থির হয়ে পড়ি।

সালমা লজ্জা পায়। তার লাজুক চেহারাটা দেখতে আরও চমৎকার লাগে। সে সলাজচোখে সরোয়ারের প্রতি তাকিয়ে বলল– 'ব্যস বুঝেছি, আপনি দিব্যি কবি হয়ে গেছেন।'

ঃ হয়ে যদি থাকি, তো সে-ও তুমিই শিখিয়েছ।

সালমা আলোচনার প্রসঙ্গ পালটানোর জন্য বলল– 'আপনার রাজকুমারী তো ফাটাফাটি সুন্দরী!'

ঃ আমার শাহজাদী রূপের রানী। আল্লাহর শোকর যে, এতদিনে তুমি নিজমুখে আপন রূপের স্বীকৃতি দিলে!'

ঃ ছাই, বললাম কী আর আপনি বুঝলেন কী?

ঃ আমি যা বুঝেছি, শতভাগ ঠিক বুঝেছি।

সালমা মুচকি হেসে বলল– 'যা খুশি বোঝেন; আমি রাজকুমারী হেলেনের কথা বলছি।'

ঃ মেয়েটি কেমন তা তো তুমি দেখেছ।

ঃ সে কথাই বলছিলাম, মেয়েটি অত্যধিক রূপসী।

ঃ হতে পারে। একটা বিষয় মনে রাখবে সালমা, কোনো পুরুষের কাছে কোনো নারীর রূপের প্রশংসা করবে না। এর থেকে অনেক বিপত্তি জন্ম নেয়।

ঃ আপনি সত্য বলেছেন। আগামীতে সতর্ক থাকব। আচ্ছা, আব্বাজানকে কী যেন বলতে এসেছিলেন?

ঃ সেনাপতি চাচাজানকে বলতে বলেছেন, রাজকুমারীকে যেন তার মর্যাদা অনুপাতে খাতির-যত্ন করা হয়।

ঃ ঠিক আছে, আমি আব্বাজানকে বলব।

ঃ বলে দিয়ো। আচ্ছা, একটা কথা বলো তো সালমা!

ঃ কী কথা?

ঃ তুমি কি রাজকুমারীকে তোমাদের তাঁবুতে থাকতে আবেদন করেছ?

ঃ না। বরং রাজকুমারীই আপনা থেকে আমার সঙ্গে থাকার ইচ্ছা ব্যক্ত করেছে।

সরোয়ার সালমার চাঁদসুন্দর মুখের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বলল– 'আমারও তা-ই ধারণা ছিল।

সালমা সরল মেয়েটির ভান করে বলল– 'এ-ধারণা আপনার কেন হয়েছিল?'

ঃ তোমার উপমাহীন রূপে মুগ্ধ হয়ে তোমার প্রতি তার আকৃষ্ট হওয়া সুনিশ্চিত ছিল।

সালমা আবারও লজ্জা পায়। বলল– 'আচ্ছা, কথায়-কথায় অনেক সময় কেটে গেল। ওরা আবার কিছু মনে করে ফেলে কি-না। এবার যাই। আল্লাহ হাফেজ।' বলেই সালমা দ্রুতপায়ে হাঁটতে শুরু করে। সরোয়ারও উল্টা দিকে মুখ করে নিজতাঁবু অভিমুখে রওনা দেয়।

রূপসী সালমা আড্ডাখানায় রাজকুমারী হেলেন ও লুসিয়ার নিকট ফিরে আসে। সে একটু আগেকার প্রেমসিক্ত মুহূর্তটির আমেজ মিলিয়ে ফেলার চেষ্টা করে। কিন্তু, তার লাজুক আঁখিযুগল ভালবাসার সব ভেদ ফাঁস করে দেয়। রাজকুমারী তার মুখের উপর চোখ নিবদ্ধ করে মিটিমিটি হাসি ছড়িয়ে জিজ্ঞেস করে– 'কী বলতে এসেছিলেন উনি?'

সালমা তার পার্শ্বে বসতে-বসতে বলল– 'এসেছিলেন আব্বাজানকে সেনাপতির এই আদেশ জানাতে, যেন তিনি রাজকুমারীকে তার মর্যাদার অনুপাতে রাখেন।'

ঃ আমি সকল মুসলমানের প্রতি, বিশেষ করে মুসলমানদের সেনাপতির প্রতি যারপরনাই কৃতজ্ঞ। তুমি কি বলনি, এখানে আমার কোনো কষ্ট হচ্ছে না?

ঃ সে তিনি নিজেও জানেন।

ঃ উনি কে?

ঃ নারীক্যাম্পের নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত অফিসার।

এমন সময় সালমার পিতা হাবীব এসে পৌছেন। সালমা হেলেনের সামনেই তাকে সেনাপতির আদেশ জানিয়ে দেয়। হাবীব বললেন– 'রাজকুমারী তোমাদের অতিথি। তোমরা বিশেষভাবে তার সুবিধা-অসুবিধা ও আরাম-আয়েশের প্রতি লক্ষ্য রেখো।'

হেলেন বলল– 'সালমা আপা আমার বেশ খেয়াল রাখে। আমি ও আমার বান্ধবী লুসিয়া এখানে সবদিক থেকে আনন্দে ও আরামে আছি।'

কিছুক্ষণ পর খাবার প্রস্তুত হয়ে যায়। বসে সকলে খেতে শুরু করে।

পঁয়তাল্লিশ.

পরাজিত হয়ে খ্রিস্টান সৈনিকরা যে যেদিকে পারে পালিয়ে যায়। তাদের নিকট থেকে বাহিনীর পরাজয় এবং সম্রাট জর্জিরের মৃত্যুর খবর শুনে জনতা শিউরে ওঠে। সংবাদটা যখন আফ্রিকার রাজধানী সাবতিলায় পৌছয় এবং সেইসঙ্গে সাবতিলার অধিবাসীরা এ-ও জানতে পারে যে, যুদ্ধে তাদের সম্রাট মৃত্যুবরণ করেছেন, তখন নগরীর প্রতিটি ঘরে মাতম শুরু হয়ে যায়। সর্বত্র কান্নার রোল ওঠে। তাদের ক্রন্দনরোল ও বিলাপধ্বনি দুর্গের বাইরেও আছড়ে পড়ে। খ্রিস্টানরা বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে পড়ে যে, সামান্য কজন মুসলমান কী করে তাদের এক লাখ দশ হাজার সৈন্যকে মেরে ফেলল!

একদিন পর পরিস্থিতি কিছুটা শান্ত হয়ে এলে তারা পরবর্তী কৌশল নির্ধারণের জন্য বৈঠকে বসে। সভায় সর্বস্তরের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। রণাঙ্গনে থেকে পালিয়ে-যাওয়া প্রধান পাদরি থেভঢোস এবং অন্যান্য পাদরিরাও উপস্থিত হয়েছেন। প্রশ্ন উত্থাপিত হয়, মুসলমানরা দুর্গের সম্মুখে এসে পৌছুলে তাদের মোকাবেলা করা হবে, না-কি আত্মসমর্পণ করে দুর্গটা তাদের হাতে তুলে দেওয়া হবে?

ব্যবসায়ী এবং কৃষক নেতারা অভিমত ব্যক্ত করে, যখন স্বয়ং সম্রাটই যুদ্ধে প্রাণ হারিয়েছেন, যখন স্বল্প কজন ব্যতীত সমস্ত সৈন্য মারা গেছে, তখন আর যুদ্ধ করে লাভ নেই। এমতাবস্থায় মুসলমানদের সঙ্গে সন্ধি করে নেয়াই মঙ্গলজনক হবে। কিন্তু, থেভঢোস ও ধনবান লোকেরা বলল– মুসলমানদের আনুগত্যবরণ করে নেয়ার চেয়ে মৃত্যুবরণ করা অনেক ভালো। পরিণাম যা-ই হোক, দুর্গ বন্ধ করে দিয়ে যতক্ষণ সম্ভব মোকাবেলা করে যেতে হবে। মরব তো লড়াই করে বীরের মতো মরব।

দুর্গটা অত্যন্ত মজবুত ও উঁচু। সেজন্যে তারা নিশ্চিত, মুসলমানদের বহুদিন যাবত দুর্গ অবরোধ করে রাখতে হবে। অবশেষে ক্লান্ত ও বিরক্ত হয়ে তারা ফিরেও যেতে পারে। খ্রিস্টানরা দুর্গের সকল তরুণ-যুবককে জোরপূর্বক ফৌজে ভর্তি করে নেয়। দুর্গের ফটক শক্তভাবে বন্ধ করে দিয়ে পাঁচিলের উপর যুবকদের বসিয়ে দেয়। স্থানে-স্থানে ইট-পাথর ও তির জমা করে রাখে। বিপদে পড়লে সকলেরই খোদার কথা স্মরণ আসে। অ-ধর্মপরায়ণ খ্রিস্টানরাও একই নীতির পরিচয় দান করে। তারা গির্জায় গিয়ে-গিয়ে বিনীতকণ্ঠে খোদার কাছে জয় ও সাহায্য প্রার্থনা শুরু করে। সারা বছর যে-গির্জাগুলো শূন্য পড়ে থাকে, সেগুলো এখন উপসনাকারীদের ভিড়ে সরগরম হয়ে ওঠে। পাদরিরাও

বেজায় ব্যস্ত হয়ে পড়েন। তারা বিস্ময়কর-বিস্ময়কর কাহিনী বর্ণনা করে খ্রিস্টানদের উদ্দীপ্ত ও উত্তেজিত করে তুলছেন। যুবা-তরুণরা ধর্ম ও দেশের জন্য জীবন দিতে ও নিতে প্রস্তুত হয়ে যায়।

খ্রিস্টানরা প্রস্তুতির কাজে ব্যস্ত। এমনি অবস্থায় একদিন ঠিক দুপুরের সময় ইসলামী বাহিনী আত্মপ্রকাশ করে। ইসলামের বীর সিংহদের দেখামাত্র খ্রিস্টানরা চিৎকার করে দুর্গের সর্বত্র মুসলমানদের আগমনের সংবাদ ছড়িয়ে দেয়। বিপুলসংখ্যক খ্রিস্টান পাঁচিলের উপর অবস্থান নিয়েছিল। তাদের অধিকাংশই এমন যে, তারা জীবনে কখনও মুসলমান দেখেনি। তারা অপলকচোখে মুসলমানদের দেখতে থাকে। মুসলমানরা আরবি পোশাক পরিধান করে ঘোড়ায় চড়ে অত্যন্ত জাঁকজমকের সঙ্গে এগিয়ে আসছে।

দুর্গ থেকে এক মাইল পথ দূরে থাকতে তারা থেমে যায়। দুর্গের সম্মুখস্থ বিশাল-বিস্তৃত মাঠটিতে অবতরণ করে তাঁবু স্থাপন শুরু করে। মুসলমানদের নিয়ম হচ্ছে, তারা আগ-পিছ করে অল্প-অল্প সৈন্য পথ চলে থাকে। সে মোতাবেক একেকজন অফিসার নিজ বাহিনী নিয়ে এসে পৌঁছাচ্ছে এবং ময়দানে ছড়িয়ে গিয়ে তাঁবু গাড়ছে। বিকাল পর্যন্ত সমুদয় বাহিনী এসে পৌঁছয়। এমনকি বাহিনীর সেনাপতিও পৌঁছে যান।

মুসলমানরা এ-দিনটি বিশ্রাম করে। পরদিন ফজর নামায আদায় করেই সেনাপতি আবদুল্লাহ ইবনে সা'দ কয়েকজন দুঃসাহসী অভিজ্ঞ যোদ্ধাকে সঙ্গে নিয়ে দুর্গের চারদিক পরিদর্শনের জন্য চলে যান। একবার নয়, তিনি দুবার চক্কর লাগান। কিন্তু কোথাও এমন কোনো দুর্বল জায়গা পেলেন না, যে-পথে দুর্গে প্রবেশ করা যেতে পারে। তিনি দুপুরের সময় ফিরে এসে পরামর্শে বসেন। সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, দুর্গের অধিবাসীদের নিকট সন্ধির প্রস্তাব পাঠানো হবে। একটি পত্র লেখা হল, যার বিবরণ নিম্নরূপ :

'ইসলামী বাহিনীর সেনাপতি ও মিসরের গভর্নর আবদুল্লাহ ইবনে সা'দের পক্ষ থেকে। সাবতিলা দুর্গের অধিবাসীদের নিশ্চয়ই জানা থাকবে যে, মহান আল্লাহর অসীম মেহেরবানিতে যুদ্ধে আমরা মুসলমানরা জয়লাভ করেছি এবং তোমাদের বাহিনী পরাজয়বরণ করেছে। তোমাদের রাজা মারা গেছেন। তোমাদের রাজকুমারী আমাদের হাতে গ্রেফতার হয়েছে। তোমাদের মাঝে এখন আর মোকাবেলা করার শক্তি অবশিষ্ট নেই। যুদ্ধ পরিহার করে রক্তক্ষয় বন্ধ করে দেয়ার পথ অবলম্বন করাই এখন তোমাদের জন্য বুদ্ধিমত্তার পরিচয় হবে। তোমরা দুর্গের সব কটি ফটক খুলে দাও আর নিশ্চিত থাকো, আমরা

তোমাদের উপর কোনো অত্যাচার করব না। তোমাদের যারা মুসলমান হয়ে যাবে, তারা আমাদের ভাই বলে গণ্য হবে। যারা জিযিয়া প্রদান করবে, আমরা তাদের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা দেব। যারা এর কোনোটিই করবে না, তাদেরকে পরিবার-পরিজন ও সহায়-সম্পদসহ দুর্গ ত্যাগ করে যে-কোনো স্থানে চলে যাওয়ার অনুমতি দেব। জিযিয়া পরিশোধ করে যারা দুর্গে অবস্থান করবে, তাদেরকে পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা দেয়া হবে। তোমাদের জন্য ভালো ও কল্যাণকর হবে, এর কোনো একটি শর্ত মেনে নিয়ে আমাদের সঙ্গে সন্ধি করে নাও। অন্যথায় আমরা দুর্গ আক্রমণ করব। আর যুদ্ধ করে দুর্গ জয় করার পর কাউকেও নিরাপত্তা দেয়া হবে না।'

পত্রখানা পৌঁছিয়ে দেওয়ার জন্য একজন খ্রিস্টান বন্দিকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। লোকটি দুর্গের নিকট পৌঁছে চিৎকার করে বলল- 'ওহে সাবতিলার অধিবাসীগণ, আমি মুসলমানদের দূত।'

শব্দ শুনে খ্রিস্টানরা উঁকি দিয়ে তাকায়। রশিতে বেঁধে একটি টুকরি নিচে ফেলে। দূত টুকরিতে চড়ে বসলে তাকে টেনে উপরে তুলে নেওয়া হয়। খ্রিস্টানরা তার থেকে পত্রখানা নিয়ে পাঠ করে। তারা পরামর্শের জন্য সমবেত হয়। থেভডোস বললেন- 'বীর খ্রিস্টানগণ, মুসলমানদের ফাঁদে পা দিয়ো না। তারা তোমাদেরকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলতে চাচ্ছে। এ-যাবত তারা যত জনবসতি দখল করেছে, সেখানকার খ্রিস্টানদের নির্মূল করে ফেলেছে। আমরা সংখ্যায় বিপুল। হিম্মত হারাবার কোনো কারণ নেই। তোমরা যুদ্ধ চালিয়ে যাও। এই দুর্গ জয় করার শক্তি কারও নেই।'

সিদ্ধান্ত হল, সন্ধি করা হবে না। মোকাবেলা করে দুর্গ রক্ষা করা হবে। দূতকে জবাব লিখে দেওয়া হল। তাকে যেভাবে উপরে তুলে নেওয়া হয়েছিল, সেভাবেই নিচে নামিয়ে দেওয়া হল। দূত উত্তরপত্র মুসলিম সেনাপতির হাতে পৌঁছিয়ে দেয়।

পরদিন আবদুল্লাহ ইবনে সা'দ বাহিনীকে দুর্গের চারদিকে ছড়িয়ে দেন এবং কঠোরভাবে অবরোধ করার নির্দেশ প্রদান করেন। মুসলমানগণ দিনরাত সারাক্ষণ এমন কঠোরভাবে দুর্গ অবরোধ করে রাখে যে, কাক-পক্ষিকে পর্যন্ত পাখাটাও ঝাপটাতে দিচ্ছে না। এভাবে এক সপ্তাহ কেটে যায়। খ্রিস্টানদের মাঝে অস্থিরতা ও পেরেশানির ভাব ফুটে ওঠে। তারা বুঝে ফেলে, মুসলমানরা দুর্গ জয় না-করে ছাড়বে না। তাদের মাঝে ভীতি ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। মুসলমানরা দিনেও পাহারা দিয়ে বেড়াচ্ছে। রাতে না নিজেরা ঘুমোচ্ছে, না দুর্গবাসীদের ঘুমোতে দিচ্ছে। খ্রিস্টানরা পুরোপুরি কোণঠাসা হয়ে পড়েছে।

এক রাত। সেনাপতি আবদুল্লাহ ইবনে সা'দ টহল দিচ্ছেন। এক খ্রিস্টান তার নিকট এসে বলল- 'আপনি যদি আমাকে এবং আমার পরিবার-পরিজনকে নিরাপত্তা প্রদানের প্রতিশ্রুতি দান করেন, তা হলে আমি আজই আপনাকে দুর্গে ঢুকিয়ে দেব।' আবদুল্লাহ ইবনে সা'দ প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। খ্রিস্টান বলল- 'আমাকে নগরবাসীরা গুপ্তচর বানিয়ে আপনাদের নিকট প্রেরণ করেছে। আপনারা দুইশত দুঃসাহসী বীর সৈনিক আমার সঙ্গে চলুন। আমি ফটকের সম্মুখে পৌঁছে হাঁক দিয়ে বলব, মুসলমানরা দুর্গের চারদিকে এমনভাবে ছড়িয়ে রয়েছে যে, তাদের দৃষ্টি এড়িয়ে আমার যাওয়া সম্ভব হচ্ছে না। আমাকে দুর্গে ঢুকিয়ে নেয়ার জন্য তারা বক্সগেটটা খুলে দেবে। আপনারা আমার সঙ্গে দুর্গে ঢুকে পড়বেন।'

আবদুল্লাহ ইবনে সা'দ প্রস্তাবে সম্মত হয়ে যান। তিনি দুইশত সৈন্য বাছাই করে নেন। তাদেরকে ঘোড়া থেকে নেমে যাওয়ার নির্দেশ দেন। এক অশ্বারোহীকে আদেশ করেন, তুমি ওদিককার সকল সৈন্যকে বলে আসো, তারা যেন প্রস্তুত থাকে এবং আমাদের আল্লাহু আকবার ধ্বনি শোনামাত্র ফটকের দিকে ছুটে যায়।

অশ্বারোহী সৈনিক বাহিনীর দিকে ছুটে যায়। আবদুল্লাহ ইবনে সা'দ দুশ মুজাহিদকে নিয়ে উক্ত খ্রিস্টানের পিছনে-পিছনে দুর্গ অভিমুখে রওনা হন। সৌভাগ্যক্রমে রাতটা অন্ধকার। চারদিকে ঘুটঘুটে আঁধার। নিজের হাতটা পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না। সৈন্যরা অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে হেঁটে ফটকের নিকট পৌঁছে যায় এবং বক্সগেট থেকে সরে এদিক-ওদিক পাঁচিলের নিচে দাঁড়িয়ে থাকে। খ্রিস্টান লোকটি তিনবার ফটকে করাঘাত করে। ভিতর থেকে এক ব্যক্তি বক্সগেটের একটা পাট খুলে উঁকি দিয়ে তাকায়। খ্রিস্টান গোয়েন্দা ফিসফিস করে বলে- 'মুসলমানরা দুর্গের চারদিকে ছড়িয়ে রয়েছে; তাই ফিরে এলাম। গেট খুলে আমাকে ভেতরে ঢুকতে দাও।'

ভিতরের লোকটি ফটকের প্রহরী। সে ফটকের বক্সগেট খুলে দেয়। খ্রিস্টান গোয়েন্দা ভিতরে প্রবেশ করে। সঙ্গে-সঙ্গে তার পিছনেই আবদুল্লাহ ইবনে সা'দ এবং আরও তিনজন বীর মুসলমান ঢুকে পড়েন। তারা ফটক অতিক্রম করে ভিতরে প্রবেশ করেই তরবারি বের করে পূর্ণশক্তিতে আক্রমণ করে বসে। ফটকের প্রহরী মুসলমানদের দেখে হতভম্ভ হয়ে যায়। সে চিৎকার করে ওঠে- 'মুসলমানরা ঢুকে পড়েছে।'...

'মুসলমানরা দুর্গে ঢুকে পড়েছে!' ডাকটা কানে পৌঁছামাত্র সকল প্রহরী

সতর্ক হয়ে যায়। তারা অন্তত পঞ্চাশজন। সকলে খাপ থেকে তরবারি বের করে হাতে নিয়ে প্রস্তুত হয়ে যায়। মুসলমানরা তাদেরকে তরবারির নিচে কোণঠাসা করে রাখে এবং যে-খ্রিস্টানই তাদের সম্মুখের আসার চেষ্টা করে, তাকেই হত্যা করে ফেলে। মুসলমানরা তাদেরকে হত্যা করতে থাকে এবং শক্তি প্রয়োগ করে পিছন দিকে ঠেলে নিয়ে যেতে থাকে। ইতিমধ্যে বাইরে থেকে আরও মুসলমান ভিতরে ঢুকে পড়ে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়ে।

খ্রিস্টানরাও যুদ্ধ করছে এবং চিৎকারও করে ফিরছে। তাদের বিকট চিৎকারধ্বনিতে রাতের নীরবতা ভেঙে গেছে। হট্টগোলে সমগ্র দুর্গ গুঞ্জরিত হয়ে ওঠে। দশ-পনেরোজন মুসলমান ভিতরে প্রবেশ করার পর দুজন ফটকের তালা ভেঙে ফেলে। এবার ফটক সম্পূর্ণ খুলে যায়। সঙ্গে-সঙ্গে বাইরে সমবেত মুসলমানরা উচ্চৈস্বঃস্বরে আল্লাহু আকবার ধ্বনি দিয়েই তরবারি উঁচু করে হুড়মুড় করে ভিতরে ঢুকে পড়ে।

বিপুলসংখ্যক মুসলমান দুর্গের ভিতরে প্রবেশ করার পর এবার তারা খ্রিস্টান প্রহরীদেরকে নির্বিচারে হত্যা করতে শুরু করে। কয়েক মিনিটে সব কজন প্রহরী মৃত্যুমুখে পতিত হয়। সব কজন প্রহরীকে হত্যা করে মুসলমানরা দুর্গে ছড়িয়ে পড়ে। খ্রিস্টান সৈনিকরা তড়িঘড়ি করে পাঁচিলের উপর থেকে নিচে নেমে আসতে শুরু করে। এসে মুসলমানদের সংখ্যায় কম দেখে তাদের উপর আক্রমণ চালায়। মুসলমানরা অতিশয় সাহসিকতা ও বীরত্বের সঙ্গে আঘাতের-পর-আঘাত করে লাশের-পর-লাশ ফেলতে শুরু করে।

ঘোরতর যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। তরবারিগুলো রাতের অন্ধকারে উত্তোলিত হয়ে-হয়ে যোদ্ধাদের খতম করে চলছে। মাথা কেটে ছিটকে পড়ছে। মস্তকহীন দেহ ধপাস-ধপাস করে মাটিতে লুটিয়ে পড়ছে। রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে। খ্রিস্টানরা হট্টগোল করে ফিরছে। এক মহা বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়ে গেছে। দুশ মুসলমান দূর-দূরান্ত পর্যন্ত দুর্গে ছড়িয়ে পড়েছে। পরম বীরত্বের সঙ্গে জীবনবাজি লড়াই করছে। খ্রিস্টানরাও মুসলমানদের থেকে দুর্গকে রক্ষা করার জন্য পূর্ণশক্তিতে যুদ্ধ করছে। এমন এক পরিস্থিতিতে আসমান-জমিন কাঁপিয়ে আল্লাহু আকবার ধ্বনি তুলে মুসলিম সৈন্যরা বাইরে থেকে স্রোতের মতো দুর্গে ঢুকে পড়ে। অনুপ্রবেশ করেই তারা এদিক-ওদিক ছড়িয়ে খ্রিস্টানদের এমনভাবে হত্যা করতে শুরু করে, যেন তারা মোমের পুতুল আর মুসলমানরা সেই পুতুল নিয়ে খেলা করছে।

খ্রিস্টানরা কিছু সময় শক্তপায়ে দাঁড়িয়ে থাকলেও শেষ পর্যন্ত তাদের পা

উপড়ে যায় এবং জীবন রক্ষা করার জন্য পালাতে শুরু করে। মুসলমানরা ধাওয়া করে-করে তাদের হত্যা করতে শুরু করে। তারা দুর্গের সর্বত্র ছড়িয়ে যায় এবং স্থানে-স্থানে খ্রিস্টানদের লাশের স্তূপ গড়ে তোলে। এহেন বেগতিক অবস্থায় খ্রিস্টানরা চোখে শর্ষে ফুল দেখতে শুরু করে। তারা অস্ত্র ফেলে দিয়ে 'আমান! আমান!' বলে চিৎকার জুড়ে দেয়। মুসলিম বাহিনীর সেনাপতি আব্দুল্লাহ্ ইবনে সা'দ রক্তক্ষয় বন্ধ করে আত্মসমর্পিত খ্রিস্টানদের গ্রেফতার করতে আদেশ করেন। আদেশ পাওয়ামাত্র মুসলিম সৈন্যরা তরবারি কোষবদ্ধ করে খ্রিস্টানদের গ্রেফতার করতে শুরু করে।

ছেচল্লিশ.

সাবতিলা নগরীর খ্রিস্টান অধিবাসীরা যখন জানল, তাদের রাজা মুসলমানদের উপর আক্রমণ করে মিসর ও সিরিয়া দখল করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন, তখন তারা অনেক আনন্দিত হয়েছিল। তারা সরকার ও সম্রাটকে সার্বিকভাবে সাহায্য করেছিল। তাদের ধারণা ছিল, এভাবে তাদের সাম্রাজ্য অনেক বিস্তৃত ও শক্তিশালী হয়ে যাবে। কিন্তু মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে যখন সম্রাট জর্জিরের পরাজয় ঘটল এবং তিনি রণাঙ্গনে নিহত হলেন, তখন তাদের মোহ ভেঙে যায় এবং তারা ভাবনার সাগরে ডুবে যায়। রাজ্য বিস্তৃতির স্বপ্নের পরিবর্তে তারা চোখে অন্ধকার দেখতে শুরু করে। কিন্তু, তার পরও দুর্গের বিশালতা ও দুর্ভেদ্যতায় তাদের অনেক গর্ব ছিল। সে কারণেই তারা মুসলমানদের সন্ধির প্রস্তাব নাকচ করে দেয়। তাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল দু-চার মাস অবরোধ করে রাখার পর বিরক্ত হয়ে মুসলমানরা আপনা থেকেই লেজ গুটিয়ে পালাতে বাধ্য হবে।

কিন্তু দুদিন যেতে-না-যেতেই মুসলমানরা যখন দুর্গে অনুপ্রবেশ করে যখন প্রহরীদের হত্যা করে খ্রিস্টানদের গ্রেফতার করতে শুরু করে, তখন সাধারণ খ্রিস্টানদের মাঝে উৎকণ্ঠা, অস্থিরতা ও হতাশা নেমে আসে। তারা নিশ্চিতভাবে ধরে নেয়, আমরা যখন মুসলমানদের সন্ধি প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছি, এবার তারা মন খুলে প্রতিশোধ গ্রহণ করবে। আমাদেরকে নির্বিচারে হত্যা করবে এবং আমাদের সমুদয় সহায়-সম্পদ লুট করে নেবে। ধর্মীয় উপাসনালয়গুলো গুড়িয়ে দেবে, ঘর-বাড়িতে আগুন দেবে, সুন্দর নগরীটা ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে ফেলবে, নারীদের সম্ভ্রম লুণ্ঠন করবে এবং মেয়েদের দাসী ও ছেলেদের গোলাম বানিয়ে নেবে।

তাদের এই বিশ্বাসের কারণ ছিল, তারা দেখেছে, বিজয়ী খ্রিস্টানরাও এমনটিই করে থাকে। কিন্তু, তারা বিস্মিত হল, যখন ঘোষণা শুনল— 'কারও ঘরে আগুন দেয়া হবে না, কোনো গির্জা-উপাসনালয় ধ্বংস করা হবে না, নারী-বৃদ্ধ-পঙ্গু-রুগ্ন-ধর্মনেতা ও নিরীহ নাগরিকদের হত্যা করা হবে না, কারও সম্পদ লুট করা হবে না। নগরীর প্রতিজন সাধারণ নাগরিক আমাদের পক্ষ থেকে নিরাপত্তা পাবে। যারা দুর্গে থাকতে চাইবে, তাদের থেকে জিযিয়া আদায় করা হবে। যারা জিযিয়া দিতে সম্মত হবে না, তাদেরকে পরিবার-পরিসজনসহ দুর্গ থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সুযোগ দেয়া হবে।'

এ-ঘোষণায় খ্রিস্টানদের অসাড় দেহে প্রাণ ফিরে আসে। তারা মুসলমানদেরকে হিংস্র, অজ্ঞ, অসভ্য, অত্যাচারী, রক্তপিপাসু এবং অধার্মিক মনে করত। মুসলমানদের সম্পর্কে তারা এরূপই শুনেছে। কিন্তু, এই ঘোষণা তাদের ধারণা পালটে দিল। তারা স্বীকার করতে বাধ্য হল, আমাদেরকে ইসলাম ও মুসলমান সম্পর্কে যা-কিছু শোনানো হয়েছিল, সবই মিথ্যা ও অবাস্তব ছিল। মুসলমানরা সত্যিই একটি সুসভ্য জাতি। এই এক ঘোষণায় সাধারণ খ্রিস্টানরা মুসলমানদের অনুরক্ত হয়ে যায়।

সকালবেলা প্রধান পাদরি থেভডোস দলবল নিয়ে আব্দুল্লাহ ইবনে সা'দের নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন— 'আমি শুনেছিলাম, মুসলমান অত্যন্ত নির্দয় ও হিংস্র জাতি; কিন্তু আপনার কর্মনীতি প্রমাণ করল, কট্টর খ্রিস্টানরা আমাদের যা শুনিয়েছে, তা সম্পূর্ণ মিথ্যা ও অবাস্তব। যে-কোনো বিজয়ী জাতি পরাভূতদের পিষ্ট করে ফেলে, সম্পদ লুণ্ঠন করে; নারীদের সম্ভ্রম কেড়ে নেয় এটাই আমরা জানি। আমরাও এমনটিই করে থাকি। কিন্তু, আপনি যে-সভ্যতা, নীতি-আদর্শ ও ধর্মপরায়ণতার প্রমাণ দিলেন, তা ইসলাম ও মুসলমানদের মর্যাদাকে বাড়িয়ে তুলেছে। আপনারা যেভাবে সিরিয়া থেকে সম্রাট হেরাক্লিয়াসের এবং ইরান থেকে অগ্নিপূজকদের শাসনের অবসান ঘটিয়েছেন, আজ তেমনি আফ্রিকার খ্রিস্টান শাসনেরও পতন ঘটল। আফ্রিকা এখন ইসলামী সরকারের অধীন রাজ্য। আমি শাহী গির্জার প্রধান পাদরি। আফ্রিকার প্রতিজন খ্রিস্টান আমাকে সম্মান করে এবং খুশিমনে, গর্বের সঙ্গে আমাকে মান্য করে। এখন আমি সকল খ্রিস্টানের প্রতিনিধি হয়ে আপনার নিকট উপস্থিত হয়েছি। আমি নিজের এবং আফ্রিকার সকল খ্রিস্টানের পক্ষ থেকে আপনাকে নিশ্চয়তা প্রদান করছি যে, আমরা সকলে মুসলমান এবং ইসলামী সরকারের অনুগত ও হিতাকাংখী থাকব।'

আব্দুল্লাহ ইবনে সা'দ বললেন- 'আমি সালতানাতে ইসলামিয়ার পক্ষ থেকে আপনাকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আপনার নিশ্চয় জানা থাকবে, আমরা কখনও আফ্রিকা আক্রমণের ইচ্ছা করিনি। যেহেতু আপনাদের সম্রাট জর্জিরের মাথায়ই আমাদের মিসর-সিরিয়া দখলের ভূত চেপেছিল, ফলে বাধ্য হয়ে আপন ভূখণ্ডের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষার স্বার্থে আমাদেরকে ব্যবস্থা নিতে হল। তিনিই আমাদেরকে এই পর্যন্ত টেনে এনেছেন। অবশেষে নিজে প্রাণ হারালেন। মহান আল্লাহ তার এই রাজ্যটাকে আমাদের হাতে তুলে দিলেন।'

থেভডোস তোশামোদ ও চাটুকারিতা শুরু করেন। বিনয়-বিগলিত কণ্ঠে বললেন- 'আপনি ঠিকই বলছেন। জর্জির মানুষটা ভালো ছিলেন না। অত্যন্ত দাম্ভিক, অহংকারী ও লোভী ছিলেন। তিনি চাইতেন, সমগ্র পৃথিবীতে তার রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাক। মিসর আক্রমণের প্রস্তুতি শুরু করে দিলে আমি তাকে বুঝিয়েছিলাম। বারণ করেছিলাম যে, মুসলমানদের ঘাটাবেন না। ওরা ভিমরুল- না-ঘাটালে শান্ত থাকে; কিন্তু খোঁচা দিলে তার অস্তিত্ব নিঃশেষ করে ছাড়ে। কোনো জাতি আজ পর্যন্ত তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে জয়ী হতে পারেনি। কিন্তু, তিনি আমার কথায় কর্ণপাত করলেন না। অবশেষে পরিণতি যা হওয়ার তা-ই হল।'

ইনি সেই থেভডোস, যিনি মুসলমানদের সবচে বড় অকল্যাণকামী ছিলেন। অন্তর থেকে কামনা করতেন, জর্জির মিসর ও সিরিয়া জয় করে মুসলমানদের নিশ্চিহ্ন করে দিন এবং ধরাপৃষ্ঠ থেকে ইসলামের নাম-চিহ্ন মুছে ফেলুন। এই থেভডোসই নানাভাবে উসকানি ও কুবুদ্ধি দিয়ে-দিয়ে সম্রাট জর্জিরের ধ্বংসের পথ সুগম করেছিলেন। কিন্তু আজ যখন মুসলমানরা আফ্রিকার রাজধানী সাবতিলা দখল করে নিলেন, তখন কিনা ইসলাম ও মুসলমানদের স্তুতি ও জয়গান গাইতে শুরু করলেন। লোকটা অত্যন্ত চাটুকার এবং সুবিধাবাদী মানুষ।

থেভডোস বিগলিতকণ্ঠে জিজ্ঞেস করেন- 'এখন খ্রিস্টানদের জন্য আপনার আদেশ বলুন। আমরা আপনার যে-কোনো আদেশ-নিষেধ মান্য করতে একপায়ে খাড়া আছি।'

ঃ আদেশ তা-ই, যা ঘোষণা করা হয়েছে।

ঃ কখনও এই নগরীর আদমশুমারি হয়নি। হুজুর অনুমতি দিলে জনসংখ্যা অনুমান করে জিযিয়ার অর্থ এনে জমা দিই।

আসলে থেভডোসের মতলবটা হচ্ছে, তিনি মনে করছিলেন মুসলমান সরল-সোজা মানুষ; কিছু ধরিয়ে দিলেই তারা খুশি হয়ে যাবে। নামমাত্র সামান্য অর্থ পরিশোধ করে তিনি দায়মুক্ত হয়ে যাবেন। কিন্তু, তিনি জানতেন না, মুসলমান

সরল তার কাছে, যে নিজে সরল। চালাকের কাছে তারা তার চেয়েও বড় চালাক। কে কেমন মানুষ, কার মতলব কী, মুখের কথায়ই বুঝে ফেলে মুসলমান।

আব্দুল্লাহ ইবনে সা'দ বুঝে ফেললেন, থেভঢোস ধর্মনেতা হওয়া সত্ত্বেও অত্যন্ত চতুর মানুষ। লোকটা আমাকে বোকা ঠাওরাতে চাচ্ছে এবং সামান্য অর্থ পরিশোধ করে দায়মুক্ত হওয়ার মতলব আঁটছে। তিনি বললেন– 'খ্রিস্টান সম্রাট যদি তার রাজধানীর জনসংখ্যা গণনা করতে ব্যর্থ হয়ে থাকেন, তো আমরা তা করে নেব। আমাদের আইন হচ্ছে, যে অমুসলিম নাগরিক আমাদের আনুগত্য মেনে নেয়, তার থেকে বাৎসরিক চার দিনার জিযিয়া আদায় করি। এই জিযিয়া হচ্ছে তার নিরাপত্তা কর। অমুসলিমদের উপর এর বাইরে আর কোনো কর নেই। আমরা নিজেরা জনসংখ্যা গণনা করে এই কর আদায় করব।'

থেভঢোসের কূটকৌশল ব্যর্থ হয়ে যায়। বললেন– 'আপনার যা মর্জি। তবে, আমি আপনার একটি অনুগ্রহ কামনা করি।'

ঃ বলুন।

ঃ হুজুর রাজকুমারীকে জিযিয়া নিয়ে মুক্ত করে দিন।

ঃ এ-বিষয়টি আমার এখতিয়ারের বাইরে। আপনি নিশ্চয় জানেন, রাজকুমারীর পিতা ঘোষণা করেছিলেন, যে-ব্যক্তি মুসলিম সেনাপতির মাথা কেটে আনবে, তার সঙ্গে রাজকুমারীকে বিয়ে দেয়া হবে। বিপরীতে আমিও ঘোষণা করেছিলাম, যে-ব্যক্তি জর্জিরকে হত্যা করবে, তাকে রাজকুমারীকে দান করা হবে আর এক লাখ দিনার পুরস্কার দেয়া হবে। তা ছাড়া আমি স্থির করেছি, তাকে জর্জিরের রাজ্যের গভর্নরও নিযুক্ত করব। জর্জির রণাঙ্গনে মারা গেছেন। এক মুসলমান তাকে হত্যা করেছে, সে-ই রাজকুমারীর মালিক। বারবার ঘোষণা করা সত্ত্বেও এখন পর্যন্ত কেউ জর্জিরকে হত্যা করার দাবি করেনি। আমার বুঝে আসছে না, লোকটা কেন আত্মপ্রকাশ করছে না। তাই আমি রাজকুমারীকে আমাদের খলীফা হযরত ওসমান (রা.)-এর নিকট পাঠিয়ে দেব। তার ব্যাপারে তিনিই ফয়সালা নেবেন।

ঃ তা হলে কি আপনি রাজকুমারীর সঙ্গে আমাকেও দারুল খেলাফত যাওয়ার অনুমতি দেবেন?

ঃ যেতে পারেন।

ঃ আমি আপনার কৃতজ্ঞতা আদায় করছি।

আব্দুল্লাহ ইবনে সা'দ ইবনে ওমরকে জিযিয়া আদায়ের দায়িত্ব অর্পণ করেন। ইবনে ওমর বাড়ি-বাড়ি গিয়ে জনসংখ্যা গণনা করে জিযিয়া উসুল করতে শুরু করেন।

এ-সময়ে মুসলমানরা রাজকোষ, রাজপ্রাসাদ ও অন্যান্য রাজভবনসমূহ দখল

করে নেয়। বিপুল পরিমাণ মালে গনীমত তাদের হস্তগত হয়। পরিমাণটা এত বেশি যে, দেখে মুসলমানরা বিস্মিত হয়ে পড়ে। এত সম্পদ হাতে আসবে, সে আশা তারা করেনি। সেনাপতি আব্দুল্লাহ্ ইবনে সা'দ প্রাপ্ত মালে গনীমত শরীয়ত মোতাবেক মুজাহিদদের মাঝে বন্টন করেন। তার পর রাজ্যের সর্বত্র দখল প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র দল গঠন করে রাজ্যময় প্রেরণ করেন। তারা আফ্রিকার প্রতিটি অঞ্চলে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করে ফেলে।

সাবতিলার পর আর একটি মাত্র দুর্গ অবশিষ্ট ছিল। তার নাম হচ্ছে জুম। জুমের অধিবাসীরা দশ লাখ দিনার জিযিয়া আদায় করে সন্ধি করে নেয়। এভাবে সমগ্র আফ্রিকায় মুসলমানদের দখল প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। মুসলমানদের আফ্রিকাজয় পূর্ণতা লাভ করে।

সাতচল্লিশ.

রূপসীকন্যা রাজকুমারী হেলেন মুসলমানদের হাতে বন্দি। এখন সে মুসলিম নারীদের সঙ্গে বসবাস করছে। হৃদয়ে তার পিতৃহত্যার ব্যথা, রাজ্য হারাবার বেদনা। সর্বোপরি বন্দিত্বের যন্ত্রণা। সারাক্ষণ চিন্তা ও পেরেশানির মধ্য দিয়ে সময় কাটছে তার। সেনাপতি আব্দুল্লাহ্ ইবনে সা'দ হেলেনের এই অবস্থা সম্পর্কে অবহিত। মেয়েটির দুঃখ-বেদনা লাঘবের জন্য তিনি তার সব কটি দাসীকে তার কাছে পাঠিয়ে দেন এবং তার যত মাল-সরঞ্জাম মুসলমানদের হস্তগত হয়েছে, সব তাকে দিয়ে দেন। সাজ-সরঞ্জাম, পোশাক-গয়না, তাঁবু এবং তাঁবুর যাবতীয় মালামাল– মোটকথা, যে-বস্তুটি সম্পর্কে মুসলমানদের ধারণা হয়েছে, এটি রাজকুমারীর হতে পারে, সব তার নিকট পাঠিয়ে দেন। পৃথিবীর ইতিহাসে কোনো জাতি একটি বন্দি মেয়ের সঙ্গে এরূপ উদার আচরণ করেছে বলে প্রমাণ নেই। ইতিহাসের পাতায় এমন কোনো ঘটনা অন্তত আমার চোখে পড়েনি।

রাজকুমারী হেলেনের সমুদয় সম্পদ গনীমতস্বরূপ মুসলমানদের হস্তগত হয়েছিল। কয়েক লাখ দিনার মূল্যের সম্পদ। কিন্তু, মহামূল্যবান এ-সম্পদগুলো পরিত্যাগ করতে তাদের বিন্দুমাত্র কষ্ট হয়নি। রাজকুমারীর মনোরঞ্জনের জন্য সমুদয় সম্পদ তার হাতে তুলে দেয়। এহেন অনুপম সদাচার দেখে হেলেন ভক্তি, শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতায় মুসলমানদের প্রতি অবনত হয়ে পড়ে। তার হৃদয়ে মুসলমানদের শ্রদ্ধা ও ইসলামের মাহাত্ম্য স্থান করে নিতে শুরু করে।

সালমার সঙ্গে এক অন্তরঙ্গ হৃদ্যতা গড়ে উঠেছে হেলেনের। এমন হৃদ্যতা যে, একমুহূর্ত সময়ও সালমাকে ছাড়া থাকতে পারছে না সে। একদিনের ঘটনা।

সাবতিলা জয় করার পর ইসলামী বাহিনী নগরীর বাইরে তাঁবুতে অবস্থান করছে। হেলেন সালমাকে বলল– 'আমার একটা কথা রাখবে সালমা?'

সালমা মুচকি হেসে বলল– 'রাখবার মতো হলে অবশ্যই রাখব।'

হেলেন বিনয়-নম্র কণ্ঠে বলল– 'বলব?'

ঃ বলো।

ঃ আগে ওয়াদা করো, পরে বলব।

ঃ কথা শোনার আগে মান্য করার ওয়াদা করা ঠিক নয়। তবে, আমি তোমাকে নিশ্চয়তা দিচ্ছি, যদি আমার ধর্মীয় চেতনা ও আদর্শ-ঐতিহ্যের পরিপন্থী না হয়, তা হলে অবশ্যই তোমার কথা রাখব।

ঃ আমার ঐকান্তিক কামনা, তুমি আমার পোশাকটা পরিধান করো। একজন আরবকন্যাকে এই পোশাকে কেমন দেখায়, আমি দেখতে চাই।

সালমা মুচকি হেসে বলল– 'বাহ, ভালো সখ তো তোমার!'

হেলেন বিনয়ের সঙ্গে বলল– 'আমার বাসনাটা পূরণ করো সালমা!'

ঃ একটা শর্ত আছে।

ঃ তোমার সব শর্ত মঞ্জুর।

ঃ তুমি আরব মেয়েদের পোশাক পরো। আমি দেখতে চাই, আমাদের পোশাকে তোমাকে কেমন দেখায়।

ঃ ঠিক আছে, আমি সানন্দে তোমার পোশাক পরিধান করব।

সালমা হেসে বলল– 'তা হলে এস, আমি তোমাকে আমার পোশাক পরিয়ে দিই আর তুমি আমাকে তোমার পোশাক পরিয়ে দাও।'

দুই রূপসীকন্যা তাঁবুতে চলে যায়। লুসিয়া ও রাজকুমারীর অন্যান্য সখী-দাসীরা বাইরেই সামিয়ানার নিচে বসে থাকে। মাত্র তিন-চারটি মেয়ে পোশাক পরিবর্তনে সালমা ও হেলেনকে সহযোগিতা করার জন্য তাঁবুতে প্রবেশ করে। কিছুক্ষণ পর উভয় সুন্দরী তাঁবু থেকে বেরিয়ে আসে।

এখন হেলেনের পরনে পরিপূর্ণ আরবি পোশাক। মাথার কালো দীঘল চুলগুলো বেণি করে দুই কাঁধের উপর দিয়ে বুকের উপর ফেলে রেখেছে। আরবি পোশাকে হেলেনকে চমৎকার মানিয়েছে। এখন তাকে পূর্বাপেক্ষা অধিক রূপসী মনে হচ্ছে। আরবি পোশাক তার রূপ-লাবণ্যকে বহুগুণ বাড়িয়ে তুলেছে। এখন রূপের আগুন জ্বলজ্বল করছে রাজকুমারীর গায়ে।

পক্ষান্তরে রাজকুমারীর পোশাকে সালমা যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গে পরিণত হয়েছে। রাজকুমারীর কারুকাজকরা মুক্তাখচিত মহামূল্যবান রেশমি পোশাক সালমার

দেহসমুদ্রে রূপের বান বইয়ে দিয়েছে। বিশেষ করে রাজকুমারীর হীরে-পান্নাখচিত মুকুটটি সালমার চেহারাটাকে চাঁদের চেয়েও উজ্জ্বল করে তুলেছে।

সখী-দাসীরা উভয়কে বিপরীত পোশাকে দেখে বিস্মিত হয়ে পড়ে। দুজনকেই রূপজগতের মূর্তিমান সৌন্দর্য এবং দুনিয়ামাতানো রূপদেবী বলে মনে হচ্ছে। রূপের বিচ্ছুরণ ঘটছে উভয়ের চেহারা থেকে। রাজকুমারী বান্ধবীদের উদ্দেশ করে সালমার প্রতি ইঙ্গিত করে বলল– 'এই, রূপদেবীকে দেখো।'

সালমা মিটিমিটি হেসে বলল– 'আমার আগে আরবের এই চাঁদটাকে দেখো। বিশ্বাস করো হেলেন, আরবি পোশাকে তোমাকে খুবই চমৎকার লাগছে। তুমি এটিই পরিধান করো।'

হেলেন শীতল নিঃশ্বাস ছেড়ে বলল– 'পরব– যদি কেউ বাধ্য করে, তা হলে।'

সালমা কিছু বলতে চাচ্ছিল। এমন সময় সে সম্মুখদিক থেকে কাউকে আসতে দেখে। সহসা তার উচ্ছলতা উবে যায়। হঠাৎ ঘাবড়ে গিয়ে ঝটপট তাঁবুতে ঢুকে যেতে মনস্থ করে। সে চাচ্ছিল না, তার হবু স্বামী, পিতা কিংবা অন্য কোনো মুসলমান তাকে বিজাতির পোশাকে দেখুক। সে জানে, মুসলমানরা একে দূষণীয় মন করে। কিন্তু, হেলেন তাকে বারণ করে বলল– 'একটু থামো সালমা!' অগত্যা সালমা থেমে যায়।

এতক্ষণে সরোয়ার এসে পৌঁছয়। সালমাকে এই পোশাকে দেখে বিস্ময় প্রকাশ করে বলল– 'আজ আমি এ-কী দেখছি সালমা!'

সালমা লজ্জিত হয়ে মাথানত করে বলল– 'রাজকুমারী জোর করে আমাকে এ-পোশাক পরিয়ে দিয়েছে। আমি এক্ষুনি খুলে ফেলছি।'

হেলেন ইতিমধ্যেই জেনে ফেলেছে, সরোয়ার সালমার বাগদত্তা।

সালমা চলে যায়। হেলেন ক্ষুণ্নকণ্ঠে বলল– 'আফসোস! আমাদের পোশাকের প্রতিও ঘৃণা!'

সরোয়ার কোমলকণ্ঠে বলল– 'ঘৃণা নয় রাজকুমারী! ব্যাপারটা হচ্ছে, সব জাতিকেই নিজস্ব পোশাকে ভালো মানায়। যা হোক, সেনাপতি বলে পাঠিয়েছেন আগামী কাল কিছু সৈন্যসহ গনীমতের মালামাল রাজধানীতে প্রেরণ করা হবে। সঙ্গে আপনিও যাবেন। আপনি প্রস্তুত থাকুন।'

হেলেন বলল– 'আমি প্রস্তুত আছি।'

সরোয়ার চলে যায়। হেলেন তার সখী-দাসীদের প্রস্তুত হতে আদেশ করে। সবাই আসর থেকে উঠে যায়। এখন শুধু রাজকুমারী আর তার একনিষ্ঠ বান্ধবী লুসিয়া সেখানে উপবিষ্ট। লুসিয়া বলল– 'এমন কোনো ব্যবস্থা করা যায় না যে, আমাদেরকে দারুল-খেলাফতে যেতে হবে না?'

ঃ এখন তো আমরা স্বাধীন নই; যেতে আমরা বাধ্য।

ঃ হতে পারে, ওখানে নিয়ে মুসলমানরা আপনাকে লাঞ্ছিত করবে।

ঃ আমার ধারণা, এমনটি হবে না। এসবকে মুসলমানরা অন্যায় মনে করে। তারা কোনো নারীকে অপমান করা বৈধ মনে করে না।

ঃ কিন্তু রাজকুমারী, আমার মনে হচ্ছে, মহারাজের মৃত্যু এবং রাজ্য হারাবার বেদনা ছাড়াও আপনার মনে আরও কোনো ব্যথা আছে!

হেলেন চোখ তুলে লুসিয়ার প্রতি তাকিয়ে বলল– 'তুমি জানলে কী করে?'

ঃ ক্ষমা করুন রাজকুমারী, আপনার চেহারা-ই সে-কথা জানিয়ে দিচ্ছে।

হেলেন শীতল দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল– 'তুমি ঠিকই ধরেছ লুসিয়া! আমার হৃদয়ে আরেকটি বেদনা স্থান করে নিয়েছে!

লুসিয়া হেলেনের উজ্জ্বল মুখাবয়বের উপর চোখ নিবদ্ধ করে বলল– 'আর সে-বেদনাটা হচ্ছে ভালবাসার বেদনা।'

ঃ হ্যা, লুসিয়া!

ঃ সরোয়ারকে ভালবাসতে শুরু করেছেন বোধ হয়।

ঃ না।

ঃ তা হলে কে সেই ভাগ্যবান যুবক?

ঃ যদি বলি লুসিয়া, তা হলে তুমি আমাকে ঘৃণা করতে শুরু করবে।

ঃ এই দাসীর কোনোদিন সেই সাহস হবে না। বলুন লোকটা কে?

ঃ লুসিয়া, লোকটি সেই ব্যক্তি, যে আমার সুখের বাগানকে তছনছ করেছে, যার হাতে খোদা আমাকে অনাথ বানিয়েছেন!

লুসিয়া বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে বলল– 'আপনি মহারাজের ঘাতক– আপনার পিতার হন্তারককে ভালবাসেন?'

হেলেন লজ্জামাখা নতমুখে বলল– 'হ্যা লুসিয়া, আমি নিজেকে অনেক তিরস্কার করেছি। কিন্তু, প্রেম কারও শাসন মানে না। আমি আমার পিতার হতভাগা হন্তারককে ভালবাসতে শুরু করেছি। আমি জানি, বিষয়টি আমার জন্য অতিশয় লজ্জাজনক। যে শুনবে, সে-ই আমাকে তিরস্কার করবে। কিন্তু হাজার চেষ্টা করেও আমি তাকে হৃদয় থেকে বের করতে পারছি না। আমার প্রতি তিরস্কারের চোখে দৃষ্টিপাত করো না সখী।

ঃ আজ বুঝলাম ভালবাসা সত্যিই অন্ধ।

ঃ ভালবাসা অন্ধ-ই বটে। লোকটাকে একবার মাত্র দেখেছি। মহারাজকে হত্যা করার পর আমি হত্যার উদ্দেশ্যে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্যত হয়েছিলাম। কিন্তু, তার মায়াবী ও মনকাড়া চেহারাটা দেখামাত্র তার প্রতি মায়া লেগে গেল। সঙ্গে-সঙ্গে আমার তরবারিটা অবনত হয়ে গেল।

ঃ কিন্তু আমার অবাক্ লাগছে, লোকটি কৃতিত্বের পুরস্কার নিতে সেনাপতির নিকট আসল না কেন!

ঃ এর জন্য আমিও বিস্মিত।

ঃ যুদ্ধে মারা গেল না-কি?

ঃ না, তা ঘটেনি।

ঃ তা হলে কোথাও চলে গেছে মনে হয়।

ঃ তা হতে পারে। লুসিয়া, আমি তাকে খুঁজে বের করব। না-পাওয়া পর্যন্ত খুঁজতে থাকব।

আটচল্লিশ.

আফ্রিকা-অভিযান সমাপ্ত হয়েছে। সম্রাট জর্জির মৃত্যুবরণ করেছেন। আফ্রিকার রাজধানী সাবতিলা মুসলমানদের দখলে এসেছে। খ্রিস্টানরা মুসলমানদের আনুগত্য বরণ করে নিয়েছে। কাজেই, এখন এই ভূখন্ডে রাজ্যশাসন ব্যতীত মুসলমানদের আর কোনো কাজ অবশিষ্ট নেই।

মুসলিম বাহিনীর সেনাপতি আব্দুল্লাহ ইবনে সা'দ সাবতিলায় এক হাজার মুজাহিদ রেখে অন্যদের নিয়ে তারাবলিস এসে অবস্থান গ্রহণ করেন। এখানে এসে পৌঁছার পর আরসানুস আব্দুল্লাহ ইবনে সা'দের খেদমতে উপস্থিত হয়ে বলল– 'মহামান্য সেনপতি, রাজকুমারী হেলেন বন্দি হয়ে এখন আপনার হাতে রয়েছে। আপনি জানেন আমি তাকে কত ভালবাসি। যদি মেয়েটাকে আমাকে দিয়ে দেন, তা হলে আমি আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকব। যদি দেন, তা হলে পণ হিসেবে আপনাকে আমি দশ লাখ দিনার দিতে প্রস্তুত আছি।'

আব্দুল্লাহ ইবনে সা'দ বললেন– 'আপনার ব্যথায় আমিও ব্যথিত। কিন্তু, দুঃখজনক হলেও সত্য, আমি আপনার বাসনা পূরণ করতে পারছি না। রাজকুমারী এখন তার, যে তার পিতাকে হত্যা করেছে।

ঃ কিন্তু আপনার বারংবার ঘোষণা সত্ত্বেও তো জর্জিরের ঘাতক এসে দাবি উপস্থাপন করেনি। তাতেই প্রমাণিত হচ্ছে, সে যুদ্ধে মারা গেছে।

ঃ হতে পারে। যদি তা-ই হয়ে থাকে, তা হলে এমতাবস্থায় রাজকুমারীর ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা আমার নেই। আমি তাকে দরবারে-খেলাফতে পাঠিয়ে দেব। এ-ব্যাপারে খলীফা স্বয়ং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।

ঃ কিন্তু আপনি তো আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, রাজকুমারীকে আমার হাতে তুলে দেবেন।

আরসানুসের এই যুক্তি-তর্কে আব্দুল্লাহ ইবনে সা'দ বিরক্তি বোধ করেন। তিনি গলাটা খানিক কঠিন করে আরসানুসের প্রতি চোখ তুলে বললেন– 'আরসানুস, আমি কী বলেছিলাম, শব্দগুলো নিশ্চয়ই তোমার হুবহু মনে থাকবে।'

ঃ হ্যাঁ, আমার মনে আছে।

ঃ বলো দেখি।

ঃ আপনি বলেছিলেন– রাজকুমারী যদি আপত্তি না-করে, তা হলে তাকে আমার হাতে তুলে দেবেন।

ঃ তুমি সত্য বলেছ। আমি এ-কথাই বলেছিলাম।

ঃ তা হলে আমার ব্যাপারে রাজকুমারীকে জিজ্ঞেস করা উচিত। এর বিনিময়ে আপনি যত অর্থ দাবি করবেন, আমি দেব।

ঃ ঠিক আছে, আমি জিজ্ঞেস করব।

আব্দুল্লাহ ইবনে সা'দ রাজকুমারীকে ডেকে পাঠান। আরসানুস মনে-মনে ভাবে, হেলেন খ্রিস্টান মেয়ে। তাই মুসলমানদের নিকট থাকার চেয়ে তার কাছে চলে আসাই শ্রেয় মনে করবে।

অল্পক্ষণের মধ্যেই হেলেন এসে উপস্থিত হয়। আব্দুল্লাহ ইবনে সা'দ বললেন– 'রাজকুমারী, আমি আরসানুসকে ওয়াদা দিয়েছিলাম, যদি রাজকুমারী হেলেন আমার হাতে গ্রেফতার হয়, তা হলে তাকে তার হাতে তুলে দেব।'

হেলেন কথা কেটে বলল– 'আমি সম্মত না-হলেও তা করবেন বলে ওয়াদা দিয়েছেন?'

ঃ না। শর্ত ছিল, যদি রাজকুমারী সম্মত হয়, তা হলে এমনটি করব।

ঃ আমি সম্মত নই। রাজকুমারী সোজা-সাপটা উত্তর দেয়।

আরসানুস বিস্মিতচোখে হেলেনের প্রতি দৃষ্টিপাত করে বলল– 'আপনি কি খ্রিস্টানদের চেয়ে মুসলমানদের ভালো মনে করেন?'

ঃ নরাধম, কাপুরুষ, বিলাসী খ্রিস্টানদের চেয়ে মুসলমানরা বহু-বহু গুণ ভালো। আর তুমি আরসানুস, জাতির বিশ্বাসঘাতক। যে-কোনো আত্মমর্যাদাসম্পন্ন খ্রিস্টান মেয়ে তোমাকে থুতু ছিটাবে।

আরসানুস ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। সে কঠিন ভাষায় বলল– 'মুখরা মেয়ে! এজন্যই তো খোদা ও যিশু রুষ্ট হয়ে তোমাকে অপদস্ত করেছেন, তোমাকে রাজকুমারী থেকে দাসীতে পরিণত করেছেন।'

আরসানুসের এ-বক্তব্যে হেলেন ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। রাগে তার চেহারা লাল হয়ে যায়। রোষকষায়িত বড়-বড় চোখে আরসানুসের প্রতি তাকাতে থাকে। কিন্তু, হেলেন কিছু বলবার আগেই আব্দুল্লাহ ইবনে সা'দ আরসানুসকে উদ্দেশ করে বলে ওঠেন– 'আরসানুস, সভ্যতা-ভদ্রতা শেখো। তুমি একজন সম্মানিতা খ্রিস্টান নারীকে শুধু অপমানিতই করছ না– তার মনে কষ্টও দিচ্ছ। তোমার স্মরণ রাখা উচিত, হেলেন রাজকুমারী এবং মুসলমানরা তাকে ঠিক সে-রকম শ্রদ্ধা করে থাকে, যেমনটি খ্রিস্টানরা করত।'

এবার হেলেন খানিক নরমসুরে বলল– 'আরসানুস, তুমি একজন বিজয়ী সেনাপতির বক্তব্য ও ভাষা শুনেছ। ইনি সেই জাতির একজন শাসক ও সেনাপতি, যাদেরকে আমরা হিংস্র, অসভ্য ইত্যাদি মন্দ অভিধায় ভূষিত করে থাকি। আর তোমরা সুসভ্য ও দয়ালু জাতির দাবিদার। এবার মুসলমানদের সঙ্গে নিজেদের তুলনা করো। আমি মুসলমানদের মাঝে এসে পৌঁছানোর পরক্ষণ থেকেই অধ্যাবধি তারা আমার যথাযথ মর্যাদাদানে কোনো ত্রুটি করেনি। ঠিক একজন রাজকুমারীরই ন্যায় তারা আমাকে শ্রদ্ধা করে থাকে। মুসলিম মেয়েরা আমাকে অত্যন্ত সম্মানের চোখে দেখে থাকে। তাদের মাঝে আমি অনেক সুখে দিন কাটাচ্ছি। এখানে তুমিই একমাত্র ব্যক্তি, যে আমার সঙ্গে অপমানজনক আচরণ করেছে। আমার শক্তি অবশিষ্ট থাকলে তুমি কখনও আমার সঙ্গে এরূপ ভাষা ব্যবহার করতে না।' বলেই হেলেন ক্ষুণ্নমনে বসে থাকে।

আব্দুল্লাহ ইবনে সা'দ বললেন– 'রাজকুমারী, তুমি আমাদের অতিথি। তোমার অপমানকে আমরা আমাদেরই অপমান মনে করি। আরসানুস শুধু তোমাকে অপমান করেনি– আমাদেরও করেছে। এর জন্য তাকে জবাবদিহি করতে হবে।' তিনি আরসানুসের প্রতি মুখ করে কঠোর ভাষায় বললেন– 'বলো, কেন তুমি রাজকুমারীকে অপমান করেছ? কেন তার মনে কষ্ট দিয়েছ?'

আরসানুস বলল– 'আমাকে ক্ষমা করুন, আমার ভুল হয়ে গেছে।'

ঃ এই ভুলের ক্ষমা তোমাকে রাজকুমারী থেকে নিতে হবে।

আরসানুস রাজকুমারীকে উদ্দেশ করে বলল– 'সম্মানিতা রাজকুমারী, আমি আমার ভুলের জন্য ক্ষমা চাচ্ছি। রাগের মাথায় যা বলেছি, ক্ষমা করে দিন।'

ঃ শোনো আরসানুস, মুসলমানদের নিকট থেকে আমাদের জাতির সভ্যতা ও ভদ্রতার পাঠ শিক্ষা করা উচিত। নারীকে যে-মর্যাদা ইসলাম দান করেছে, তা অন্য কোনো জাতি দেয়নি। নারীজাতি ইসলামের যতই কৃতজ্ঞতা আদায় করুক, তা কমই হবে। আমি তোমাকে ইসলাম ও মুসলমানদের খাতিরে ক্ষমা করে দিলাম।'

ঃ আমি আপনার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

আব্দুল্লাহ ইবনে সা'দ রাজকুমারীকে জিজ্ঞেস করেন– 'তা হলে কি আপনি আরসানুসের সঙ্গে যেতে সম্মত নন?'

ঃ কক্ষনো নয়। এখন আর আমার খ্রিস্টানদের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই। আমার ব্যক্তিসত্ত্বা মুসলমানদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেছে। আমি সজ্ঞানে মুসলমানদের সঙ্গে থাকবার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি।'

আরসানুস বলল– 'তা আপনি বিজাতিদের মাঝে থাকবেন কীভাবে?'

ঃ তুমি জান না আরসানুস, যদি দেখতে মুসলিম নারীরা আমার সঙ্গে কীরূপ সদয় ও সশ্রদ্ধ আচরণ করছে, আমার কীরূপ মনোরঞ্জন করছে; তা হলে তোমাকে বলে বোঝাতে হত না তাদের সঙ্গ আমার জন্য এক অপ্রত্যাশিত নেয়ামত। সত্য হচ্ছে, মুসলিম নারীদের উত্তম চরিত্র আমার হৃদয় জয় করে নিয়েছে।

ঃ এ খ্রিস্টানদের দুর্ভাগ্য।

ঃ খ্রিস্টানদের ভাগ্য সেদিনই বদলে গিয়েছিল, যেদিন তাদের সম্রাট শান্তির জগতকে লণ্ডভণ্ড করে মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

আব্দুল্লাহ্ ইবনে সা'দ বললেন– 'আরসানুস, আমি আমার প্রতিশ্রুতি পূরণ করেছি। রাজকুমারী তোমার সঙ্গে যেতে সম্মত নয়।'

আরসানুস বলল– 'একজন খ্রিস্টান রাজকুমারী খ্রিস্টানদের পরিবর্তে মুসলমানদের মাঝে জীবনযাপন করা শ্রেয় জ্ঞান করবে, তা আমার কল্পনায় ছিল না। সে যাই হোক, এবার আমি আপনার সমীপে আরেকটি নিবেদন পেশ করতে চাই।'

ঃ বলো।

ঃ আপনি পণ নিয়ে রাজকুমারীকে মুক্তি দিয়ে দিন। যত বড় অঙ্ক খুশি দাবি করুন; আমি আদায় করে দেব। দশ লাখ দিনার তো আমি বলেছি। কিন্তু পঞ্চাশ লাখ দিনার দিতেও আমি প্রস্তুত আছি।

ঃ এক কোটি দিনার দিলেও আমি এ-কাজ করতে পারব না।

ঃ আপনি রাজকুমারীর সমপরিমাণ ওজনের সোনা মেপে নিয়ে তাকে মুক্তি দিন।

ঃ তুমি আমাকে দুনিয়ার প্রলোভন দেখাচ্ছ। কিন্তু, তুমি জানো না, নীতি-নৈতিকতার প্রশ্নে মুসলমানের নিকট দুনিয়া এবং দুনিয়ার সম্পদের কোনোই মূল্য নেই। একজন মানুষকে আল্লাহ্ থেকে দূরে সরিয়ে ফেলার এবং তাকে পাপের পথে পরিচালিত করার জন্য যদি কোনো বস্তু থাকে, তো সে হচ্ছে ঐশ্বর্য। বিত্তবানরা অধিকাংশই বিভ্রান্ত হয়ে যায়। সে-কারণেই আমাদের নবীজি (সা.) সম্পদকে উপেক্ষা করে চলেছেন। আমরা মুসলমানরাও সম্পদকে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করি না। তুমি আমাকে অযথা লোভ দেখাচ্ছ।

এবার আরসানুস নিরাশ হয়ে যায়। সে উঠে সোজা যাবিলার উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যায়। তার বাহিনীটিও তার সঙ্গে চলে যায়।

আরসানুস চলে যাওয়ার পর আব্দুল্লাহ্ ইবনে সা'দ রাজকুমারীকে জিজ্ঞেস করেন– 'এখানে আপনার কোনো কষ্ট হচ্ছে না তো?'

রাজকুমারী ভক্তি-গদগদ-চিত্তে উত্তর দেয়– 'না, আমার কোনো কষ্ট হচ্ছে না; আমি মুসলমানদের প্রতি কৃতজ্ঞ।'

আবদুল্লাহ্ ইবনে সাদ' বললেন– 'আগামী কাল আপনি বাহিনীর সঙ্গে মদীনা যাবেন। যদি কিছু বলবার থাকে নিঃসংকোচে বলতে পারেন।'

হেলেন বলল– 'আমার কিছু বলবার নেই। আমি আপনার অশেষ দয়ার কৃতজ্ঞতা আদায় করছি।'

আবদুল্লাহ্ ইবনে সা'দ বললেন– 'তা হলে এখন যান, বিশ্রাম করুন।'

রাজকুমারী উঠে চলে যায়। বান্ধবী লুসিয়াকে আলোচনাটি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে শোনায়। লুসিয়া বলল– 'আরসানুস ভালো মানুষ নয়, সে আমিও জানি। কিন্তু রাজকুমারী, যেমনই হোক স্বজাতির কাছে থেকে যাওয়া কি কল্যাণকর হত না?'

হেলেন বলল– 'ও দাগাবাজ, বিশ্বাসঘাতক। ওর সঙ্গে থাকার চেয়ে মুসলমানদের সঙ্গে থাকা অনেক-অনেক ভালো।'

লুসিয়া নীরব হয়ে যায়।

মুসলিম বাহিনীর যে-অংশটি আব্দুল্লাহ্ ইবনে সা'দের সাহায্যার্থে মদীনা থেকে এসেছিল, তারা পরদিন ভোর-ভোর রাজকুমারী হেলেন ও গনীমতের পঞ্চমাংশ নিয়ে দারুল খেলাফত মদীনার উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যায়।

উনপঞ্চাশ.

বিজয়ী মুসলিম বাহিনী মিসর হয়ে হেজাজ গিয়ে পৌঁছয় এবং অতিদ্রুত পবিত্র নগরী মদীনার সন্নিকটে গিয়ে উপনীত হয়। সে-যুগের রাজা-বাদশাহদের নিয়ম ছিল, তারা যখন রাজ্য জয় করে প্রত্যাবর্তন করত, তখন স্বদেশের রাজধানীতে প্রবেশের সময় আপন শক্তি ও মর্যাদা প্রদর্শনের লক্ষ্যে বিজিত রাজ্য থেকে লুট করে আনা সমুদয় সম্পদ-সামগ্রী প্রদর্শন করত। বিশেষ করে বন্দিদেরকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে বিশেষ গুরুত্ব সহকারে দেখানো হত। দুর্ভাগ্যবশত, যদি কোনো রাজকুমার কিংবা রাজকুমারী গ্রেফতার হত, লাঞ্ছিত করার উদ্দেশ্যে শিকল পরিয়ে তাদেরকে দাস-দাসীর মতো হেঁচড়ানো হত।

রাজকুমারী হেলেন ও লুসিয়ার মনে ভয় ধরে গিয়েছিল, চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী মুসলমানরা তাদেরকে প্রকাশ্য রাজপথ দিয়ে দাসীদের মতো নিয়ে লাঞ্ছিত করে কি-না। তারা সালমার নিকট এই আশঙ্কার কথা ব্যক্তও করেছিল। সালমা তাদের অভয় দিয়েছিল, এ-জাতীয় আচরণকে মুসলমানরা অন্যায় মনে করে। ইসলামের আইন হচ্ছে, কোনো সম্মানিত ব্যক্তি গ্রেফতার হয়ে আসলে তাদেরকে তার পদমর্যাদা অনুপাতে সম্মানের সঙ্গেই রাখতে হবে। সালমার বক্তব্যে হেলেন নিশ্চিন্ত হয়েছিল। এখন তার সালমার এই দাবির বাস্তবতা দেখার পালা।

মদীনার অধিবাসীরা বাহিনীর প্রত্যাগমনের সংবাদ শুনে তাদের স্বাগত জানানোর জন্য দলে-দলে ছুটতে শুরু করেছে। তারা আল্লাহু আকবার ধ্বনি তুলে উল্লাস শুরু করে দেয়। রাজকুমারী হেলেন একজন রাজকুমারীর মতোই ঘোড়ার পিঠে বসে আছে। তার পরিধানে রাজকীয় পোশাক। মদীনার মুসলমানরা ছুটে এসে মুজাহিদদের সঙ্গে অতিশয় হৃদ্যতাপূর্ণ ভঙ্গিতে আলিঙ্গনাবদ্ধ হচ্ছে। দেখে হেলেন অবাক্ হয় যে, তাদের দেশে তো ভাইও ভাইয়ের সঙ্গে এত আন্তরিকভাবে মিলিত হয় না!

এতক্ষণে সকল মুজাহিদ ঘোড়ার পিঠ থেকে নিচে নেমে এসেছে। তারা মদীনার মুসলমানদের সঙ্গে সালাম-মুসাফাহা বিনিময় করতে-করতে যখন মসজিদে নববীর সম্মুখস্ত চত্বরে গিয়ে উপস্থিত হয়, তখন বেলা দ্বিপ্রহর। জোহর নামায আদায় করে বেশকিছু লোক এই চত্বরে বসে আহার করছে। আমীরুল মুমিনীন হযরত ওসমানও (রা.) তাদের মাঝে উপস্থিত রয়েছেন। তিনিও সর্বসাধারণের সঙ্গে বসে আহার করছেন।

বাহিনীটি এসে একধারে দাঁড়িয়ে যায়। তাদের অভ্যর্থনাকারীরাও চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। রাজকুমারী হেলেন যখন জানতে পারে, প্রবল প্রতাপশালী মুসলিম সম্রাট– যাঁর ভয়ে বিশ্বের অন্যসব ক্ষমতাধর রাজরাজড়াগণ থরথর করে কাঁপেন– সাধারণ লোকদের সঙ্গে বসে আহার করছেন, তো সে বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে যায়।

কিছুক্ষণের মধ্যে সকলের খাওয়া শেষ হয়ে যায়। তারা যে-বিছানায় বসে আহার করছিল, সেটি পরিষ্কার করা হয়। খলীফাতুল মুসলিমীন হযরত ওসমান (রা.) তার উপর বসেই বৈঠক শুরু করেন। তিনি হযরত আলী, তালহা, যুবাইর এবং আমর ইবনুল আসকে (রা.) ডেকে পাঠান। হযরত হাসান, হুসাইন, ইবনে ওমর, ইবনে আব্বাস, ইবনে জাফর, ইবনে যুবাইর, সরোয়ার ও হাবীব (রা.) খলীফার কাছে এসে উপবেশন করেন।

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বললেন– 'আমরা খলীফাকে আফ্রিকাজয়ের সুসংবাদ জানাচ্ছি। আফ্রিকার উপর মুসলমানদের দখল প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। আমরা আপনার দরবারে বিজয়ের সুসংবাদ এবং গনীমতের মালামাল নিয়ে হাজির হয়েছি।'

এই শুভসংবাদে সকল মুসলমান যারপরনাই আনন্দিত হয়। সবচে বেশি উৎফুল্ল হন খলীফা হযরত ওসমান (রা.)। তিনি সঙ্গে-সঙ্গে কিবলামুখী হয়ে সিজদায় লুটিয়ে পড়েন এবং মহান আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া আদায় করেন। খলীফা সিজদা থেকে মাথা তুলে বললেন– 'মহান আল্লাহর অনেক-অনেক শোকর যে, তিনি বিশাল একটি সাম্রাজ্যকে মুসলমানদের হাতে তুলে দিয়েছেন। আচ্ছা, আব্দুল্লাহ ইবনে সা'দ কি কোনো পত্র দিয়েছেন?'

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর জামার পকেট থেকে একখানা পত্র বের করে খলীফার প্রতি এগিয়ে ধরে বললেন– 'জি, তিনি এই পত্রখানা দিয়েছেন।'

হযরত ওসমান (রা.) পত্রখানা হাতে নেন। পাতলা চামড়ায় লেখা পত্র। তিনি ভাঁজ খুলে পত্রখানা উচ্চৈঃস্বরে পড়তে শুরু করেন–

'মিসরের গভর্নর আব্দুল্লাহ ইবনে সা'দের পক্ষ থেকে খলীফাতুল মুসলিমীন হযরত ওসমান ইবনে আফফানের প্রতি। হাম্‌দ ও সালাতের পর বিনীত নিবেদন, মহান আল্লাহ সাহায্য প্রদান করে মুসলমানদের মহাবিজয় দান করেছেন। আফ্রিকার সম্রাট জর্জির যুদ্ধক্ষেত্রে মারা গেছেন। তার অতিশয় রূপসীকন্যা হেলেন আমাদের হাতে বন্দি হয়েছে। মেয়েটির পিতা তথা সম্রাট জর্জির ঘোষণা করেছিলেন, যে-খৃস্টান মুসলিম সেনাপতির মাথা কেটে আনবে, তার সঙ্গে তাকে বিয়ে দেবেন। ইবনে যুবাইরের পরামর্শে আমিও পালটা ঘোষণা দিয়েছিলাম, যে-মুসলমান জর্জিরকে হত্যা করবে, রাজকুমারী হেলেনকে তাকে দান করা হবে এবং এক লাখ দিনার পুরস্কার দেয়া হবে। জর্জিরকে কোনো-না-কোনো মুসলমান হত্যা করেছে। কিন্তু, বারবার ঘোষণা দেয়া সত্ত্বেও পুরস্কার নিতে কেউ আসেনি। আমি রাজকুমারী ও তার সখী-দাসীদেরকে আপনার নিকট পাঠিয়ে দিলাম। এদের ব্যাপারে আপনি যথাযথ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। আর গনীমতের মালামালের সঙ্গে পুরস্কারের এক লাখ দিনারও দিয়ে দিলাম।'

পত্রের বিবরণ শুনে মুসলমানগণ বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে যায়। এ-ধরনের ঘটনা এর আগে তারা কখনও শোনেনি।

হযরত ওসমান (রা.) বললেন– 'রাজকুমারী কোথায়?'

ইবনে ওমর বললেন– 'বাহিনীর সঙ্গে আছে।'

হযরত ওসমান বললেন– 'তাকে এখানে নিয়ে আসো।'

সঙ্গে-সঙ্গে এক অশ্বারোহী ছুটে গিয়ে রাজকুমারী হেলেনকে দরবারে নিয়ে আসে। রাজকুমারীকে আসতে দেখে হযরত ওসমান (রা.) বলতে-বলতে ওঠে দাঁড়ান– 'আমাদের নবীজি (সা.) বলেছেন, কোনো জাতি বা সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় কেউ বন্দি হয়ে আসলে তাকে শ্রদ্ধা জানাবে।'

শুনে সকল মুসলমান উঠে দাঁড়ায়। হেলেন তার রূপের ছটায় আরব মুসলমানদের সমাবেশকে আলোকিত করতে-করতে এগিয়ে আসে। তাকে খলীফাতুল মুসলিমীন হযরত ওসমান (রা.)-এর সম্মুখে এনে দাঁড় করানো হয়। হযরত ওসমান (রা.) স্নেহমাখা কণ্ঠে বললেন– 'বস।'

হেলেন বুঝে ফেলে, এই লোকটিই মুসলমানদের খলীফা। সে অত্যন্ত আদব ও শ্রদ্ধার সঙ্গে খলীফাকে সালাম করে। হযরত ওসমান (রা.) সালামের উত্তর দিয়ে বসে

পড়েন। রাজকুমারীও বসে পড়ে। অন্য সকল মুসলমানও বসে পড়ে। হযরত ওসমান (রা.) রাজকুমারীকে জিজ্ঞেস করেন– 'পথে তোমার কোনো কষ্ট হয়নি তো?'

হেলেন ভক্তিপূর্ণ মিষ্টি-মোলায়েম কণ্ঠে বলল– 'না, আমি মুসলমানদের প্রতি অনেক-অনেক কৃতজ্ঞতা জানাই। তারা আমাকে অনেক যত্নের সঙ্গে এনেছে।'

ঃ আমি জানি, তোমার হৃদয় বেদনায় ভারাক্রান্ত। কিন্তু, তাতে আমাদের কোনো অপরাধ নেই। আমরা তোমাদের দেশ আক্রমণ করিনি। তোমার পিতাই বরং গায়ে পড়ে যুদ্ধ বাঁধিয়েছিলেন।

ঃ আমি তা স্বীকার করি।

ঃ আমি তোমাকে এক্ষুনি মুক্তি দিয়ে দিতাম রাজকুমারী। কিন্তু একটা কারণে পারছি না। ইসলামী বাহিনীর সেনাপতি ঘোষণা করেছিলেন, যে-ব্যক্তি আফ্রিকার সম্রাট জর্জিরকে হত্যা করবে, তাকে আফ্রিকার রাজকুমারীকে পুরস্কারস্বরূপ দান করা হবে। সে-কারণে তুমি এখন তার, যে তোমার পিতাকে হত্যা করার মতো বীরত্বপূর্ণ কাজটি করেছে।

ঃ কিন্তু সেনাপতির বারবার ঘোষণা সত্ত্বেও তো কেউ আমার পিতার ঘাতক হওয়ার দাবি নিয়ে আসেনি!

ঃ আমি জানি। আমি মুসলমানদের স্বভাব-চরিত্র সম্পর্কে অবহিত। আমার মনে হচ্ছে, বীরত্বের জন্য মানুষ তাকে বাহবা দেবে বলেই সে আত্মপ্রকাশ করছে না। আচ্ছা, তুমি কি আমাকে একটু সহযোগিতা করতে পার?

ঃ বলুন।

ঃ তুমি কি দেখলে তাকে চিনবে?

ঃ হ্যা, চিনব।

ঃ তা হলে দেখো তো, সেই লোকটি এদের মাঝে আছে কি-না।

হেলেন মজলিসে উপস্থিত হওয়া অবধি হযরত ওসমান (রা.)-এর প্রতি মুখ করেই কথা বলছিল। কিন্তু, এবার যখন তার উপর নিজ পিতার ঘাতককে খুঁজে বের করার দায়িত্ব অর্পিত হল, তখন উঠে দাঁড়িয়ে সে বিমুগ্ধচোখে প্রচণ্ড কৌতূহলী দৃষ্টিতে চারদিকে তাকাতে শুরু করল।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর তার নিকটেই বসা ছিলেন। তিনি শঙ্কিত হয়ে পড়েন, রাজকুমারী তাকে দেখে না ফেলে। তাই তিনি দুই হাঁটুর মাঝে মাথা গুঁজিয়ে বসে থাকেন।

রাজকুমারী এক-এক করে প্রত্যেকের চেহারায় চোখ ফেলছে। হঠাৎ হযরত ওসমান (রা.)-এর দৃষ্টি জড়সড় হয়ে উপবিষ্ট ইবনে যুবাইরের উপর নিবদ্ধ হয়। তাঁর মনে প্রশ্ন জাগে, ছেলেটা এভাবে বসে আছে কেন? অসুখ-টসুখ হয়েছে না-কি? না-কি মন ভালো নেই?

আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর প্রথম খলীফা হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রা.)-এর কন্যা হযরত আসমার পুত্র। হযরত আসমা (রা.) অতিশয় রূপসী নারী ছিলেন। তাঁর পুত্র আব্দুল্লাহও অত্যন্ত সুদর্শন যুবক। হযরত ওসমান (রা.) ডেকে দিয়ে বললেন– 'কী ব্যাপার নাতি, শরীরটা খারাপ না-কি?'

ইবনে যুবাইর মাথা তুলে খলীফার প্রতি তাকিয়ে বললেন– 'না, আমীরুল মুমিনীন, আল্লাহর ফজলে আমি সুস্থ্যই আছি।'

ঠিক এ-সময়ে রাজকুমারীর সন্ধানী চোখ ইবনে যুবাইরের উপর পতিত হয়। অমনি সে অঙ্গুলিনির্দেশ করে বলে ওঠে– 'এই তো! এই ইনি আমার পিতাকে হত্যা করেছেন!'

এই সেই ভাগ্যবান বীরপুরুষ, যাকে একনজর দেখার জন্য সবাই উদগ্রীব হয়ে আছে। সহসা মজলিসের সবগুলো চোখ একসঙ্গে ইবনে যুবাইরের উপর নিবদ্ধ হয়।

রাজকুমারী বসে পড়ে।

হযরতে ওসমান (রা.) জিজ্ঞেস করেন– 'কী আবদুল্লাহ, তুমি কি সম্রাট জর্জিরকে হত্যা করেছ?'

আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর বললেন– 'জি আমীরুল মুমিনীন!'

ঃ কিন্তু সেনাপতি আব্দুল্লাহ ইবনে সা'দ যখন তোমাকে তলব করেছিলেন, তখন তার নিকট গেলে না কেন?

ঃ আমার আত্মপ্রকাশ না-করার দু'টি কারণ ছিল আমিরুল মুমিনীন। প্রথমত, আমি জর্জিরকে কোনো পুরস্কারের লোভে হত্যা করিনি। বরং তার ইসলামবিরোধিতা তাকে হত্যা করতে আমাকে উৎসাহিত করেছে। আল্লাহর শোকর যে, আমার তরবারি ইসলাম ও মুসলমানদের শত্রুটিকে খতম করতে সক্ষম হয়েছে। আত্মপ্রকাশ করলে মানুষ নির্ঘাত মনে করত, আমি রূপসী রাজকুমারীকে পাওয়ার লোভে কাজটি করেছি। অথচ, আমার লক্ষ্য আল্লাহর সন্তুষ্টি ছাড়া অন্যকিছু ছিল না। দ্বিতীয়ত, আমি যে-মেয়েটির পিতাকে হত্যা করেছি, সে আমার সংসারে এসে সুখী হতে পারে না। আমার দর্শন তাকে আজীবনই ব্যথিত করে চলবে। মেয়েটির দাম্পত্যজীবন সুখময় হবে না।

আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইরের বক্তব্যে সকলে বিস্মিত হয়ে পড়ে। তাঁর এই ঈমান-আলোকিত বক্তব্য স্বয়ং রাজকুমারীকেও দারুণ প্রভাবিত করে।

রাজকুমারী বলল– 'যা শুনলাম, তা নিরতিশয় বিস্ময়করই বটে। তবে, আমার কাছে তার চেয়ে বেশি বিস্ময়কর লাগছে, প্রকৃত দাবিদার যখন আত্মপ্রকাশ করল না, তখন অন্য কেউ তো মিথ্যা দাবি উত্থাপন করতে পারত। কিন্তু তাও তো কেউ করল না। আসলে মুসলমান প্রকৃত অর্থেই ধর্মপরায়ণ এবং পবিত্র মানুষ আর ইসলামই খোদার একমাত্র মনোনীত ধর্ম। আমার হৃদয়ে কোনোদিনও এই ভাবনা জাগেনি যে, আমি ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হব। কিন্তু, আজ আমি অকপটে বিশ্বাস করছি, জগতে ইসলাম ব্যতীত আর কোনো

সত্য ধর্ম নেই। আমীরুল মুমিনীন, আপনি আমাকে মুসলমান বানিয়ে নিন।'

রাজকুমারীর বক্তব্যে মুসলমানদের মাঝে আনন্দের বন্যা বয়ে যায়। সকলে আল্লাহু আকবার ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে তোলে। তখনই হযরত ওসমান (রা.) কালেমা তায়্যেবা পাঠ করিয়ে আফ্রিকার রাজকুমারী হেলেনকে ইসলামে দীক্ষিত করে নেন। হেলেন জীবনে এই প্রথমবারের মতো পাঠ করে– লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।

হযরত ওসমান (রা.) বললেন– 'বলো বেটি, তুমি কি এই যুবক ইবনে যুবাইরের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হতে সম্মত আছ?'

হেলেন আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইরের প্রতি আঁড়চোখে একপলক দৃষ্টিপাত করে বলল– 'আপনি যা আদেশ করবেন, আমি অকপটহৃদয়ে তা মেনে নেব।'

হযরত ওসমান (রা.) বললেন– 'কিন্তু, ইসলামের আইনে কনের সম্মতি ছাড়া বিবাহ শুদ্ধ হয় না। তুমি সজ্ঞানে, আনন্দচিত্তে সম্মতি দিলেই তবে এই বিবাহ হবে– অন্যথায় নয়। অসম্মতি জ্ঞাপনেরও পূর্ণ অধিকার তোমার রয়েছে। তখন যাকে পছন্দ হবে, তার সঙ্গে তোমার বিয়ে হবে।'

হেলেন বলল– 'আমি সম্মত আছি।' বলেই লজ্জায় মাথাটা নত করে ফেলে।

এই মজলিসেই রাজকুমারী হেলেন ও আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইরের বিবাহ সম্পন্ন হয়ে যায়। হযরত ওসমান হেলেনের সমুদয় মালামাল– যার মূল্য কয়েক লাখ দিনার ছিল– তাকে দিয়ে দেন। আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইরকে ঘোষিত এক লাখ দিনার পুরস্কারও প্রদান করেন। অবশিষ্ট মালে-গনীমত মদীনার অধিবাসীদের মাঝে বণ্টন করে দেন।

বৈঠক মুলতবি হয়ে যায়। সকল মুজাহিদ ও মদীনাবাসী যার-যার গৃহে চলে যায়।

আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর চাঁদের মতো সুন্দর বউটিকে সঙ্গে করে ঘরে ফিরে যান। তার মা হযরত আসমা এমন একটি পুত্রবধূকে পেয়ে খুশিতে বাগবাগ হয়ে পড়েন। আফ্রিকার দুলহানকে একনজর দেখার জন্য মদীনার নারীরা ইবনে যুবাইরের বাড়িতে আছড়ে পড়ে। বিদেশি নতুন বউটির রূপ দেখে তারা বিমুগ্ধ-বিমোহিত হয়ে পড়ে।

হেলেনের বান্ধবী লুসিয়া ও অন্যান্য সখী-দাসীরাও মুসলমান হয়ে যায়। আমীরুল মুমিনীন হযরত ওসমান (রা.) তাদের প্রত্যেকের জন্য বর জুটিয়ে দেন।

দিনকয়েক অতিক্রান্ত হওয়ার পর রূপসীকন্যা সালমা ও সরোয়ারের বিয়ে সম্পন্ন হয়।

ইতিহাসের পাতায় জ্বলজ্বল করে ওঠে মুসলমানদের অনুপম বীরত্বগাঁথার আরেকটি নতুন অধ্যায়। রচিত হয় আফ্রিকার রাজপ্রাসাদে ইসলামের বিজয় পতাকা সমুন্নত করার স্বর্ণালি কাহিনী।

[সমাপ্ত]

মুসলমানদের মিসর-সিরিয়া দখল করার খুন চাপে আফ্রিকার বলদর্পী খৃস্টান সম্রাট জর্জিরের মাথায়। তথ্যটা যথাসময়ে পৌঁছে যায় মিসরের গবর্নর প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সা'দ-এর কানে। জর্জিরকে ভালো একটা কানমলা দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তিনি। খলীফা হযরত ওসমান (রা.)-এর অনুমোদন নিয়ে অভিযানে বেরিয়ে পড়েন জর্জিরের মুসমানদের সার্বভৌমত্বে আঘাত হানার স্বপ্নসাধ মিটিয়ে দিতে। একে একে আফ্রিকার দু'টি গুরুত্বপূর্ণ দুর্ভেদ্য দুর্গ জয় করে মুখোমুখি হন দাম্ভিক সম্রাট জর্জিরের। দু'দিনের যুদ্ধে জর্জিরের বিশাল বাহিনী প্রচন্ড মার খায় মুসলমানদের হাতে। আসন্ন পরাজয় ঠেকাতে জর্জির ঘোষণা দেন, যে ব্যক্তি মুসলিম সেনাপতির মাথা কেটে আনবে, তার সঙ্গে আপন রুপসী কন্যা হেলেনকে বিয়ে দেবেন। বিপরীতে মুসলিম সেনাপতিও ঘোষণা দেন, যে ব্যক্তি খৃস্টান সম্রাট জর্জিরকে হত্যা করবে, জর্জিরকন্যা হেলেনকে তাকে দান করবেন। কী হলো তারপর?

পড়ুন আফ্রিকার দুলহান

Light DESIGN

ISBN. 984-8754-04-0